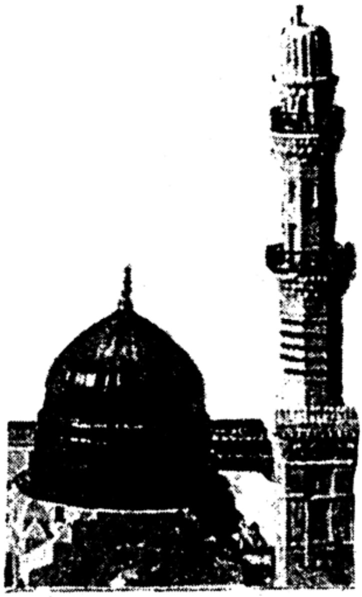
মাদারেজুন্ নবুওয়াত

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে
দেহলভী (রহঃ)



মাদারেজুন্ নবুওয়াত
ষষ্ঠ খণ্ড

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র.

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

মাদারেজুন্ নবুওয়াত
শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র.
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুমিনুল হক
সম্পাদনা ঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

প্রথম প্রকাশ ঃ
এপ্রিল ২০০৫ ইং
রবিউল আউয়াল ১৪২৬ হিঃ
মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে
– সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী ২০১০ ইং

প্রচ্ছদ ঃ
আব্দুর রোউফ সরকার

মুদ্রণ ঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল,
ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময় ঃ
১৫০/- টাকা

MADAREZUN NABUWAT (Vol-VI) By Shaekh Abdul Haque Muhaddese Dehlabhi (Rh.) translated by Maolana Mominul Haque/ Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Hakimabad, Bhuigar, Narayangonj, Bangladesh. Exchange : Taka 150.00 US $ 20 only.

ISBN 984-70240-0018-7

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

স্রোতস্বিনী যেমন মহাজলধির দিকে সতত বহমান, আমাদের জীবনও তেমনি চলমান মহাজীবনের দিকে। আমরা তো তাঁরই জন্য এবং তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন আমাদের সকলের। সময়ের শোভাযাত্রায়, জীবনের জলতরঙ্গে প্রতিনিয়ত মিলিত হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-শোক, সংক্ষোভ-সমাধান, শব্দ-নৈশব্দ, আলো-অন্ধকার। ইতোমধ্যেই আমরা অনেকে পার হয়ে এসেছি শৈশব-কৈশোর-যৌবন। পড়ন্ত বেলার দিকচক্রবালে কেবলই বিষাদের খেলা। পুণ্যহীন, পূর্ণত্ববিহীন অতীতের বেদনা কেবলই ভারী হচ্ছে। ভারী হয়ে যাচ্ছে। পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য এখন কি একটু ভাবতে হবে না? জ্বালাতে কি হবে না লজ্জা ও অনুতাপের পাপবিনাশী আগুন।

আসুন, এখনই প্রজ্জ্বলিত করি তওবার তৃষাতুর অনল। ওই অমূল্য অনলে আসত্তা নিমগ্ন হয়ে পরিশুদ্ধ করি আমাদের ভাবনা-বেদনা-চেতনা-যাতনাকে। তাঁর নির্দেশে, তাঁর প্রণোদনায় এবং তাঁরই নিয়মে, যিনি সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ, যিনি মহাবিশ্বের মহামমতার মহাপারাবার। স্মরণ করি তাঁর মহাবাণী— আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত সাধনা করে যাবো, যতোক্ষণ না পৃথিবীর মানুষ বলে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

পৃথিবী জানে। জানে মানুষ-জ্বিন-ফেরেশতা। জানে নক্ষত্র-নীহারীকা, সূর্য-চন্দ্র, আকাশ-মহাকাশ। বেহেশতের বৃক্ষরাজি, জলবতী নদী, সুরম্য ভবন, আয়ত আঁখিনিকুল— সকলেই জানে, তিনিই মহাকালের, মহাসৃষ্টির মহাপ্রেমাস্পদ। সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত জন। সর্বজনমান্য রসুল। মহাপরিত্রাণের পথিকৃৎ। বার্তাবাহক। মোহাম্মদ — সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম। আহমদ— সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম। মহাপ্রভুপালক স্বয়ং তাঁর প্রতি প্রেরণ করেন সালাম। *দরুদ ও সালাম প্রেরণ* করে সকল পরিদৃশ্যমান-অপরিদৃশ্যমান সৃষ্টি। এরকম নির্দেশ রয়েছে আমাদের প্রতিও। বলা হয়েছে— ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু সল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলীমা। আসুন, আমরা এই শাশ্বত নির্দেশের নিচে সমবেত হই। কেবল তাঁরই ভালোবাসায় নিয়োজিত, নিমজ্জিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে লক্ষকোটি কণ্ঠে অনুরণন তুলি—

বালাগাল উলা বিকামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বিজামালিহি
হাসুনাত জামিউ খিসালিহি
সল্লু আ'লাইহি ওয়া আলিহি

সর্ববিধ প্রশংসা-প্রশস্তি-স্তব-স্তুতি আল্লাহ্‌র। কেবলই আল্লাহ্‌র। হে আমাদের মহামার্জনাপরবশ প্রভুপালক! আমরা জানি ও বিশ্বাস করি, তোমার দয়ার্দ্র প্রশ্রয় ও অনুমোদনেই এগিয়ে চলেছে আমাদের এই প্রকাশনাপ্রবাহ। তোমাকে মহাপ্রভুপালক, মোহাম্মদ স.কে নবী এবং ইসলামকে ধর্মরূপে পেয়ে আমরা পরিতুষ্ট।

তোমারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি। তুমি দয়া করে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। মার্জনা করে দাও লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক-পাঠিকা, সকল সহযোগী-সহযোগিনী এবং শুভানুধ্যায়ীগণকে। বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচার-প্রসার-প্রতিষ্ঠার যে সাধনা ও সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি, সেই সাধনা-সংগ্রামকে দাও সুন্নতি সৌন্দর্য ও সফলতা। কাদিয়ানি-মওদুদী ও অন্যান্য ফেত্‌নাগুলোকে পাঠিয়ে দাও অতীতের অন্ধকারে। মুছে যাক মিথ্যাচারিতা। জেগে থাক সত্য। মহাসত্য। *আমরা তার অনির্বাণ জ্যোতির্ময়তা নিয়ে পথ চলি। পথ চলতে থাকি।*

আমাদেরকে সামর্থ্য দাও। আল্লাহুম্মা আমিন।

ওয়াস্‌সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

কিন্তু মেঘেরা মানে না এসব কথা। পাখিরাও নয়।
সময় কম। এখন শত চেষ্টা করলেও আমরা
খোঁজ নিতে পারবো না সকল সংসারের—
একটিবার যদি আমাদের সকল শিশুকে
এক এক করে জড়িয়ে নিয়ে চুমু খেতে চাই
তা-ওতো পারবো না।
আসুন আমরা প্রতিটি নতুন অতিথিকে মাত্র একটি ক'রে
রজনীগন্ধা দেবার অঙ্গীকার করি। দেখবেন—
ভাঙা টুকরোগুলো এই মুহূর্তেই হয়ে যাবে ভালোবাসার সবুজ গম্বুজ
সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও। আমরা এখন
আমাদের আপন আত্মার কাছে যাবো। আমরা এখন
মেঘ ও পাখির মতো হবো।

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী-১ম ও ২য় খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া ◆মাআ'রিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্বন্দ ◆চেরাগে চিশ্তী ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নুরে সেরহিন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆মহা প্লাবনের কাহিনী
◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆সীমান্ত প্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

সূচীপত্র

ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনাবলী

হজ্ব ফরজ হওয়া

জমহুরের মতানুসারে ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলামের অন্যতম বিধান হজ্ব ফরজ হয়। আলেমগণের একটি দলের মত হচ্ছে হজ্ব ফরজ হয়েছে নবম হিজরীতে। জমহুর আলেমগণের মতের সপক্ষে দলিল হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালার বাণী 'আতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল উমরাতা লিল্লাহি' (তোমরা আল্লাহ্র জন্য হজ্ব ও ওমরা পূর্ণ করো) (২ঃ১৯৬)। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো ৬ষ্ঠ হিজরীতে। তাঁরা আরও বলেছেন, হজ্ব পূর্ণ করার অর্থ তার আনুষংগিক কাজকর্ম সম্পাদন করা। তাঁদের এ মতের সমর্থন করেছেন জলীলুল কদর তাবেয়ী আলকামা, মাসরুক ও ইব্রাহীম নখয়ী। তাঁরা দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন 'আতিম্মু' এর স্থলে 'আতীমু' ক্বেরাত। ইমাম তিবরানী বিশুদ্ধ সূত্রসমূহের মাধ্যমে এই ক্বেরাতটির বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য আলেম— যাঁরা বলেন, হজ্ব নবম হিজরীতে ফরজ হয়েছে, তাঁদের দলিল হচ্ছে, সূরা আলে ইমরানের প্রথম দিকের এই আয়াতটি— 'লিল্লাহি আলান নাসি হিজ্জুল বাইতি মানিস্ তাত্ব'আ ইলাইহি সাবীলা' (মানুষের মধ্যে যাহার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য) (৩ঃ৯৭) অবতীর্ণ হয়েছিলো নবম হিজরীতে, যাকে বলা হয় আমুল ওয়ুদ। রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই বছর হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা.কে আমীরুল হজ্ব বানিয়ে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। পরে সদ্য অবতীর্ণ সুরা বারায়াত বিশেষভাবে পৌত্তলিকদের শোনানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন হজরত আলী রা.কে (যাতে ছিলো কুরায়েশদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করার ঘোষণা। অনুবাদক)। দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো কোনো আলেমের নিকট এই মতটিই অগ্রাধিকার পেয়েছে। নবম হিজরীতে রসুলেপাক স. হজ্বের ছামান প্রস্তুত করার কাজে মশগুল হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে এ বৎসর তাঁর হজ্বের সফরে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। বিভিন্ন যুদ্ধ সামাল দেওয়া এবং বিভিন্ন স্থানে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করার কাজেই তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে তাঁকে হজরত আবু বকর সিদ্দীককেই হজ্বাধিনায়ক নির্বাচন করতে হয়। শেষোক্ত মতের আলেমগণ বলেন, 'আতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল উমরাতা লিল্লাহি' আয়াতখানি ষষ্ঠ হিজরীতে নাজিল হলেও তা হজ্ব ও ওমরা ফরজ হওয়ার প্রমাণ নয়। কেননা (আতিম্মুল হাজ্জা) এর প্রকাশ্য অর্থ হজ্বের আনুষংগিকতা পুরো করা, হজ্ব ও

ওমরা ফরজ হওয়া নয়। সুতরাং এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে হজ্ব ও ওমরার আনুষংগিক বিষয়াদির প্রস্তুতি নিয়ে তার পূর্ণতা সাধন করা। এমনও হতে পারে যে, হজ্ব আরম্ভ করে তা পূর্ণ করার বিষয়ে আগাম হুকুম হয়েছিলো ষষ্ঠ হিজরীতে, আর তার ফরজ হুকুম হয়েছিলো নবম হিজরীতে। 'ফতহুলবারী' গ্রন্থে আলেমগণ বলেছেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, হজ্ব ফরজ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো নবম হিজরীর পূর্বে। কেননা 'আতিম্মু' অর্থ কোনো কিছু উদ্বোধন করার পর পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করা। সুতরাং বুঝতে হবে হজ্ব ও ওমরা পূর্বেই শুরু হয়ে থাকবে। পূর্বেই যদি শুরু হয়ে না থাকে, তাহলে তা পরিপূর্ণরূপে সম্পাদন করার কথা বলা হবে কেন? রসুলেপাক স. হিজরতের পূর্বে অবশ্য কয়েকবার হজ্ব আদায় করেছিলেন। তবে এর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সঠিক সংখ্যা অনির্ধারিত। হজ্ব পূর্ণ করার নির্দেশের বিষয়ে এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট। হজ্ব ফরজ হওয়ার কাল অবশ্য ইসলামের কালই ছিল। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

যাতুররুকা'র যুদ্ধ

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও সীরাত বিশেষজ্ঞের বক্তব্য অনুসারে এ বৎসরই যাতুররুকা এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ইবনে ইসহাকের মতে চতুর্থ হিজরীতে বনু নযীরদের উচ্ছেদ অভিযানের পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইবনে সাআদ ও ইবনে হাব্বানের মতে খন্দকের যুদ্ধ এবং বনু কুরায়যার ঘটনার পর হয়েছিল। এ যুদ্ধ খয়বরের যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল বলে ইমাম বোখারী মত প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি এর বর্ণনা দিয়েছেন খয়বরের যুদ্ধের বর্ণনার পর এবং খন্দকের যুদ্ধ বনু কুরায়যার অভিযানের পর হয়েছিল বলে বর্ণনা করেছেন। এমনও হতে পারে যে, যাতুররুকা'র যুদ্ধ কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার হয়েছিল খয়বরের পূর্বে আর একবার তার পরে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এবার যাতুররুকা যুদ্ধের এবং তার নামকরণের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

একবার এক লোক মদীনা মুনাওয়ারায় একটি বকরী বিক্রয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে এলো। সে নবী করীম স. এর সাহাবীগণের কাছে বলতে লাগলো, গাতফানের বনু আনসার এবং বনু ছা'লাবা গোত্রের লোকেরা এক হাজার সৈন্য সমবেত করেছে। উদ্দেশ্য, তারা মদীনা মুনাওয়ারা আক্রমণ করবে। এ সংবাদ শুনে রসুলেপাক স. দু'শ, অপর বর্ণনানুসারে সাতশ' সাহাবীকে নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হলেন। মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে রেখে গেলেন হজরত ওসমান ইবনে আফফানকে। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আবু যর গিফারীকে। তারপর তিনি স. নাহল নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। স্থানটি নজ্‌দ অঞ্চলের গাতফান

গোত্রের লোকদের এলাকা ছিলো। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে এর দূরত্ব দু'দিনের পথ। রসুলেপাক স. সেখানে পৌছে তাদের বস্তিগুলোতে স্ত্রীলোকদেরকে ছাড়া আর কাউকেই পেলেন না। পুরুষেরা তাঁর আগমনের খবর শুনে পাহাড় ও টিলাসমূহে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলো। মুসলমানগণ তাদের মালপত্রগুলো দখল করলেন। কেউ বাধা দিলো না। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, মুসলমানগণ তাদের স্ত্রীলোকদেরকে বন্দী করেছিলেন। এ অভিযানের সময়সীমা ছিলো পনেরো দিন। পনেরো দিন এখানে অবস্থানকালে মুসলমানগণ 'সালাতুল খওফ' আদায় করেছিলেন। সকলে একসাথে নামাজে দাঁড়ালে যদি কাফেরেরা আক্রমণ করে বসে তাই এভাবে নামাজ আদায় করা হয়েছিলো। সালাতুল খওফ আদায় করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। সফরুস সা'আদাত গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ওটাই ছিলো প্রথম খওফের নামাজ, যা রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে নিয়ে আদায় করেছিলেন। এরপর বিনা যুদ্ধে সাহাবীগণ মদীনায় ফিরে আসেন। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেছেন, আমরাই অভিযানে রসুলেপাক স. এর সঙ্গী ছিলাম। তখন আমাদের ছয় ব্যক্তির জন্য বাহন ছিলো একটি মাত্র ঘোড়া। আমরা তার উপর পালাক্রমে আরোহণ করে যাচ্ছিলাম। আমাদের সকলেরই পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। আর আমার পা এমনভাবে জখম হয়েছিলো যে, পায়ের নখ উপড়ে গিয়েছিলো। আমরা সকলেই আপন আপন পায়ের উপর পট্টি ও কাপড় বেঁধেছিলাম। (রুকযাতুন শব্দের বহুবচন রুকা অর্থ পট্টিসমূহ) সে হিসেবেই এ অভিযানের নামকরণ হয়েছিলো 'গাযওয়ায়ে যাতুররুকা' অর্থাৎ পট্টিসমূহের অভিযান। ইমাম বোখারী বলেন, হজরত আবু মুসা আশআরী প্রথমে হাদিসটি বর্ণনা করা অসমীচীন মনে করেছিলেন এই ভেবে যে, এতে করে আমল ও তাযকিয়ায়ে নফসের বিষয়ে ফাসাদ আসতে পারে।

যুদ্ধ বিষয়ক ঐতিহাসিকগণ অভিযানের এমতো নামকরণের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন— ১. সাহাবীগণ সকলেই এমন এক পাহাড়ের উপর উঠেছিলেন যার একেকটি শৃঙ্গ এবং অংশ একেক রঙের ছিলো। তাই ওই পাহাড়কে যাতুররুকা বলা হতো। ২. সেখানে এমন কিছু স্তম্ভ ছিলো যেগুলোকে যাতুররুকা বলা হতো। ৩. সাহাবীগণ এ অভিযানে যাত্রা করেছিলেন শাদা-কালো রঙের ঘোড়ায় আরোহণ করে। প্রথমোক্ত কারণটিই অবশ্য অধিক পছন্দনীয়।

এ অভিযানে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিলো। একটি এরকম— হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী একটি উটের উপর আরোহণ করে ফিরছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন উটটি যেনো খুব দ্রুত গতিতে চলে। কিন্তু উটটি ছিলো দুর্বল এবং ধীরগতিসম্পন্ন। রসুলেপাক স. তাঁর ছড়ি দিয়ে একবার মাত্র তাড়া করলেন

আর অমনি উটটি দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করলো। রসুলেপাক স. হজরত জাবেরকে জিজ্ঞেস করলেন, খুব দ্রুত চলছো যে ? তিনি উত্তর দিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি সদ্য বিবাহিত। তিনি স. বললেন, কুমারী নাকি পূর্ব বিবাহিতা? তিনি বললেন, পূর্ব বিবাহিতা। তিনি স. বললেন, কুমারী বিয়ে করলে না কেনো? তাহলে তুমি তার সাথে, সেও তোমার সাথে লঘু আনন্দে মেতে উঠতে পারতো। হজরত জাবের বললেন, আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি নয় বা সাতজন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। সে জন্যই আমি একজন প্রাপ্তবয়স্কা পূর্ববিবাহিতা রমণীকে বিয়ে করেছি, যাতে করে সে আমার বোনদের প্রতি যত্নবান হতে পারে। তখন রসুলেপাক স. হজরত জাবেরের কাছ থেকে তাঁর উটটি কিনে নিলেন এই শর্তে যে, তার উপর সওয়ার হয়ে তিনি মদীনা পর্যন্ত যাবেন। মদীনা শহরে পৌছার পর উট হস্তান্তর করে তার মূল্য উসুল করে দেওয়া হবে। মদীনায় পৌছার পর তিনি স. উটের মূল্য শোধ করে দিলেন এবং উটটিও তাকে দান করে দিলেন। এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, এরকম শর্তযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। কিন্তু ফকিহগণ এরকম করতে নিষেধ করেন। তবে হ্যাঁ, এ ধরনের কেনা-বেচা সিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি অন্য কোনো হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হতে পারে। কেননা এই হাদিসে রয়েছে এযতেরাব (ভারসাম্যহীনতা)।

এই অভিযানকালেই এই ঘটনাটি ঘটেছিলো— রসুলেপাক স. একটি গাছের ছায়ায় নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর মাথার উপর তরবারী তাক করে ধরলো। তিনি স. জাগ্রত হলেন। লোকটি বললো, কে এখন তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌ । এ কথা বলেই উঠে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির হাত থেকে তরবারী খসে পড়লো। রসুলেপাক স. তরবারীটি উঠিয়ে নিয়ে বললেন, এখন আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে। লোকটি বললো, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তিনি স. বললেন, সাক্ষ্য দিবে কি যে, আমি আল্লাহ্‌র রসুল? সে বললো, আমি অঙ্গীকার করছি, কোনো দিন আপনার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করবো না। এমন কোনো দলের সঙ্গে যুক্তও হবো না, যে দল আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। রসুলেপাক স. তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সে তার জনপদের লোকদের কাছে ফিরে গেলো। বললো, আমি এসেছি এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে, যিনি এ পৃথিবীতে সর্বোত্তম। তাঁর চেয়ে ভালো মানুষ এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। ওয়াকেদী লিখেছেন, লোকটি তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলো।

বনী লেহইয়ানের অভিযান

এ বৎসরেই রবিউল আউয়াল মাসে বনী লেহইয়ানের অভিযান পরিচালিত হয়। ইবনে ইসহাকের মতে জমাদিউল উলা মাসে বনী কুরায়যার অভিযানের দু'মাস পর এই ঘটনা ঘটে। ইবনে হাযাম বলেছেন, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এ ঘটনা পঞ্চম হিজরীর।

এ অভিযানের কারণ এরকম— হজরত আসেম ইবনে ছাবেত এবং হজরত যুবায়ের ইবনে আদী এবং তাঁদের সাথীবৃন্দের সাথে যে ঘটনা ঘটে, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে তৃতীয় হিজরীর ঘটনাবলী বর্ণনাকালে। তারপর থেকে রসুলেপাক স. সব সময়ই মনোকষ্টে দিনাতিপাত করতেন। একটার পর একটা যুদ্ধ লেগেই থাকে। তিনি স. অবকাশ আর পানই না। দূরাচার বনী লেহইয়ান গোত্রকে শায়েস্তা করার সময়ও আর হয় না। এসে পড়লো ষষ্ঠ হিজরী। রসুলেপাক স. বনী লেহইয়ানদের মূলোৎপাটনের সিদ্ধান্ত নিলেন। বিশজন অশ্বারোহীসহ দু'শজনের আনসার সাহাবী সমন্বয়ে একটি যোদ্ধাদল প্রস্তুত করলেন। যাত্রাকালে এমন ভাব ফুটিয়ে তুললেন, যাতে মনে হয় তিনি যেনো শাম দেশের দিকে যাত্রা করছেন। এমতো কৌশল তিনি স. অবলম্বন করলেন অতর্কিতে আক্রমণ করে বনী লেহইয়ানদেরকে পর্যুদস্ত করে দিতে। মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন হজরত ইবনে উম্মে কুলছুম রা.কে। তারপর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে ওই স্থানে পৌঁছে গেলেন, যেখানে 'রাজী' অভিযানের সাহাবীগণকে বন্দী ও শহীদ করা হয়েছিলো। সেখানকার শহীদদের জন্য রসুলেপাক স. ইস্তেগফার ও দোয়া করলেন। বনী লেহইয়ান গোত্রের লোকেরা তাঁর আগমনের সংবাদ পাওয়া মাত্র পলায়ন করলো। তারা পাহাড়ে আরোহণ করে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে রইলো। তিনি স. সেখানে দিন দুয়েক অবস্থান করলেন। চতুর্দিকে ছোট ছোট সেনাদল প্রেরণ করলেন। এরপর সেখান থেকে আসফান নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখান থেকে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের নেতৃত্বে, অপর এক বর্ণনানুসারে হজরত সাআদ ইবনে উবাদার নেতৃত্বে দশজন অশ্বারোহীর একটি দল পাঠিয়ে দিলেন কুরাউল গাইম নামক স্থানের দিকে। এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম বাহিনীর শান শওকতের সংবাদ কুরায়েশদের কানে পৌঁছে দিয়ে তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করা। দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবীগণ নির্ধারিত স্থানসমূহে গেলেন। তাদেরকে কোথাও কোনো বাঁধার সম্মুখীন হতে হলো না। পুরোদল নির্বিঘ্নে ফিরে এলেন রসুলেপাক স. এর নিকটে। অভিযানের সময় লাগলো সর্বমোট চৌদ্দ দিন।

বনী কেলাব গোত্রের দিকে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার অভিযান

এ বৎসর রবিউল আউয়াল মাসে বনী কেলাব গোত্রের মূলোৎপাটনকল্পে হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে ত্রিশজন অশ্বারোহীসহ দুরাইয়া নামক স্থানে প্রেরণ করা হলো। এ স্থানটি মদীনা শরীফ থেকে চব্বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। রসুলেপাক স. অভিযাত্রী দলটিকে বললেন, অকস্মাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতেন। পথ চলতেন রাতে। এভাবে একদিন রাতের বেলায় সেখানে উপস্থিত হলেন। তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে কয়েকজন কাফেরকে হত্যা করলেন। অন্যরা পালিয়ে গেলো। হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা তাদের উট, বকরীসমূহ মদীনায় নিয়ে এলেন। রসুলেপাক স. পঞ্চমাংশের পদ্ধতিতে সেগুলো বণ্টন করে দিলেন। মোটমাট ছিলো একশ পঞ্চাশটি উট ও তিন হাজার বকরী। অভিযানের সময়সীমা ছিলো পনের দিন। কোনো কোনো বর্ণনানুসারে ঊনিশ দিন।

উল্লেখ্য, মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার নামে দু'টি অভিযানের বিবরণ আছে। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে অভিযানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সারিয়ায়ে মোহাম্মদ ইবনে সামলামা বিকুরতা'। এখানকার বিবরণটি নেওয়া হয়েছে ওই পুস্তক থেকেই।

বনী ছ'লাবার দিকে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার অপর অভিযান

হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে সেনাপতি বানিয়ে আরেকটি অভিযানে প্রেরণ করা হলো যুল কুসসা নামক স্থানে। এক বর্ণনায় এসেছে, দশজন যোদ্ধাসহকারে হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে বনী ছা'লাবার বসতি যুলকুসসা নামক স্থানে প্রেরণ করা হলো। রাতের বেলায় তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রায় একশ লোক ছিলো। তারা সকলেই একত্রিত হলো। তারা দু'দিক থেকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। শেষে শুরু করলো সর্বাত্মক হামলা। তারা হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে তীর বিদ্ধ করলো। তিনি ধরাশায়ী হলেন। তীর লেগেছিলো তাঁর পায়ের টাখনুতে। অবশেষে শাহাদাত বরণ করলেন তিনি। জনৈক মুসলমান তাঁর পবিত্র মরদেহ কাঁধে বহন করে মদীনায় নিয়ে এলেন।

তারপর রসুলেপাক স. রবিউল আখের মাসে চল্লিশজন সহযোদ্ধাসহ হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্‌কে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। কাফেররা পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করলো। একজনকে কেবল বন্দী করা গেলো। সে ইসলাম গ্রহণ করলো। তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। বনী ছা'লা গোত্রের লোকদের পশুপাল এবং তাদের গৃহস্থালীয় জিনিসপত্র মদীনা শরীফে নিয়ে আসা

হলো। রসুলেপাক স. পঞ্চমাংশের বিধানমতে সেগুলোকে ভাগ বাটোয়ারা করে দিলেন। এ অভিযানে হজরত ছামামা রা.কে বন্দী করে হাত বাঁধা অবস্থায় মদীনায় আনা হয়েছিলো বলে 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনাটি গারাবত (অতিরঞ্জন) থেকে মুক্ত নয়। ওই পুস্তকে বিষয়টি ষষ্ঠ হিজরীর মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার অভিযানের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি নিম্নরূপ:-

নজদের দিকে হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার অভিযান

রসুলেপাক স. সাহাবায়ে কেরামের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে নজদের দিকে প্রেরণ করলেন। তিনি সেখানকার বনী হানিফা জনপদের নেতা ছামামা ইবনে আছালকে বন্দী করে রসুলেপাক স. এর নিকট হাজির করলেন। তিনি স. তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন। পরে সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে ছামামা! তোমার অবস্থা কী? কিছু কি বলতে চাও? ছামামা ইবনে আছাল বললেন, মোহাম্মদ! আমি ভালোই আছি। আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তবে খুনীকেই হত্যা করবেন (এমন একজনকে হত্যা করবেন, যে হত্যারই উপযোগী)। আর যদি দয়া করেন, তাহলে দয়া করবেন একজন কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর উপরে। (জীবন ভিক্ষা যদি দেন, তবে আমি কৃতার্থই হবো)। আর যদি ফিদইয়া হিসেবে কিছু চান, তবে আমি তা-প্রদানের জন্য প্রস্তুত। রসুলেপাক স. কিছু বললেন না। চলে এলেন। পরদিন তিনি স. পুনরায় তাকে সেই একই প্রশ্ন করলেন। ছামামা ইবনে আছালও একই উত্তর দিলেন। তৃতীয় দিনও এরকম হলো। শেষে রসুলেপাক স. বললেন, এর বাঁধন খুলে দাও। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। মুক্ত ছামামা মসজিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর গাছের কাছে গেলেন। সেখানে গোসল করলেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে উচ্চ আওয়াজে বললেন, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রসূলুহ্'। তারপর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল ! আল্লাহ্র কসম! ধরাপৃষ্ঠে আমার কাছে আপনার চেয়ে অধিক অপ্রিয় আর কেউ ছিলো না। এখন দেখছি, সব মানুষের চেহারার চেয়ে আপনার পবিত্র চেহারা আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। কোনো ধর্মকে আপনার ধর্মের চেয়ে খারাপ মনে হতো না। এখন আমার কাছে আপনার ধর্মই সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। পৃথিবীতে কোনো শহর আপনার শহরের চেয়ে ঘৃণিত মনে হতো না। এখন আপনার শহর আমার নিকট সমস্ত শহরের চেয়ে সুন্দর। তিনি আরও বললেন, আপনার সৈন্যরা আমাকে বন্দী করেছে। আমি ইচ্ছা করেছিলাম, ওমরা পালন করবো। কিন্তু জানি না এখন

আপনি কী হুকুম দিবেন? রসুলেপাক স. তাঁকে সুসংবাদ দিলেন এবং তাঁকে ওমরা পালন করার অনুমতি দিলেন। ছামামা ইবনে আছাল যখন মক্কার নিকটবর্তী হলেন তখন কোনো এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, 'তুমি তো সাবী' (ধর্মত্যাগী)। কাফেররা মুসলমানদেরকে 'সাবী' বলে ডাকতো। মনে করতো ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি সত্যধর্ম ত্যাগ করে বাতেল ধর্মমত গ্রহণ করেছে। ছামামা বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সাবী নই, আমি তো আল্লাহ্‌র রসুলের দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা ছামামার সম্পদ থেকে একটি গমের দানাও পাবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র রসুল অনুমতি দিবেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম। ইমাম বোখারীর বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত।

যী করদের অভিযান

এই বৎসরই যী করদের অভিযান পরিচালিত হয়। যী করদ একটি কূপের নাম, যা মদীনা তাইয়্যেবা থেকে এক বারীদ পথ দূরে অবস্থিত। এ অভিযানকে গজওয়ায়ে গাবা বা জঙ্গলের অভিযানও বলা হয়। 'গাবা' শব্দের অর্থ জঙ্গল বা বনভূমি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই স্থানে কোনো বনভূমি ছিলো না। এটি একটি জায়গার নাম। যী করদের অভিযান হয়েছিলো হুদায়বিয়ার ঘটনার পূর্বে। সীরাতবিদগণ এ বিষয়ে একমত। অবশ্য ইমাম বোখারী বলেছেন, এটি খয়বরের যুদ্ধের তিনদিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো। ইমাম মুসলিমও অনুরূপ বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, যী করদের অভিযান সম্পর্কে সহীহ্ গ্রন্থসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তা সীরাতবিদগণের বর্ণনার তুলনায় অধিকতর বিশুদ্ধ। আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত।

এ অভিযান সংঘটিত হওয়ার কারণ এরকম— রসুলেপাক স. এর নিকট বিশটি গর্ভবতী উট ছিলো। ওগুলোর প্রসবকাল ঘনিয়ে এসেছিলো। উটগুলোকে গাবা নামক স্থানে চরতে দেওয়া হতো। হজরত আবু যর গিফারী রা.ও সেখানে থাকতেন। হঠাৎ তাঁর মনে জাগলো, তিনি সেখান থেকে কিছু দিনের জন্য চলে আসবেন এবং এ জন্য তিনি রসুলেপাক স. এর কাছে অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রসুলেপাক স. তাঁকে অনুমতি দিলেন না। তিনি পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তোমাকে অনুমতি দেই কীভাবে? আমি তো গাতফান গোত্রের লোকদের ব্যাপারে দুর্ভাবনামুক্ত নই। তারা তোমার উপর হামলা করতে পারে। অবশেষে রসুলেপাক স. তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু একথাও বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, গাতফান কবীলার লোকেরা তোমার উপর আক্রমণোন্মুখ। তারা তোমার পুত্রকে শহীদ করে দিয়েছে। পরবর্তীতে হজরত আবু যর গিফারী আত্মসমালোচনা করে বলেন, আমি এখনো বিস্মিত হই একথা

ভেবে যে, রসুল স. আমাকে অনুমতি দিতে চাইছেন না, অথচ আমি অনুমতির জন্য পীড়াপীড়ি করছি। অবশেষে তাই ঘটলো, যা রসুলেপাক স. বলেছিলেন। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার! বিস্ময়কর বৈ কি! হজরত আবু যর থেকে এরূপ ঘটনাই প্রকাশ পেলো। তিনি তো ছিলেন একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী। বলাই বাহুল্য, রসুলেপাক স. এর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তিনি থাকতেন সদা-সজাগ। তাই একথা মানতেই হয় যে, তকদীরে এলাহি এরকমই।

হজরত আবু যর গিফারী সেখান থেকে চলে আসার পর উৎবা ইবনে হাযীন ফারাযী তার চল্লিশজন সঙ্গী নিয়ে হামলা করে বসলো। সবগুলো উট লুট করে নিয়ে গেলো। উটের দু'জন রাখালকে তারা শহীদ করে দিলো। শহীদ করলো হজরত আবু যর গিফারীর পুত্রকেও। ঘটনাক্রমে হজরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. এবং রসুলেপাক স. এর গোলাম হজরত রেবাহ রা. সেহ্রীর ওয়াক্তে সেদিকে গিয়েছিলেন। হজরত সালামা ইবনে আকওয়া হজরত রেবাহ রা.কে বললেন, এক্ষুণি চলো আমরা রসুলেপাক স.কে সংবাদ পৌছে দেই। রসুলে আকরম স. যখন সংবাদ পেলেন, তখনই উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন, হে আল্লাহ্‌র বাহিনী! ওঠো। যাত্রা করো। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হলেন পাঁচশত, অপর বর্ণনানুসারে সাতশত সাহাবী। তিনি স. তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন। মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন হজরত ইবনে উম্মে কুলছুমকে। হজরত মেকদাদের তীরের অগ্রভাগে পতাকা বেঁধে দিলেন। তারপর ঘোষণা দিলেন, এগিয়ে চলো। পরে তোমাদের সাথীরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবে। হজরত সালামা ইবনে আকওয়া আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতই বীরপুরুষ। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি পায়ে হেঁটে চলতেন। আর সে অবস্থায়ই অশ্বারোহী বা উষ্ট্রারোহী শত্রুকে আক্রমণ করতেন। তাদেরকে বাহন থেকে নামতে বাধ্য করতেন। তীর নিক্ষেপে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ।

বৃক্ষের নীচে (অর্থাৎ বায়আতে রেদওয়ানের সময়) তিনি বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। পরে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন আরো দুই বার। শেষবার মৃত্যুকালে। তিনি বলেন, রেবাহ (রা)কে রসুলেপাক স. এর খেদমতে পাঠানোর পর আমি একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে তিন বার সুউচ্চ আওয়াজে ঘোষণা দিলাম ওয়া আসাবাহাহ্। এ বাক্যটি আরব দেশে সমূহ বিপদ ঘোষণা হিসেবে পরিচিত। তিনি আরও বলেন, এমতো ঘোষণা দিয়েই আমি কাফেরদেরকে ধাওয়া করলাম। সঙ্গে ছিলো তলোয়ার ও তীর। আমি তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। প্রত্যেক তীরেই কেউ না কেউ জখম হয়ে ধরাশায়ী হতে লাগলো। সেখানে বড় বড় বৃক্ষ ছিলো অনেক। কাফেরদের কেউ আমার দিকে তীর নিক্ষেপ করলে আমি সঙ্গে সঙ্গে কোনো না কোনো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে যেতাম। ক্রমাগত আত্মরক্ষা করতে থাকলাম এভাবে। কখনও কখনও কোনো উঁচু টিলাতে চলে যেতাম। সেখান

থেকে তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করতাম। আমার এরকম আক্রমণে তারা অতিষ্ঠ হয়ে গেলো। জান বাঁচানোই হয়ে দাঁড়ালো তাদের মুখ্য কর্তব্য। শেষে উটগুলো ফেলে পালিয়ে বাঁচলো তারা। আমি উটগুলোকে মদীনার দিকে হাঁকিয়ে দিয়ে পুনরায় তাদের পিছু ধাওয়া করলাম। তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম বার বার। তারা পলায়নকালে পথে ফেলে গেলো তাদের তীর এবং কাপড়-চোপড়। উদ্দেশ্য, এগুলো দেখে আমি যেনো ওগুলো কুড়ানোর জন্য ব্যস্ত থাকি। তাদেরকে আর আক্রমণ না করি। কিন্তু আমি থামলাম না। তাদের ফেলে যাওয়া সরঞ্জামগুলোর উপর পাথরচাপা দিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতেই থাকলাম। অধিকার করলাম তাদের ত্রিশটি তীর এবং ত্রিশটি চাদর। দুপুর গড়িয়ে এলো। ফারাযা গোত্রের কাফেরদের একটি দল এদেরকে সাহায্য করার জন্য সেখানে পৌঁছে গেলো। সকলে মিলে আমার দিকে ধাবিত হলো। এমন সময় দেখলাম রসুলেপাক স. এর পাঠানো অগ্রগামী দলটি বৃক্ষরাজীর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। সর্বাগ্রে ছিলেন আখরাস আসাদী, যিনি ছিলেন একজন বীর পুরুষ এবং রসুলেপাক স. এর সার্বক্ষণিক খেদমতগার। তার পরেই ছিলেন হজরত আবু কাতাদা, যাঁকে 'ফারেসে রসুলুল্লাহ' (অর্থাৎ রসুলুল্লাহর অশ্বারোহী) বলা হতো। তাঁর সম্পর্কে তিনি স. একবার বলেছিলেন, 'খাইরু ফুরসানে হাল ইয়াওমা আবু কাতাদাহ ওয়া খাইরু রিজালিনা সালামাহ' (আজকের দিবসের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্বারোহী আবু কাতাদা। আমাদের সর্বোত্তম পদব্রজী সালামা)। তাঁর পিছনে ছিলেন হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ আলকিন্দী। মুশরিকরা মুসলিম বাহিনীকে দেখে সাথে সাথে পালাতে শুরু করলো। আখরাস তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। আমি তখন পাহাড়ের উপর থেকে নেমে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে বললাম, একটু ধৈর্য্য ধরুন, রসুলেপাক স. এবং অন্যান্য সাহাবীগণের জন্য অপেক্ষা করুন। আখরাস বললেন, হে সালামা! তুমি যদি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে বিশ্বাসী হও এবং বিশ্বাস রাখো যে, বেহেশত ও দোজখ সত্য, তাহলে আমার এবং শাহাদতের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ো না। আমি তার ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলাম। আখরাস, উতবা ইবনে হাসীনের পুত্র আবদুর রহমানের নিকট পৌঁছলেন এবং তার দিকে তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আবদুর রহমান পালটা তীর ছুঁড়লো। ওই তীর বিদ্ধ হয়ে আখরাস শহীদ হয়ে গেলেন। সে ঘোড়ার উপর আরোহণ করলো। হজরত আবু কাতাদা এগিয়ে গেলেন। যে তীর বিদ্ধ হয়ে আখরাস শহীদ হয়েছিলেন, ওই তীর দিয়েই তিনি আবদুর রহমানকে আঘাত করলেন। এক আঘাতেই সে জাহান্নামে পৌঁছে গেলো। তিনি তার ঘোড়ার উপর উঠে বসলেন। হজরত সালামা বর্ণনা করেন, আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর আমরা কাফেরদেরকে ধাওয়া করলাম। তারা এমন এক জায়গায় প্রবেশ করলো, সেখানে ছিলো পানির একটি কূপ। কূপটির নাম ছিলো

যী করদ। ওই কূপের নামানুসারেই এই অভিযানের নাম হয় গাযওয়ায়ে যী করদ। কাফেরেরা ওই কূপ থেকে পানি পান করতে চেয়েছিলো কিন্তু আমরা তাদের খুব নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তাই ভয়ের চোটে তারা পানি পান করতে পারলো না। কূপের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে লাগলো। আমি একা একাই এ পুরো দলটিকেই পূর্ব দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম। অবশেষে তাদের দু'টি ঘোড়া নিয়ে আমি ফিরে এলাম।

সুবহানাল্লাহ্! মাশাআল্লাহ! হজরত সালামা বীরত্বের কী পরাকাষ্ঠাই না দেখালেন। রসুলে আকরম স. এর প্রতি কী পরিমাণ ভালোবাসা যে তাঁর ছিলো, তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। তাঁর বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্য তো এরকম কিছুতেই ছিলো না যে, হারানো উট পুনরুদ্ধার করবেন। উদ্দেশ্য তো ছিলো কেবলই রসুলেপাক স. এর পরিতোষ অর্জন। তাঁর এক পলক শুভ দৃষ্টির তুলনায় জীবন ও সম্পদ তো অতি তুচ্ছ একটি বিষয়। সেই শুভদৃষ্টি লাভের মোহেই তিনি চেয়েছিলেন সৈন্য সমাবেশ করতে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের তুষ্টি অর্জনার্থে অভিযান পরিচালনা করতে। ফাসাদ নিপাত করতে এবং ইসলামের শান-শওকত প্রকাশ করতে।

হজরত সালামা ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেছেন, আমি যখন যী করদে প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন দেখি রসুলে আকরম স. সৈন্যসামন্ত সহকারে সেখানে অবস্থান করছেন। দেখলাম, বেলাল গনিমত হিসেবে অধিকৃত কাফেরদের উটগুলোর গোশত রান্না করছেন। উটের কলিজা এবং উটের গোশত রসুলেপাক স. এর জন্য আলাদা করে ভূণা করছেন। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কাফেরেরা তৃষ্ণার্ত। তারা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অনুমতি দিন, আপনার সাহাবীগণের মধ্য হতে একশ'জনকে নিয়ে আমি কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করি। আমি ওদের একজনকেও জীবিত রাখতে চাই না। তিনি স. বললেন, তুমি কী পারবে? আমি বললাম, ওই আল্লাহ্র শপথ, যিনি আপনাকে অতুলনীয় মর্যাদা দান করেছেন। আমি অবশ্যই পারবো। তিনি স. মৃদু হাসলেন। তাঁর পবিত্র দন্তরাজি দৃষ্টিগোচর হলো। বললেন, হে আকওয়ার পুত্র! তুমি যদি এরকম সুযোগ পাও, তবে তাদের সাথে শিষ্ট আচরণ কোরো। অভিযানের উদ্দেশ্য তো কেবল দ্বীনের দুশমনদেরকে অপদস্থ করা। আল্লাহ্র প্রশংসা করি। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। রসুলেপাক স. আরও বললেন, গাতফান গোত্রের লোকদের মধ্যে এখন মেহমানদারীর আয়োজন চলছে। কিছুক্ষণ পর গাতফান গোত্রের দিক থেকে এক লোক এসে সংবাদ দিলেন গাতফানরা একটি উট জবেহ করে তার চামড়া ছাড়াচ্ছে। তার কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেলো একজন লোক ধূলাধূসরিত অবস্থায় এগিয়ে আসছে। লোকটিকে ইসলামী বাহিনীরই কেউ একজন বলে মনে হচ্ছিলো। একটু পরে মদীনার বনী ওমর এবং বনী আউফ গোত্রের লোকদেরকেও

আসতে দেখা গেলো। কেউ আরোহী অবস্থায়, কেউ পদব্রজে। কিন্তু এখানকার কাজ তো ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, আমাদের আরোহীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু কাতাদা আর পদব্রজীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সালামা। সেখানে তিনি স. এক দিন এক রাত অবস্থান করলেন। তারপর মদীনা মুনাওয়ারার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ অভিযানের সময়সীমা ছিলো পাঁচ দিন। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এই অভিযানে খওফের নামাজ পড়েছিলেন। তাঁরা আরও বলেন, এ অভিযানকালে তিনি স. একবার ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। ফলে পায়ের গোছায় বা রানে আঘাত পেয়েছিলেন, মদীনায় পৌছার পরও সে ব্যাথার কারণে কিছুকাল বসে বসে নামাজ আদায় করেছিলেন। সাহাবীগণকেও হুকুম দিয়েছিলেন যে, ইমামের অনুসরণার্থে তাঁরাও যেনো বসে বসে নামাজ আদায় করেন। তবে অনেক আলেমের মতে এই হাদিসটি মনসুখ (রহিত)। কেননা এই বর্ণনাটি তো বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে পৌছে গিয়েছে যে, রসুলেপাক স. তাঁর মহাতিরোভাব কালে বসে নামাজ আদায় করেছিলেন। আর সাহাবীগণ তাঁর পশ্চাদ্ভাগে নামাজ আদায় করেছিলেন দাঁড়িয়ে।

বনী আসাদ গোত্রের দিকে উকাশা ইবনে মেহসান আসাদীর অভিযান

এ বৎসরই রসুলেপাক স. চল্লিশজন যোদ্ধাসহ উকাশা ইবনে মেহসান আসাদীকে বনী আসাদ গোত্রের দিকে গামার নামক স্থানে প্রেরণ করেছিলেন। যখন তিনি তাদের বসতির কাছে পৌছলেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলো। তিনি সেখানে পৌছে পেলেন কেবল একজনকে। নিরাপত্তা দিয়ে তাকে বানালেন পথপ্রদর্শক। লোকটি তাঁকে তাদের একত্র করে রাখা পশুপালের কাছে নিয়ে গেলো। হজরত উকাশা সেখান থেকে দু'শ উট নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন।

জাযুম নামক স্থানের দিকে যায়েদ ইবনে হারেছার অভিযান

এ বৎসরই হজরত যায়েদ ইবনে হারেছার সঙ্গে এক বাহিনী পাঠানো হয় বাতনে নাখলার নিকটবর্তী জাযুম নামক স্থানে সেখানে ছিলো বনী সুলায়ম গোত্রের বসবাস। তিনি সেখানে পৌছে তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো হস্তগত করলেন এবং কিছু লোককে বন্দী করে নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থের বিবরণটি এরকম— হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে জাযুম নামক স্থানে বনী সুলায়ম গোত্রের দিকে পাঠানো হলো। স্থানটি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে চার ক্রোশ

দূরে বতনে নাখালা অঞ্চলে অবস্থিত। ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এ অভিযান পরিচালিত হয়। তিনি সেখানে মদীনার এক মহিলাকে দেখতে পেলেন। তার নাম ছিলো হালীমা। ওই মহিলা বনী সুলায়ম গোত্রের মহল্লাসমূহের মধ্য হতে একটি মহল্লার পথঘাট দেখিয়ে দিলেন। সেখানে অনেক উট, বকরী পাওয়া গেলো। কয়েকজনকে বন্দীও করা গেলো। বন্দীদের মধ্যে উক্ত মহিলার স্বামীও ছিলো। বন্দীদেরকে ও পশুগুলোকে নিয়ে হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। রসুলেপাক স. ওই মহিলা ও তার স্বামীকে ক্ষমা করে দেন।

ঈসের দিকে হজরত যায়েদ ইবনে হারেছার অভিযান

এ বৎসরই হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে চার মাইল দূরে 'ঈস' নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। জমাদিউল উলা মাসে সত্তুর জন আরোহী যোদ্ধা সহকারে তিনি ঈস এর দিকে যাত্রা করেন। কুরায়েশদের একটি কাফেলা সিরিয়া থেকে আসছিলো। তাদেরকে পাকড়াও করাই ছিলো এই অভিযানের উদ্দেশ্য। তিনি কাফেলাটিকে আটক করলেন এবং তাদের সকল মালমাত্তা অধিকার করলেন। সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছে অনেক রৌপ্য ছিলো। তিনি সেগুলোও হস্তগত করলেন। সবাইকে বন্দী করা হলো। তাদের মধ্যে আবুল আস ইবনুর রবীও ছিলেন। তিনি ছিলেন রসুলেপাক স. এর কন্যা সাইয়্যেদা হজরত যয়নবের স্বামী। পরে হজরত যয়নব তাঁকে নিরাপত্তা দান করে নিজের কাছে নিয়ে যান। রসুলেপাক স. তাঁর এ নিরাপত্তা প্রদানকে সমর্থন করলেন। আবুল আস মক্কায় যান এবং ঈমান গ্রহণ করে আবার মদীনায় ফিরে আসেন। এর আগে হজরত আবুল আস বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। মক্কাবাসীরা যখন মুক্তিপণ প্রেরণ করলো, তখন সাইয়্যেদা যয়নব ছিলেন মক্কায়। তখন পর্যন্ত মুমিন রমণী ও মুশরিক পুরুষের বিবাহ সিদ্ধ ছিলো। আবুল আস এর মুক্তিপণ হিসেবে সাইয়্যেদা যয়নব একটি হার প্রেরণ করেন। হারটি ছিলো তাঁর মা হজরত খাদীজাতুল কুবরার। তিনি তাঁর বিয়েতে ওই হারটি উপহার দিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. উক্ত হারটি দেখে চিনে ফেললেন। তাঁর মনে পড়লো প্রিয়তমা মহিষী হজরত খাদীজার কথা। ব্যথিত হলেন তিনি স.। সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আবুল আসের এই মুক্তিপণটি না নিয়ে যদি তাকে এমনিতেই ক্ষমা করে দিতে তবে ভালোই হতো। সাহাবীগণ অবনত মস্তকে এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। রসুলেপাক স. আবুল আসকে এই মর্মে অঙ্গীকার করালেন যে, তিনি অতি অবশ্যই সাইয়্যেদা যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিবেন। সঙ্গে লোক পাঠানো হলো। ওই লোকের সঙ্গে সাইয়্যেদা যয়নব মদীনায় চলে এলেন। তখনও আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করেননি। ষষ্ঠ হিজরীতে তিনি

কুরায়েশদের সঙ্গে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশে যান। ফেরার পথে বন্দী হন মুসলিম বাহিনীর হাতে। মদীনায় আসেন বন্দী অবস্থায়। সাইয়্যেদা যয়নব রসুলেপাক স. এর কাছে তাঁর নিরাপত্তার জন্য আবেদন করলেন। তিনি স. তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন। হজরত আবুল আস মুক্তি পেলেন। সাহাবীগণ তাঁকে বললেন, মুসলমান হয়ে যান। তাহলে আপনার মালমাত্তা ফিরে পাবেন। হজরত আবুল আস বললেন, আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। আমি কি আমার ইসলামকে এ সব মালের সঙ্গে মিশ্রিত করবো? তারপর আবুল আস মক্কায় চলে গেলেন। যাত্রা কালে সাথীদেরকে বললেন, মক্কাবাসীরা! তোমরা তোমাদের মাল সামলাও। একথা বলেই পাঠ করলেন 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ্'। 'উসদুলগাবা' পুস্তকে উল্লেখ আছে, মুসলমানদের ওই আক্রমণ এবং সাইয়্যেদা যয়নবের নিরাপত্তা প্রদানের ঘটনাটি ঘটেছিলো শাম দেশে সফরে যাওয়ার সময়। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এটাই যে, সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সংঘটিত হয়েছিলো ঘটনাটি। জীবনীবিশেষজ্ঞগণ এরকমই বলেছেন।

ওয়াদীয়ে কোরার দিকে

এ বৎসরেই রমজান মাসে হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে ওয়াদীয়ে কোরার দিকে পাঠানো হয়। কারণ ছিলো এরকম— হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় যাচ্ছিলেন। তাঁর সফরসঙ্গীগণ তাঁর কাছে অনেক মাল সম্পদ সমর্পণ করেছিলেন। তিনি যখন ওয়াদীয়ে কোরায় পৌঁছলেন তখন ফারাযা গোত্রের শাখাগোত্র বনী বদর গোষ্ঠীর কতিপয় লোক তাঁর পথ রোধ করলো। শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই। তাদের জনবল ছিলো অধিক। আর মুসলমানদের লোকসংখ্যা ছিলো খুবই কম। কাফেররা বিজয়ী হলো। তারা মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো এবং তাদের মাল আসবাবপত্রসমূহ লুট করে নিয়ে গেলো। মুসলমানগণ পরাজিত হয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। সবশুনে রসুলেপাক স. মর্মাহত হলেন। তিনি স. হজরত যায়েদ ইবনে হারেছার সঙ্গে আরেকটি দল প্রেরণ করলেন। দলটি দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতো। পথ চলতো রাতের বেলায়। একদিন সকাল বেলা পৌঁছে গেলো সেখানে। অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলো। পূর্বের ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণ করলো। কতিপয় দুশমনকে হত্যা করা হলো এবং অনেক রমণীকে বন্দী করা হলো। বাকীরা পালিয়ে জান বাঁচালো। হজরত যায়েদ ইবনে হারেছার এই কয়েকটি অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে আরও কিছু অভিযানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন—

উম্মে কারকার উচ্ছেদ সাধন

হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে এই বৎসরেই রমজান মাসে পাঠানো হলো উম্মে কারকা ফাতেমা বিনতে রবীআ ইবনে যায়েদ ফারারিয়া নাম্নী এক মহিলাকে উচ্ছেদ করার জন্য। সে বাস করতো উম্মুলকুরা নামক স্থানের পার্শ্ববর্তী এলাকায়। স্থানটি ছিলো মদীনা শরীফ থেকে সাত দিনের পথের দূরত্বে। সেখানকার নেত্রী ছিলো সে। হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা বলেন, আমি সেখানে পৌঁছে উম্মে কারকাকে বন্দী করলাম। সে ছিলো খুবই বৃদ্ধা। প্রথমে তাকে প্রহার করা হলো। তার দু'পা রশি দিয়ে দু'টি উটের পায়ের সাথে বেঁধে উট হাঁকিয়ে দেওয়া হলো। তাতে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলো তার শরীর।

হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা মদীনা পৌঁছলেন। উপস্থিত হলেন রসুলেপাক স. এর দরবারে। তিনি স. জামা না পরেই তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পোশাক তখন বগলের নিচে ছিলো। যায়েদ ইবনে হারেছাকে দেখেই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁকে চুম্বন করলেন। তারপর জানতে চাইলেন অভিযানের পূর্ণ বিবরণ। তিনি সবকিছু খুলে বললেন।

তরফের দিকে যায়েদ ইবনে হারেছার অভিযান

এ বৎসর হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা তরফ নামক স্থানের দিকে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরের একটি কূপের নাম তরফ। তিনি পনেরোজন সাথী নিয়ে বনী ছালাবার বস্তিতে পৌঁছে গেলেন। পেলেন অনেক উট ও বকরী। সেখানকার লোকজন পূর্বেই পালিয়ে গিয়েছিলো। তিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন বিশটি উট। মদীনায় পৌঁছলেন সকাল বেলা। সংঘর্ষহীনভাবে এ অভিযান সম্পন্ন হয়।

নাজশীর দিকে

এ বৎসরেই হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা নাজশী অভিমুখে আর একটি অভিযান চালান। জায়গাটি ছিলো ওয়াদীয়ে কোরার পশ্চাদ্ভাগে। সময় জমাদিউসসানী মাস। এ অভিযানের কারণ এরকম— হজরত দাহিয়াতুল কালবী রোমের বাদশাহ্ কায়সারের নিকট গিয়েছিলেন। রসুলেপাক স.ই তাঁকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। রোমের বাদশাহ্ তাঁকে বিভিন্ন হাদীয়া এবং রাজকীয় পোশাক দান করলেন। ফেরার পথে সাক্ষাৎ হলো হুনায়দ নাজশীর গোলামদের সঙ্গে। তারা তাঁর উপর চড়াও হলো। পরে বনী তাইয়্যেব গোত্রের লোকেরাও লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলো। তারা হজরত দাহিয়াতুল কালবীর সকল মালপত্র লুটপাট করে

নিয়ে গেলো। তিনি রসুলেপাক স. এর নিকট এসে সব ঘটনা খুলে বললেন। তিনি স. হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে পাঁচশ যোদ্ধা সহকারে হজরত দাহিয়াতুল কালবীর সাথে পাঠালেন। তাঁরা দিনের বেলায় আত্মগোপন করতেন। পথ চলতেন রাতের বেলায়। একদিন সকালবেলা তাঁরা পৌঁছে গেলেন তাঁদের উদ্দিষ্ট গন্তব্যে। বস্তির অধিবাসিদেরকে হত্যা করা হলো। হত্যা করা হলো হুনায়দ এবং তার পুত্রদেরকেও। সেখান থেকে এক হাজার বকরী হস্তগত করলেন তিনি। বন্দী করলেন একশত নারী ও শিশু। এদিকে ওই বস্তির যায়েদ ইবনে রেফাআ হাযানী তার কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে একটি পত্র পেশ করলেন। তাতে লিখা ছিলো— তিনি এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সকল লোক কয়েকদিন পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। রসুলেপাক স. তৎক্ষণাৎ হজরত আলীকে হজরত যায়েদ ইবনে হারেছার কাছে পাঠালেন এই নির্দেশ দিয়ে যে, বন্দীদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। ফেরত দিয়ে দিতে হবে তাদের মালামালসমূহও।

ওয়াদীয়ে কোরার দিকে

রজব মাসে হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা ওয়াদীয়ে কোরার দিকে আরেকটি অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানে অনেক মুসলমান শহীদ হন। হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকেও মারাত্মক যখম অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে আনা হয়।

বিবৃত অভিযানদৃষ্টে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা বহু সমরাভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তন্মধ্যে কোনো কোনোটিতে মুসলমানগণ জয়ী হয়েছেন। আবার কোনো কোনোটিতে হয়েছেন পরাজিত।

বনী কাআব গোত্রের দিকে আবদুর রহমান ইবনে আউফের অভিযান

এই বৎসরেই হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফকে বনী কাআব জনপদের দিকে দুমাতুল জন্দল নামক স্থানে পাঠানো হয়। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ স. হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফকে ডেকে এনে তাঁর সামনে বসালেন। নিজ হাতে তাঁর মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিলেন। বললেন, আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর হও। কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো আল্লাহ্‌র পথে। গনিমতের মালের কোনোরূপ খেয়ানত কোরো না। শঠতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। শিশুদেরকে হত্যা কোরো না। অপর এক বিবরণে এসেছে, তিনি স. বললেন, নারীহত্যা কোরো না। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের গোত্রপ্রধানের কন্যাকে উপস্থিত কোরো।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ দুমাতুল জন্দলের দিকে যাত্রা করলেন। যথাসময়ে পৌঁছেও গেলেন সেখানে। তিনদিন অবস্থান করে সেখানকার লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন। গোত্রপ্রধান আসবাগ ইবনে আমর কালবী ইসলাম গ্রহণ করলো। তার দেখাদেখি সেখানকার আরও অনেক লোক ইসলামে দীক্ষিত হলো। যারা ইসলাম গ্রহণ করলো না, তারা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হলো।

প্রকাশ থাকে যে, প্রতিটি যুদ্ধেই এমতো নীতি অবলম্বন করা হতো। যদিও সব যুদ্ধ ও অভিযানের ক্ষেত্রে একথাটি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। এ বিধানটিই প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের বিধান। আবদুর রহমান ইবনে আউফ এই অভিযান কালে আসবাগের কন্যাকে বিয়ে করেন। তাঁর নাম ছিলো তমাযের। ওই স্ত্রীকে নিয়েই তিনি দীর্ঘদিন সংসার করেছিলেন। তাঁর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান। তিনি ছিলেন ধর্মনিষ্ঠদের অগ্রণী এবং শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী। ছিলেন মদীনার সপ্তফকীহ'র একজন।

ফাদাকের দিকে হজরত আলীর অভিযান

এই বৎসরেই হজরত আলী রা.কে একশ লোকসহকারে বনু সাআদ বিন বকরের দিকে ফাদাক নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়েছিলো। কারণ, রসুলেপাক স. সংবাদ পেয়েছিলেন, বনী সাআদ বিন বকর কবীলার লোকেরা খয়বরের ইহুদীদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রস্তুত করছে। উদ্দেশ্য সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করা। তাই তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যই হজরত আলীর নেতৃত্বে এই বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিলো। তারা রাতের বেলায় পথ অতিক্রম করতেন আর দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতেন। এক পর্যায়ে তাঁরা ফাদাক এবং খয়বরের মধ্যবর্তী স্থানে অতর্কিত হামলা চালালেন। শত্রুরা পরাজিত হলো। পাঁচশ' উট এবং এক হাজার বকরী হস্তগত হলো। হজরত আলী তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে কোনোরকম ক্ষতির সম্মুখীন না হয়েই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

উকলের ঘটনা

এ বৎসরই উকল ও ওরায়নার ঘটনা সংঘটিত হয়। এ অভিযানকে কুরয ইবনে জাবের ফেহরীর অভিযানও বলা হয়। ইবনে ইসহাক বলেছেন, এই অভিযান যীকরদ অভিযানের পর জমাদিউল উখরা মাসে সংঘটিত হয়েছিলো।

বোখারী বলেছেন, হুদায়বিয়ার পর যীলকদ মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। ওয়াকেদী বলেছেন, শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। ইবনে সাআদ ও ইবনে হেব্বান তাঁরই অনুসরণ করেছেন।

সহীহ বোখারীতে কিতাবুল মাগাযীতে হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, উকল ও ওরায়নার লোকেরা রসুলেপাক স. এর নিকট এসে মৌখিকভাবে ইসলামের স্বীকৃতি প্রদান করলো। বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা তো উট ও বকরী পালন করি। আমাদের কোনো কৃষিকাজ নেই। আমাদের মাটিতে কৃষিকাজ এবং খেজুরের চাষ হয় না। আমরা শহুরে জীবন যাপনেও অভ্যস্ত নই। মদীনার আবহাওয়া ছিলো তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। তাই তারা রোগাক্রান্ত হলো। তাদের পেট ফুলে যেতে লাগলো এবং গায়ের রঙ ফিকে হয়ে যেতে লাগলো। তখন রসুলেপাক স. তাদেরকে দু'তিন বা দশটি উট দিলেন। সেগুলোর দুধ ও প্রস্রাব পান করতে বললেন। উটগুলোকে মসজিদে কোবার পাশে ঈর নামক পাহাড়ের কাছে রাখা হলো। রসুল স. এর নির্দেশে তারা উটগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে লাগলো। ফলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলো।

এই মাসআলাটির বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যেমন— ১. যে সমস্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল তার পেশাব পবিত্র। তা যদি পবিত্র না হতো তাহলে রসুলেপাক স. তাদেরকে এরকম নির্দেশ দিতেন না। ২. পেশাব হালাল নয়। তবে এরকম হুকুম দেওয়া হয়েছিলো কেবল চিকিৎসার জন্য। আর এরকম ব্যবস্থাপত্র বৈধ। ৩. পেশাব যে নাপাক এবং হারাম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং বুঝতে হবে তিনি স. তাদেরকে এরকম হুকুম দিয়েছিলেন ওহীর অনুসরণে। অতএব, এমতো বিধান প্রযোজ্য কেবল ওই লোকদের জন্যই।

যাই হোক, লোকগুলো সুস্থ হয়ে ফিরে গেলো বটে, তবে পুনরায় কাফের হয়ে গেলো। তারা পালিয়ে গিয়েছিলো ওই উটগুলোর রাখালকে হত্যা করে। রসুলেপাক স. এ সংবাদ জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিছনে লোক পাঠিয়ে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন তাদেরকে ধরে তাদের চোখের মধ্যে লৌহদণ্ড ঢুকিয়ে দিয়ে রৌদ্রে ফেলে রাখতে হবে। এভাবে রাখতে হবে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত। এক বর্ণনায় এসেছে, তাদের কর্তিত অঙ্গগুলো যেনো আগুনে তাপ দেওয়া হয়। যেমন কাটা হাত থেকে রক্ত বন্ধ করার জন্য আগুনে সেঁক দেওয়া হয়। তবে এতো বেশী দেওয়া না হয়, যাতে মৃত্যু হয়। কিন্তু তাদের শাস্তি ছিলো— এরকম করতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত। অর্থাৎ রক্তক্ষরণ হতে হতে যেনো তাদের মৃত্যু এসে যায়। হজরত আনাস বলেছেন, তাদের একজনকে আমি দেখেছি এভাবে, যে দাঁত দিয়ে মাটি কামড়াচ্ছিলো। এভাবেই এক পর্যায়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো। বর্ণিত আছে,

তারা পানি চাচ্ছিলো। কিন্তু রসুলেপাক স. বলেছিলেন, তোমাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। এদের চোখে শলাকা ঢোকানো, হাত কেটে দেওয়া, রৌদ্রে ফেলে রাখা, দাগ না দিয়ে আগুনের তাপ দেওয়া— এসব কিছুই ছিলো কেসাসের বিধানের ভিত্তিতে। কেননা তারা রসুলেপাক স. এর রাখালদের সাথে এরকম আচরণ করেছিলো। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, এ সকল লোক উট নিয়ে যাওয়ার পূর্বে আসহাবে সুফফার লোকদের পাশে বসেছিলো। এক্ষেত্রে অজ্ঞ লোকেরা প্রশ্নের অবতারণা করতে পারে, রসুলেপাক স. তাদের এমতো অপতৎপরতা সম্পর্কে পূর্বেই কেনো বুঝতে পারেননি? তাদেরকে কেনো তিনি স. বিশ্বাস করে মুসলমানদের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন? তাদের গতিবিধির উপর সতর্ক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত না করেই কেনো মুসলমানদের থেকে পূর্বেই সরিয়ে দেননি? বলা বাহুল্য যে, এধরনের প্রশ্ন অবশ্যই অজ্ঞতাপ্রসূত। কেনো না রসুলেপাক স. এর অবহিতি সবসময়েই নির্ভরশীল ছিলো ওহী ও এলমে এলাহীর উপর। আর নিশ্চয়ই তিনি স. তখন এ সম্পর্কে কোনো ওহী পাননি। তাই তাদের বিষয়ে জানতেও পারেননি। সুতরাং বুঝতে হবে, এক্ষেত্রে এমন হেকমত নিহিত, যা 'আল্লামুল গুয়ূব' ব্যতীত আর কেউ জানেন না। এরকম বিধান সমস্ত আহলে কাশফ আরবাবে খবর ওলী আল্লাহ্গণের বেলায়ও প্রযোজ্য। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিলো আট, আর উটের সংখ্যা ছিলো পনেরো। এ অভিযানে প্রেরিত লশকরের সদস্য সংখ্যা ছিলো বিশ— যারা সকলেই ছিলেন আরোহী।

ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এর একজন গোলাম ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো ইয়াসার। একদিন তিনি স. দেখতে পেলেন, তিনি খুব সুন্দর করে নামাজ আদায় করছেন। রসুলেপাক স. খুশি হয়ে তাঁকে আযাদ করে দিলেন এবং উক্ত উটসমূহের দেখা শোনার দ্বায়িত্ব দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি উক্ত স্থানেই উট পালনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এমতাবস্থায় উরায়না গোত্রের একদল লোক এসে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলো। কিছুদিনের মধ্যে তারা জ্বর ও কাঁপুনী রোগে আক্রান্ত হলো। তাদের পেট ফুলে যেতে লাগলো। এমতাবস্থাতেই একদিন তারা হজরত ইয়াসারকে হত্যা করলো। তাঁর চোখে কাঁটা ঢুকিয়ে দিলো। অবশেষে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গেলো। রসুলেপাক স. তাদের পশ্চাতে মুসলমানদের একটি দল প্রেরণ করলেন। হজরত কুরয ইবনে জাবের ফেহরীকে ওই দলের নেতা নিযুক্ত করা হলো। তিনি তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে এলেন। তাদের হাত কেটে দেওয়া হলো। চোখের মধ্যে শলাকা ঢোকানো হলো। এভাবে সকলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা চোখের মধ্যে শলাকা ঢোকানোর বিষয়টিকে অপছন্দ করলেন। এ

প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করলেন— 'ইন্নামা জ্বাযাউ আল্ লাজীনা ইউহারিবূনাল্লাহা ওয়া রসূলাহু ...... ওলাহুম ফিল আখিরাতি আজাবুন আজীম' (যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায় ইহাই তাহাদের শাস্তি যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। দুনিয়ায় ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে)(৫ঃ৩৩)। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকের লেখক বলেছেন, ইবনে মারদুবিয়া মন্তব্য করেছেন রসুলেপাক স.ই তাদের চোখে শলাকা প্রবেশ করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আল্লাহ্তায়ালা তা পছন্দ করেননি। কিন্তু তাঁর এই মন্তব্যটি ইমাম মুসলিমের বর্ণনার পরিপন্থী। তাঁর মতে চোখের মধ্যে শলাকা প্রবিষ্টকরণ এবং এ জাতীয় কাজ সবই ছিলো কেসাসের ভিত্তিতে। তাই তা আল্লাহ্তায়ালার নিকট অপছন্দনীয়ও নয়। হতে পারে না। 'ফতহুলবারী' গ্রন্থে আছে, ইবনুত্তিবন মনে করেছেন, উকল ও উরায়না একই গোত্রের নাম। কিন্তু এ ধারণা ভুল। বরং তারা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন গোত্র। উকল আদনান কুলোদ্ভব। আর উরায়না কাহতান বংশোদ্ভূত।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহার অভিযান

এই বৎসরের ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম আর একটি ঘটনা হচ্ছে খয়বরের ইহুদী আসীর ইবনে রযমের দিকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহার অভিযান। কারণ ছিলো এরকম— আবু রাফে ইবনে আবুল হাকীকের মৃত্যু হলে ইহুদী আসীর তাদের আমীর নিযুক্ত হলো। নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর সে গাতফান ইত্যাদি গোত্রসমূহের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করলো। তাদেরকে রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করলো। কথাটা যখন রসুলেপাক স. এর কর্ণগোচর হলো, তখন তিনি স. প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য তিন ব্যক্তির সাথে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহাকে সেখানে পাঠালেন। তারা সংবাদ নিয়ে এলে তিনি স. হজরত আবদুল্লাহকেও তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা তাদের নেতার নিকটে গিয়ে বললেন, রসুলুল্লাহ স. আমাদেরকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন এ সংবাদ জানানোর জন্য যে, তুমি যেনো রসুল স. এর দরবারে হাজির হও। তিনি তোমাকে খয়বরের কর্মকর্তা বানাবেন এবং তোমাকে অনুগৃহীত করবেন। সে লোভে পড়ে গেলো এবং তার সঙ্গে তিনজন ইহুদীকে নিয়ে রওয়ানা দিলো। এরকম করলো এজন্য যে, পথিমধ্যে প্রয়োজন হলে একজন মুসলমানের মুকাবিলায় যেনো একজন করে ইহুদী দাঁড়াতে পারে। কারশরা নামক স্থানে

পৌঁছার পর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনায়স তরবারী বের করে তাকে হত্যা করলেন এবং উটে সওয়ার হয়ে সেখান থেকে দ্রুত চলে এলেন। অন্য মুসলমান যোদ্ধারা তার সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করলেন। প্রাণে বেঁচে গেলো কেবল একজন। মুসলমানদের কেউ শহীদ হননি। তাঁরা রসুল স. এর দরবারে এসে হাজির হলেন। তাদেরকে দেখে রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

হজরত আমর ইবনে উমাইয়াকে মক্কায় প্রেরণ

এ বৎসরের অন্যতম আর একটি ঘটনা হচ্ছে আমর ইবনে উমাইয়া যুমায়রীকে মক্কায় আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের কাছে প্রেরণ। কারণ ছিলো এরকম— আবু সুফিয়ান এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠিয়েছিলো নবী করিম স.কে হত্যা করার জন্য। তার প্রতি নির্দেশ ছিলো, সে ধোঁকাবাজীর আশ্রয় নিয়ে কোনোক্রমে নবী করীম স. এর কাছাকাছি পৌঁছে যাবে এবং অতর্কিতে খঞ্জর দিয়ে আক্রমণ করবে। সে মদীনায় এলো, কিন্তু নবী করীম স.কে দেখামাত্রই মুসলমান হয়ে গেলো। যার বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে খন্দকের যুদ্ধের বর্ণনার শেষের দিকে। এ সংবাদ জানার পর রসুলে আকরম স. আমর ইবনে উমাইয়া যুমায়রীকে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গী হিসেবে সঙ্গে দিলেন সালামা ইবনে আসলামকে। অপর এক বর্ণনায় আছে, জাব্বার ইবনে সাখারকে আবু সুফিয়ানের দিকে এই বলে পাঠানো হয়েছিলো যে, তাকে হাতের নাগালে পাওয়া মাত্র হত্যা করতে হবে। হজরত আমর ইবনে উমাইয়া মক্কায় পৌঁছে গেলেন। একদিন রাতের বেলায় তিনি তওয়াফ করছিলেন। হঠাৎ মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব তাঁকে দেখে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদ কুরায়েশদের কানে দেওয়া হলো। কুরায়েশরা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। লোকদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলতে লাগলো, হে মক্কাবাসী! হুঁশিয়ার! আমর ইবনে উমাইয়া এসে গেছে। তার ব্যাপারে তোমরা গাফেল থেকো না। ইসলামপূর্ব যুগে আমর ইবনে উমাইয়া অতর্কিতে মানুষ হত্যার ব্যাপারে খ্যাত ছিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে হত্যা করতে একজোট হয়ে গেলো। আমর ইবনে উমাইয়া ও সালামা ইবনে আসলাম বিষয়টি টের পেয়ে একজন থেকে আর একজন আলাদা হয়ে গেলেন। সালামা ইবনে আসলাম মদীনায় ফিরে গেলেন। আর আমর ইবনে উমাইয়া পাহাড়ে এবং মক্কার বিভিন্ন অজ্ঞাতস্থানে লুকিয়ে রইলেন। হজরত আমর ইবনে উমাইয়া স্বয়ং বর্ণনা করেন, এরকম অবস্থায় একদিন আমি ওছমান ইবনে মালেককে হাতের কাছে পেয়ে গেলাম। দেখামাত্র তার বুকে খঞ্জর ঢুকিয়ে দিলাম। সে জোরে চিৎকার করলো। সে চিৎকার শুনে অনেক লোক জমায়েত হলো। আমাকে ধরার

জন্য অগ্রসর হলো। আমি একটি গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। পরে সেখান থেকে চলে গেলাম অন্য গর্তে। সে গর্তে আমি এক চোখ অন্ধ এক লোককে দেখতে পেলাম। সে তার ছাগপালকে রৌদ্র থেকে ছায়ায় নিয়ে আসছিলো। পরে গর্তে হেলান দিয়ে বসে এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে লাগলো— 'ফালাসতা বি মুসলিমীন মা রামাত হাইইয়া ওয়া লাসতা আদইয়ানু দ্বীনিল মুসলিমীন' (আমি যতক্ষণ জীবিত থাকবো মুসলমান হবো না ও মুসলমানদের ধর্ম গ্রহণ করবো না)। তারপর সে আপন মনে রসুল স. সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলতে লাগলো। আমি অপেক্ষা করছিলাম, কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে। একসময় ঘুমিয়ে পড়লো সে। আমি তখন তার সুস্থ চোখটির উপর এমন জোরে তীর ঢুকিয়ে দিলাম যে, তীরের অগ্রভাগ পৌছে গেলো তার মগজ পর্যন্ত। একসময় ভবলীলা সাঙ্গ হলো তার। আমি গুহা থেকে বের হলাম। সামনে পড়লো কুরায়েশদের দুই গুপ্তচর। একজনের দিকে তীর ছুঁড়লাম। দ্বিতীয় জন পলায়ন করলো। আমি নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে রসুলে আকরম স. এর দরবারে উপস্থিত হলাম। আমার সাথীও নিরাপদে ফিরে এলো মদীনায়। আবু সুফিয়ান যখন সব কিছু জানলো তখন আত্মরক্ষার জন্য অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করলো। হজরত আমর ইবনে উমাইয়া যুমায়রী বলেন, আফসোস! আবু সুফিয়ানের মৃত্যু হলো না এবং সে আমার হাত থেকে বেঁচে গেলো।

এস্তেসকার দোয়া

এ বৎসরেই রসুলে আকরম স. বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন। জীবনী লেখকগণ বর্ণনা করেছেন, হিজরী ৬ষ্ঠ সালে রমজান মাসে মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। লোকেরা রসুলেপাক স.কে বৃষ্টি প্রার্থনার আবেদন জানাতে লাগলো। তিনি স. দোয়া করলেন। আল্লাহ্তায়ালা বৃষ্টি বর্ষণ করলেন।

'ছফরুস্ সাআদাত' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, রসুলেপাক স. এস্তেসকার দোয়া দু'ধরনে করেছিলেন, দুইবার। প্রথমবার জুমার দিন। জুমার খুতবা দানের সময়। তখন খুতবা পাঠের মধ্যখানেই বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, 'আল্লাহুম্মা আসক্বিনা, আল্লাহুম্মা আসক্বিনা, আল্লাহুম্মা আগশিনা, আল্লাহুম্মা আগশিনা।' বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. এর জমানায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। তিনি স. জুমার দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। পরিবার পরিজন ক্ষুধার্ত। সুতরাং আমাদের জন্য দোয়া করুন। অপর এক বর্ণনায় আছে, লোকটি বললো, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গাছগুলো হয়ে গেছে লাল। মৃত্যু ঘটেছে

প্রাণীকুলের। অন্য এক বিবরণে এসেছে, চতুষ্পদ প্রাণী, পরিবার-পরিজন এবং মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন তিনি স. দু'হাত উঠিয়ে চারবার উচ্চারণ করলেন, 'আল্লাহুম্মা আগশিনা'। আর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এরকম বলেছিলেন তিনি তিনবার। অপর এক বিবরণে আছে 'আল্লাহুম্মা আসক্বিনা' দু'বার অথবা তিনবার বলেছিলেন তিনি স.। হজরত আনাস রা. বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তখন আকাশে এক ফোটা মেঘও দেখিনি। কিন্তু তিনি স. দু'হাত নীচে নামানোর আগেই আমরা দেখতে পেলাম সারা আকাশে পাহাড়ের মত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালা। মেঘে মেঘে ভরে গেলো আকাশ। শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। সারাদিন বৃষ্টি হলো। তার পরের দিন এবং তার পরের দিনও। এমনকি পরবর্তী জুমা এসে গেলো। তবু বৃষ্টি বন্ধ হলো না। পরবর্তী জুমার দিন সেই বেদুঈন এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। সহায়-সম্পদ ডুবে গেছে। অপর এক বিবরণে আছে, লোকটি বললো, আমাদের মালমাত্তাগুলো তো ধ্বংস হয়ে গেলো। ডুবে গেলো রাস্তাঘাট। দোয়া করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেনো বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। রসুলেপাক স. দু'হাত উঠালেন। এক বিবৃতিতে আছে, তিনি স. তখন এরকম অবস্থা দেখে মৃদু হাসলেন এবং দোয়া করলেন 'আল্লাহুম্মা হাওয়ালীনা ওয়ালা আ'লাইনা' (হে আল্লাহ্! আমাদের আশপাশে বৃষ্টি দিন, আমাদের উপর নয়)। অন্য এক বিবৃতিতে আছে, তিনি স. তখন দোয়া করলেন এভাবে— 'আল্লাহুম্মা আলাল আকামি ওয়াদ্ব দ্বারাবি ওয়া বুতূনিল আওয়ারিত ওয়া মানাবাতিশ শাজার' (হে আল্লাহ! ক্ষেত-খামারে, বাগ-বাগিচায়, প্রস্রবণে ও গাছের গোড়ায় বৃষ্টি দান করুন)। দেখা গেলো তিনি স. যেদিকে হাতের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে লাগলেন মেঘখণ্ডগুলো সেদিকে ছুটে চলে যেতে শুরু করলো। এভাবে অল্পক্ষণের মধ্যে মদীনার উপর থেকে মেঘ সরে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলো। বৃষ্টি হতে লাগলো পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে। এমন অবস্থা চলেছিলো একমাস পর্যন্ত। বিভিন্ন দিকের মানুষ এসে বৃষ্টিপাতের খবর জানাতো। এক বিবরণে আছে রসুলেপাক স. এর এই দোয়ার পর মদীনার উপর থেকে বৃষ্টি সরে গেলো। এক ফোঁটা বৃষ্টিও আর হলো না। এ ঘটনাটি ঘটেছিলো মসজিদে নববীতে তাঁর ভাষণদান কালে।

বৃষ্টিপ্রার্থনার দ্বিতীয় ঘটনা

আবু দাউদ ও তিরমিজী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, লোকেরা এসে রসুলেপাক স. এর নিকট দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির অভিযোগ জানালো। রসুলেপাক স. নির্দেশ দিলেন, ঈদগাহ্ প্রান্তরে মিম্বর স্থাপন করো। সাহাবীগণকে একটি নির্দিষ্ট দিনে সেখানে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি স.। নির্দিষ্ট দিনে সকলে সেখানে পৌঁছে গেলেন। রসুলেপাক স. অত্যন্ত বিনয় ও নম্রবদনে

বাইরে বেরিয়ে এলেন। ঈদগাহে পৌছে মিম্বরের উপর আরোহণ করে খুতবা দিলেন। বললেন, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আলহামদু লিল্লাহি রববিল আলামীন। আর রহমানির রহীম। মালিকি ইয়াও মিদ্দ্বীন। লা ইলাহা ইল্লাল্লালাহু ইয়াফ'আলু মা ইউরীদ। আল্লাহুম্মা আংতা লা ইলাহা ইল্লা আংতা তাফ'আলু মা তুরীদ। আল্লাহুম্মা আংতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আংতা। আংতাল গানিয়্যু ওয়া নাহনুল ফুক্বারাআ। আংযালা 'আলাইনাল গাইছা ওয়াজ্ব'আল মা আংযালতা লানা ক্কুওওয়াতা ওয়া বিলা'আন ইলা হীন' (আল্লাহ্র নামে আরম্ভ যিনি করুণাময় ও দয়ালু। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি সকল আলমের প্রভুপালক। যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। যিনি কিয়ামত দিবসের মালিক। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তুমি যা চাও তাই করতে পারো। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ্। তুমি ছাড়া কেনো ইলাহ্ নেই। তুমি ধনী আর আমরা দরিদ্র। দয়া করে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো। আর তুমি যা অবতীর্ণ করবে, তা আমাদের জন্য বানিয়ে দাও শক্তিপ্রদায়ক আর একটি সময় পর্যন্ত পৌছার উসিলা)। তারপর তিনি স. দু'হাত উঠিয়ে কাকুতি মিনতি ও রোনাজারী শুরু করে দিলেন। দু'হাত এতো উঁচুতে তুললেন যে, তাঁর পবিত্র বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হলো। অতঃপর কেবলার দিকে মুখ করে উপস্থিত মুসল্লীদের দিকে পিঠ দিয়ে গায়ের পবিত্র চাদর এমনভাবে স্কন্ধদেশে স্থাপন করলেন যে, ডানের অংশ বামে, বামের অংশ ডানে চলে গেলো। বাইরের অংশ ভিতরে চলে গেলো। আর ভিতরের অংশ বেরিয়ে এলো বাইরে। তাঁর পবিত্র চাদর ছিলো কাল রঙের। এমনি অবস্থায় তিনি স. কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন। তারপর মিম্বর থেকে নেমে এসে নামাজ আরম্ভ করলেন। আজান ও একামত ছাড়া দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। সশব্দে ক্বেরাত পাঠ করলেন। প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহাসহ পাঠ করলেন সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতেহার পর হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়াহ্। সুরা ক্বাফ ও ইকতারাবাতিস সা'আহ পাঠ করেছেন বলেও বর্ণিত আছে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের শেষাংশে আছে, তিনি স. যখন নামাজ শেষ করলেন, তখন আল্লাহ্তায়ালা বিদ্যুৎ ও গর্জন সহকারে বৃষ্টি নামালেন। শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। এমনকি মসজিদে নববী পর্যন্ত পৌছার পথে পানির স্রোত প্রবাহিত হতে লাগলো। তিনি স. যখন লক্ষ্য করলেন জনগণ বিচলিত, তখন মৃদু হাসলেন। সে হাসিতে উদ্ভাসিত হলো তাঁর পবিত্র দন্তরাজি। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্তায়ালা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং রসুল।

বৃষ্টিপ্রার্থনার তৃতীয় ঘটনা

মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে জুমার নামাজ ছাড়া অন্য সময় বৃষ্টির প্রার্থনার আর একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। বায়হাকী তাঁর 'দালালায়েলুন্ নবুওয়াত' পুস্তকে এযীদ ইবনে আবদুল্লাহ সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকরম স. যখন তবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বনী ফারাযা গোত্রের নারী ও শিশুদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন। তারা অনাবৃষ্টির অভিযোগ করে বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার প্রভুপালকের কাছে আমাদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। আর তাঁর নিকট আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। তিনি যেনো আপনার খাতিরে সে শাফায়াত কবুল করে নেন। তিনি স. বললেন, সুবহানাল্লাহ্! তোমাদের জন্য আক্ষেপ! সব শাফায়াত কাম্য কেবল তোমাদের প্রভুপালকের কাছেই। এমন কেউ কি আছে, যে প্রভুপালকের কাছে অন্য কারো জন্য শাফায়াত করবেন? 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল 'আলিউল আজীম'। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের ফরিয়াদ ও আহাজারী শুনেছেন এবং তোমাদের অবস্থা দেখে মৃদু হেসেছেন, যেমন হাসি তাঁর মহামর্যাদার উপযোগী। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো এক বেদুঈন। সে বললো, রাব্বুল ইয্যত কি তাহলে মৃদু হাসতে পারেন? তিনি স. বললেন, হাঁ। পারেন। লোকটি বললো, তাহলে তো আমরা কখনও তার কাছে কল্যাণ চাইবো না। তিনি তো এমনিতেই আমাদের প্রতি প্রীত। বেদুঈনের কথা শুনে রসুলেপাক স. হেসে ফেললেন। তারপর মিম্বরে আরোহণ করে দু'হাত প্রসারিত করে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে লাগলেন। এরপর বৃষ্টি হলো এক সপ্তাহ ধরে। লক্ষণীয়, এই বিবরণটিতে এস্তেসকার নামাজ ও খুতবা পাঠের কথা নেই। রয়েছে কেবল দোয়া করার কথা।

চতুর্থ ঘটনা

এই বিবরণে রসুলুল্লাহ স. মদীনা শরীফের মসজিদে বৃষ্টির জন্য বসে বসে দোয়া করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। নামাজও পড়েননি। মিম্বরেও আরোহণ করেননি। তিনি স. প্রার্থনা করেছিলেন এ কথা বলে— 'আল্লাহুম্মা আসক্বিনা গাইশান মারী 'আন 'আজ্বিলিন গাইরা শাই্ইন'। এক বিবরণে এসেছে, তিনি বলেছিলেন— 'আজ্বিলান গাইরা আজিলিন নাফিআন গাইরা দ্বারিন'।

পঞ্চম ঘটনা

রসুলে আকরম স. মদীনা শরীফের কোনো এক জায়গায় দোয়া করেছেন। জায়গাটি মসজিদে নববীর বাইরে যাওরা নামক স্থানের কাছাকাছি। যাকে আহজার যযায়তও বলা হয়। স্থানটি ছিলো মসজিদে নববীর বাবুস সালামের কাছেই।

ষষ্ঠ ঘটনা

বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রেও বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন তিনি স.। কোনো কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে মুশরিকরা পানির উৎসসমূহ দখল করে নিয়েছিলো। জলাশয়ের কাছে তাঁবু গেঁড়েছিলো। মুসলমানরা অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন পানিবিহীন প্রান্তরে। পানির তীব্র পিপাসা যখন অনুভূত হলো, তখন তাঁরা রসুলেপাক স. এর দরবারে পানির জন্য আবেদন করলেন। মুনাফিক ও মুশরিকেরা তখন বলতে লাগলো, মোহাম্মদ যদি নবীই হবেন, তবে মুসলমানদের জন্য পানির ব্যবস্থা অবশ্য করবেন। যেমন মুসা করেছিলেন তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের জন্য। তাদের এ কথা যখন রসুলে আকরম স. এর নিকট পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, তারা তাহলে এমন কথাও বলে? ঠিক আছে। হে মুসলমানগণ! তোমরা নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকেও পানি দান করতে পারেন। তিনি দু'হাত তুলে দোয়া শুরু করলেন। তৎক্ষণাৎ আকাশে মেঘ দেখা গেলো। অন্ধকার হয়ে গেলো চারিদিক। বৃষ্টি পড়তে লাগলো অঝোর ধারায়। বড় বড় উপত্যকাগুলোও হয়ে পড়লো জলমগ্ন। রসুলুল্লাহ স. এর এরকম বৃষ্টিপ্রার্থনার ছয়টি ঘটনার বিবরণ রয়েছে 'ছফরুস্ সাআদাত' গ্রন্থে।

রসুলেপাক স. এর কুরায়েশদের ব্যাপারে দুর্ভিক্ষের জন্য অপপ্রার্থনার কথাও কতিপয় বিবরণে এসেছে। ওই সময় তিনি স. বলেছিলেন— 'আল্লাহুম্মা সিনীনা কাসিনী ইউসুফ' (হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশদের জন্য নবী ইউসুফের জামানার মতো জামানা দাও)। এক বিবরণে আছে, তিনি স. বলেছিলেন সাব'আন সাবি'ই লিইউসুফ ' (ইউসুফের সাত বৎসরের ন্যায় ওদেরকে সাত বৎসর দাও)। এরপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিলো। তারা উপায়ন্তর না দেখে রসুলেপাক স. এর দরবারে এসে অনেক কাকুতি মিনতিও করতে বাধ্য হয়েছিলো। বিখ্যাত বিবরণগুলোতে ওই দুর্ভিক্ষের কথা আছে।

রসুলেপাক স. এর পবিত্র অভ্যাস ছিলো এরকম— বৃষ্টিপ্রার্থনার প্রাক্কালে তিনি তাঁর পবিত্র শরীরের কিছু অংশ অনাবৃত রাখতেন, যাতে করে বৃষ্টির পানি তাঁর শরীরে এসে লাগে।

ইমামে আজম আবু হানীফার মতে বৃষ্টিপ্রার্থনার জন্য কোনো নামাজ পড়ার রীতি নেই। বৃষ্টিপ্রার্থনার জন্য কেবল দোয়া ইস্তেগফার করতে হবে। তাঁর দলিল হচ্ছে আল্লাহ্পাকের বাণী— 'ইস্তাগফিরু রব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারাইঁ ইউরসিলিস্ সামাআ আলাইকুম মিদ্রারা' (তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করিবেন)(৭১ঃ১০-১১)। অধিকাংশ হাদিসে এস্তেসকার নামাজের কথা নেই। একটি মাত্র হাদিসে নামাজের কথা উল্লেখ আছে। তিনি ঈদগাহে গিয়েছেন।

দু'রাকাআত নামাজ পড়েছেন এবং খুতবা দিয়েছেন। এই হাদিসটির সূত্রপরম্পরা তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যাবলী সত্ত্বেও বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌছেনি। অথবা ওই ঘটনাটি ছিলো কেবল রসুলেপাক স. এর জন্যই বিশিষ্ট। এটা তাঁর সুন্নত তো তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন তিনি এই আমলটি সকল ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সাথে করতে থাকবেন। কোনো কোনো সময় বাদ দিলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তো করবেনই। কিন্তু তিনি এমতো আমল করেছেন মাত্র একবার। দ্বিতীয়বার কখনও নয়। এরকম বিশুদ্ধ বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুকও তাঁর খেলাফতকালে বৃষ্টির জন্য শুধু দোয়া এস্তেগফারই করেছিলেন। এস্তেসকার নামাজ যদি মাসনুন হতো তাহলে তা অবশ্যই হজরত ওমরের জানা থাকতো। তাছাড়া তাঁর কালও ছিলো নবুওয়াতের কালের নিকটবর্তী। আর যারা বলে যে, হজরত ওমরের মতে এস্তেসকার নামাজ ওয়াজিব নয় তাদের কথার অর্থ হচ্ছে, হজরত ওমর এস্তেসকার নামাজকে জামাত ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের আলোকে সুন্নত বলেননি। কেউ যদি এমন একা নামাজ পড়ে বিনয় ও আহাজারী প্রকাশ করে দোয়া এস্তেসকা করে তবে তা কেবল শুদ্ধই হবে না, অধিকতর সুন্দরও হবে। মোটকথা এস্তেসকার ব্যাপারে যতগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনোটিরই সূত্রপরম্পরা বিভ্রাট থেকে মুক্ত নয়। এমন অনেক হাদিস আছে যা উক্ত বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাসম্বলিত হওয়ার কারণে দুর্বল আখ্যাযোগ্য। তাই ইমামে আজম কথিত হাদিসসমূহের সারমর্ম ও উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য শুধু দোয়া করতে হবে। কেবল দোয়াই এস্তেসকা।

সাহেবাইন (ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ) এবং ত্রয়ী ইমাম (ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহাম্মদ ইবনে হাম্বল) এর মতে এস্তেসকার মধ্যে জামাত ও খুতবা সহকারে নামাজ পড়া মাসনুন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এ মতটি গ্রহণ করেছেন ইমাম মোহাম্মদ। আর ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানিফার মতের সঙ্গেই আছেন। তবে এখন হানাফি মাযহাবে উক্ত মাসআলার বিষয়ে সাহেবাইনের মতের উপরই ফতওয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উলামায়ে কেরাম বলেন, এস্তেসকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সুন্নতের অনুসরণ। এতে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া এবং দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি নিছক আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের উপরেই নির্ভরশীল।

হুদায়বিয়ার ঘটনাবলী

ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে সোমবার দিন রসুলেপাক স. ওমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছলেন। হুদায়বিয়া মক্কা মুকাররমার নয় মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটি হেল ও হেরেমের সংযোগস্থল।

উলামায়ে কেরাম বলেন, এর অধিকাংশ এলাকা হেরেমের মধ্যে পড়েছে। আসলে হুদায়বিয়া একটি কূপের নাম অথবা কোনো বৃক্ষের নাম। যে বৃক্ষ একসময় সেখানে ছিলো। পরে বৃক্ষটির নামানুসারেই উক্ত স্থানের নাম হয় হুদায়বিয়া। জায়গাটির বিশেষ অংশ রসুলে আকরম স. এর সময় থেকেই সুপরিচিত ছিলো। পরে সাহাবায়ে কেরামের সময়ে সে স্থানটি অ-সনাক্ত হয়ে যায়। তাই পরবর্তী কালের মানুষ স্থানটি দর্শন করার বরকত থেকে বঞ্চিত। যে দিক থেকে তিনি স. সেখানে প্রবেশ করেছিলেন সে দিকটি তো অজানা নয়, কিন্তু বায়াতের বিশেষ জায়গাটি সুনির্দিষ্টভাবে আর সনাক্ত করা যায় না। সহীহ্ বোখারীতে বিশিষ্ট তাবেয়ী সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেব তাঁর পিতা, যিনি ওই বায়াতে শরীক ছিলেন, হজরত মুসাইয়্যেব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা পরবর্তী বছরে যখন সেখানে গেলাম, তখন জায়গাটি আর চিনতে পারলাম না। তারেক ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, একবার আমি হজ্বে গেলাম। দেখলাম, একদল লোক হুদায়বিয়ায় নামাজ পড়ছে। উল্লেখ্য, সে সময় মক্কায় প্রবেশের একমাত্র রাস্তা ছিলো হুদায়বিয়া। তখন মক্কায় পৌঁছতে গেলে হুদায়বিয়ার ডান দিক দিয়ে যেতে হতো। তিনি বলেন, আমি একদল লোককে সেখানকার মসজিদে নামাজ পড়তে দেখে তাদেরকে প্রশ্ন করলাম, এটা কোন মসজিদ? এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে কেনো? তারা বললো, এখানেই এক বৃক্ষের নীচে সাহাবায়ে কেরাম বায়াত গ্রহণ করেছিলেন, যে বায়াতের নাম বায়াতে রেদওয়ান। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'লাক্বাদ রদ্বি ইয়াল্লাহু 'আনিল মু'মিমীনা ইজ্ ইউবাই'উনাকা তাহ্তাশ শাজারাহ্' (আল্লাহ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হইলেন যখন তাহারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করিল)। জনগণ এখানে মসজিদ বানিয়েছে। যেমন মদীনায় রসুলেপাক স. এর সমস্ত স্মৃতিবিজড়িত স্থানে এবং রাস্তায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। লোকেরা এ সমস্ত স্থানকে বরকতময় মনে করে এখান থেকে বরকত হাসিল করে এবং নামাজ আদায় করে।

তারেক বলেন, একবার আমি মদীনায় এসে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের নিকট হাজির হলাম এবং তাঁর কাছে হুদায়বিয়ার মসজিদের সবকিছু কথা বললাম। তিনি বললেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, যে স্থানে বৃক্ষ ছিলো, সে স্থানের কথা আমাদেরকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা এখন আর সে স্থান নির্ধারণ করতে সক্ষম নই। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব আরও বললেন, রসুলেপাক স. এর সাহাবীগণ যে স্থান হারিয়ে ফেলেছেন তা তোমরা চিহ্নিত করলে কীভাবে? তোমরা কি তাঁদের চেয়ে বেশী জানো? অথচ সাহাবায়েকেরাম এলেম ও মারেফতের দিক দিয়ে অট্টালিকাতুল্য। রসুলেপাক স. এর সোহবতের বরকতে তাঁরা হয়েছেন উম্মতের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব। তোমরা তো নিজেদের ধারণা অনুসারে সেখানে মসজিদ বানিয়েছো। নির্দিষ্ট করে ওই জায়গাটি চিহ্নিত করা এখন আর সম্ভবই নয়। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের উক্তি থেকে এ কথাটি

সুস্পষ্ট হয় যে, বুযুর্গ ও নৈকট্যপ্রাপ্তদের মুকাবিলায় কারও অধিক এলেম থাকার দাবী অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য। তাঁরা যা বলেন, তাকেই যথেষ্ট মনে করা এবং তা মেনে নেওয়া উচিত। এটাই আদব।

হুদায়বিয়ার যাত্রায় মুসলমানদের লোকসংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। লোকসংখ্যা পনেরো, চৌদ্দ ও তেরো শ' ছিলো বলে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। বর্ণনার বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে এভাবে যে, প্রকৃতপক্ষে লোকসংখ্যা ছিলো চৌদ্দ শ' এর অধিক। যারা পনেরো শ' ছিলো বলে বর্ণনা করেছেন তারা শতকের উপরের সংখ্যাগুলোকে পূর্ণ করে পনেরো শ'ই বলেছেন। আর যাঁরা চৌদ্দ শ' বলেছেন তাঁরা শতকের উপরের সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে সোজা চৌদ্দ শ' বলে দিয়েছেন। হিসাবের ক্ষেত্রে আরবে এরকম রীতি প্রচলিত। এটি সহজ হিসাবের একটি পদ্ধতি। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা এরকম বলেছেন। এক বর্ণনায় আছে, তাঁদের সংখ্যা ছিলো পনেরো শ' বিশ। সংখ্যা নিরূপণের জটিলতা এভাবে দূর করাই সমীচীন। রসুলে আকরম স. হুদায়বিয়ার বৎসরে চৌদ্দ শ' এর কিছু অধিক সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা শরীফ থেকে বের হয়েছিলেন। ইমাম নববী তাঁর রচিত গ্রন্থে এই সংখ্যাকে গ্রহণ করেছেন। এখন আসা যাক তেরো শ' বর্ণনার বিষয়ে। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, বর্ণনাকারী ওই সংখ্যা সম্পর্কেই জানতে পেরেছিলেন। এর অধিক সম্পর্কে তাঁর জানা ছিলো না। কিন্তু যাঁরা তাঁদের সকলকে দেখেছেন তাঁরা অধিকসংখ্যকের কথা বর্ণনা করেছেন। কিছুসময় পর আরও কিছুসংখ্যক লোক এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী তাঁদেরকে দেখেননি। তাই তাঁরা পূর্বের সংখ্যাই উল্লেখ করেছেন। আর যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা উল্লেখ করেছেন সমষ্টিভূত সংখ্যার কথা। উসুলে হাদিসে এই নীতিটি সাব্যস্ত হয়েছে যে, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক আধিক্য আনয়ন গ্রহণযোগ্য। প্রকাশ থাকে যে, এধরনের সমাধান ষোল শ' বা সতের শ' সম্পর্কিত যেসব বর্ণনা এসেছে সে ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

হুদায়বিয়ার সফরসঙ্গীদের সংখ্যার ব্যাপারে যা বলা হলো তার বাহ্যিক বাক্য ছিলো এরকম— হাজার এবং চার শ' অথবা হাজার ও পাঁচ শ' অথবা বলা হয়েছে হাজার ও তিনশ'। এভাবে কিন্তু বলা হয়নি চৌদ্দ শ', পনের শ' এবং তের শ'। তার ব্যাখ্যা এভাবে হতে পারে যে, শ' শ' এর যে গ্রুপ তা ভিন্ন ভিন্ন ছিলো। এক্ষেত্রে তের শ', চৌদ্দ শ' বা পনের শ' শব্দ ব্যবহার করা যায় না। এ সূক্ষ্ম বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

হুদায়বিয়ার অভিযান ইসলামের পরবর্তী মহান বিজয়ের সূচনা করেছিলো। হজরত বারা ইবনে আযেব বলেন, তোমরা 'ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাতহাম মুবিনা' (নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি) দ্বারা মক্কাবিজয়কে বুঝে থাকো। মক্কাবিজয় তো অবশ্যই বিজয় কিন্তু আমরা বায়াতে রেদওয়ানকেই প্রকৃত বিজয় মনে করি। তার মানে হচ্ছে, মক্কাবিজয় তো কেবলই বিজয় আর বায়াতে রেদওয়ান হচ্ছে মহান বিজয়। 'ইন্না ফাতাহ্না' আয়াতের মাধ্যমে যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ আছে। তা মক্কা বিজয় নাকি হুদায়বিয়ার

বিজয়, না তৎপরবর্তী অন্যান্য বিজয়সমূহ। ইমাম বায়যাবী বলেছেন, এ আয়াতের দ্বারা মক্কাবিজয়ের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। আর তাতে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করার মাধ্যমে তার অবশ্যম্ভাবী বাস্তবায়নের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ বিজয় দ্বারা বুঝানো হয়েছে সকল বিজয়কে। এ বৎসরেই রসুলেপাক স. যে সব বিজয় লাভ করেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে খয়বর এবং ফাদাক বিজয়। কেউ কেউ মনে করেন, এ দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধির সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর তাকে বিজয় হিসাবে আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে— এর মাধ্যমে রসুলেপাক স. এর কাফেরদের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কাফেররা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলো। এই সন্ধিই ছিলো মক্কাবিজয়ের কারণ ও সূচনা। এই সন্ধির ফলে রসুলেপাক স. সমস্ত আরব জাহানের প্রতি মনযোগ দেওয়ার অবকাশ পেয়েছিলেন। এই সন্ধির পরেই তিনি স. বহু যুদ্ধ করেছেন এবং অনেক যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন এবং বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। হুদায়বিয়ায় অনেক বড় বড় নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিলো। রোম বিজয় ও পারস্যের উপর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এ বৎসরেই। সুরা রুমের মাধ্যমে রোম বিজয় সম্পর্কে রসুলেপাক স.কে অবহিত করা হয়েছিলো। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, 'ফতহে মুবীন' (প্রকাশ্য বিজয়) এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতভেদ বহু পুরানো। তবে প্রকৃত কথা এই যে, বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে বিজয়ের কথা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও 'ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাতহাম্ মুবীনা' (নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়) এর অর্থ হুদায়বিয়াই হবে। কেননা হুদায়বিয়াই ছিলো চূড়ান্ত বিজয়ের উৎস ও সূচনা। আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র বলেছেন, 'ওয়া আছাবাহুম ফাতহান ক্বারীবা' (এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়) এই আয়াত দ্বারা খয়বর বিজয় বুঝানো হয়েছে। আবার আল্লাহ্তায়ালা অন্য এক জায়গায় বলেছেন, 'ফাজ্বা'আলা মিন দূনী জালিকা ফাতহান ক্বরীবা' (ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়)(৪৮ঃ২৭) এ দ্বারাও হুদায়বিয়ার বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'ইজা জ্বাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ্' (যখন আসিবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়) (১০০ঃ১) এ দ্বারা মক্কাবিজয়কে বুঝানো হয়েছে।

জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকরম স. একদা স্বপ্নে দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে যিয়ারত ও ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমা গিয়েছেন এবং কাবাগৃহের চাবি তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছে। কতিপয় সাহাবী মস্তক মুণ্ডন করেছেন আর কতিপয় চুল কর্তন করেছেন। তিনি স. তাঁর সাহাবীগণকে যখন এ স্বপ্নের কথা শোনালেন তখন তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা ধারণা করলেন, এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়তো এ বৎসরেই হবে। কিন্তু হুদায়বিয়ার ঘটনা যখন অন্য দিকে মোড় নিলো তখন রসুলেপাক স. বললেন, আমি কি তখন এরকম বলেছি যে, এ স্বপ্ন এ বৎসরেই ফলবে?

হুদায়বিয়ার ঘটনাপ্রবাহ

রসুলে আকরম স. স্বপ্নটি দেখার পর সফরের আসবাবপত্র প্রস্তুত করতে লেগে গেলেন। সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি ওমরা পালন করার জন্য মক্কা যাবো। তোমরাও প্রস্তুতি গ্রহণ করো। তারপর তিনি স. মদীনা থেকে বাইরে এলেন এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদীনার খলিফা নিযুক্ত করলেন। অধিকাংশ সাহাবী সঙ্গে নিলেন কেবল তলোয়ার। এজন্য নিলেন যে, সে কালে তলোয়ারকে মুসাফিরের হাতিয়ার বলে গণ্য করা হতো। সাহাবীগণের কেউ কেউ সমস্ত শরীর অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি স. এমতো কাজকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিলেন না। কোরবানীর জন্য উট একত্রিত করলেন। উটের সংখ্যা ছিলো সত্তরটি। এগুলো ছিলো বদরের যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত আবু জাহেলের উটসমূহ। তিনি স. পশুগুলোকে বিশেষভাবে নিজের মালিকানায় রেখেছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে যাদের সঙ্গতি ছিলো, তাঁরা কোরবানীর জন্য উট সঙ্গে নিলেন। এরপর তিনি স. জুলহুলায়ফায় পৌঁছে সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করলেন। উটগুলোকে কেলাদা পরিয়ে দিলেন এবং এশআর করলেন। সাহাবীগণও তাঁর অনুসরণ করলেন। এশআর বলা হয় উটের কুঁজের দু'দিক থেকে সামান্য কেটে দেয়াকে, যাতে করে রক্ত প্রবাহিত হয়। এটি একটি সুন্নত আমল। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেনো কাটাটি গভীর না হয়। ইমাম আবু হানিফা এশআর করাকে মাকরুহ বলেছেন বলে জানা যায়। অবশ্য অন্যান্য ইমামগণ একারণে তাঁকে দোষারোপ করেছেন। কারণ সহীহ্ হাদিস দ্বারা এশআর বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাঁরা বলেন, এ কাজকে মাকরুহ বলা সঙ্গত নয়। ইমাম আবু হানিফা অবশ্য জখম গভীর হয়ে যাওয়ার আশংকার পরিপ্রেক্ষিতেই একে মাকরুহ বলেছেন। কেননা সর্বসাধারণ এশআর করা কালে গভীর জখম করে থাকে। আর এশআর করার উদ্দেশ্য কোরবানীর পশুকে চিহ্নিত করা মাত্র। উটের গলায় জুতাসমূহ ঝুলিয়ে দেওয়াও এ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সুন্নত।

রসুলেপাক স. এর আগমনের সংবাদ যখন কুরাইশরা জানতে পারলো, তখন তারা এই মর্মে একতাবদ্ধ হলো যে, তাঁকে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তারা তাদের মতের সপক্ষে আশেপাশের লোকদেরকেও একত্রিত করতে লাগলো। যুদ্ধের পূর্ণপ্রস্তুতি নিয়ে তারা মক্কা থেকে বেরিয়ে এলো। মক্কার বাইরে জেদ্দার দিকে বালদা নামক স্থানে এসে তাঁবু ফেললো। খালেদ ইবনে ওলীদ এবং ইকরামা ইবনে আবু জাহেলকে প্রত্যেক দলের অগ্রভাগের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তিনি স. যখন জানতে পারলেন কাফেররা মুসলমানদেরকে বাধা প্রদান করবে, তখন সাহাবীগণকে পরামর্শের জন্য একত্রিত করলেন। বললেন, যারা কুরাইশদের

সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে, আমরা কি তাদের পরিবার পরিজনদের উপর আক্রমণ করবো? তারা তখন পরিবার-পরিজনদেরকে রক্ষা করার জন্য কুরাইশদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। তখন কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য সহজতর হয়ে যাবে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা এ বৎসর ওমরার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি; কারও সাথে যুদ্ধ করার নিয়তে এবং তার প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি। আমাদের এ উদ্দেশ্যের উপরই স্থির থাকা উচিত। তবে মক্কায় প্রবেশ করতে তারা যদি আমাদেরকে বাধা দেয়, তাহলে অবশ্যই আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তিনি স. হজরত আবু বকর সিদ্দীকের অভিমতকে পছন্দ করলেন এবং তাঁর মতামতকে সঠিক বলে সিদ্ধান্ত দিলেন। ঘোষণা দিলেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যাত্রা করো। রসুলেপাক স. এর ইচ্ছা এরকমই ছিলো। তবে সাহাবায়ে কেরামের মনের ভাব জানার জন্য তিনি এরকম বলেছিলেন। মসনদে ইমাম আহমদের হাদিসে অধিক কিছু বর্ণনা এসেছে। তখন আবু হুরায়রা বলেছিলেন, আমরা রসুলুল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক বেশী পরামর্শকারী হিসাবে আর কাউকে দেখিনি। তারপর রসুলেপাক স. বললেন, গামীম নামক স্থানে খালেদ ইবনে ওলীদ কুরাইশদের অগ্রগামী দলটি নিয়ে বসে আছে। তোমরা ডান দিকের রাস্তা দিয়ে চলো। যেনো প্রত্যুষে অকস্মাৎ তাদের নিকটে পৌঁছে যাওয়া যায়। জীবনীরচয়িতাগণ বলেন, মুসলমানগণ যে পথটি ধরেছিলেন তা ছিলো বন্ধুর। তাই ওই পথযাত্রা ছিলো কষ্টকর। তিনি স. পাথুরে কঠিন রাস্তায় চলতে গিয়ে যখন সাহাবায়ে কেরামকে জখমপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে বললেন, এটি জান্নাতের দরজাসমূহের অন্যতম। এই বিবরণটি 'মাআরেজুন নবুওয়াত' থেকে প্রাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে 'হাফ্‌ফাতিল জ্বান্নাতি ফিল মাকারিহ্' (বেহেশত কণ্টকাকীর্ণ জিনিসসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত) এর পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি স. ওরকম করে বলেছিলেন। আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট সহ্য তো করতেই হয়। তিনি স. তখন বারবার বেহেশত ও দোযখের উদাহরণ দিচ্ছিলেন। যেমন বলেছিলেন, 'রাআইতুল জ্বান্নাতা ফি হাজাল হায়িতি' (আমি এ দেয়ালের মধ্যে বেহেশত দেখতে পাচ্ছি)। এক সময় পাহাড়ী পথ শেষ হলো। এসে পড়লো সমতল ভূমি। তিনি স. পাঠ করলেন, নাস্তাগফিরুল্লহ্ ওয়া নাতুবু ইলাইহি। ওই সময় তাঁর এমতো ইস্তেগফার করার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিলো যে, কঠিন পথ অতিক্রম করার কালে হয়তো কারও অন্তরে অসুন্দর কোনো কিছুর উদয় হয়ে থাকবে। তাই তিনি স. ইস্তেগফারের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করে নিলেন। সে সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! মুজাহিদগণের আগমন ও অবস্থান সম্পর্কে খালেদ বিন ওলীদ ওই সময় পর্যন্ত জানতে পারেনি, যতক্ষণ না ইসলামী বাহিনীর ধূলারাশি তার চোখের মধ্যে পতিত হয়েছিলো। খালেদ বিন ওলীদ তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কুরাইশদের

সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়ে তাদেরকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে। রসুলেপাক স. যখন হুদায়বিয়ার নিকটবর্তী ছানিয়া নামক স্থানে পৌছলেন, তখন তাঁর উটনী 'কাসওয়া' হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। লোকেরা তাকে উঠানোর জন্য বহু চেষ্টা করলো এবং হল হল বলে সজোরে আওয়াজ করলো। কিন্তু তাকে উঠানো গেলো না। কেউ কেউ বললো, 'খালাআতিল কাসওয়া' (কাসওয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে)। রসুলেপাক স. বললেন, কাসওয়া ক্লান্ত হয়নি এবং এটা এর স্বভাবও নয়। হস্তিবাহিনীকে যিনি প্রতিহত করেছিলেন তিনিই এর গতি রুদ্ধ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ কাবাগৃহকে ধ্বংস করার জন্য যে হস্তিবাহিনী এসেছিলো, সে বাহিনীকে যিনি প্রতিহত করে দিয়েছিলেন, কাসওয়ার বেলায়ও সম্ভবতঃ সে হুকুমই কার্যকর হয়েছে। কেননা সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় প্রবেশ করতে চাচ্ছিলেন আর কুরাইশরা তাঁদেরকে বাধা প্রদান করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো। এমতাবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিলো। আর হেরেমের সীমানার মধ্যে যুদ্ধ করা হেরেমের হুরমতের পরিপন্থী। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামেরও যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি ও প্রস্তুতি ছিলো না। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে এহেন কর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখলেন। বিষয়টি যখন রসুলুল্লাহ্ স. এর কাছে সুস্পষ্ট হলো এবং তাঁর উন্নত চিন্তায় তা রেখাপাত করলো, তখন তিনি বললেন, শপথ ওই পবিত্র সত্তার, যার কুদরতী হস্তে আমার জীবন, এখন কুরাইশরা কাবাগৃহের সম্মানার্থে যা কিছুই বলবে, আমি তাই কবুল করে নিবো। তারপর তিনি উটনীকে ইশারা করলেন, আর অমনি সে দাঁড়িয়ে গেলো এবং চলতে শুরু করলো। রসুলেপাক স. এবার প্রচলিত পথ ছেড়ে দিয়ে হুদায়বিয়ার প্রান্তরে কূপের কিনারায় অবতরণ করলেন। কূপে পানি ছিলো খুব কম। লোকেরা তা থেকে অল্প অল্প করে পানি উঠালো। অল্পক্ষণ পরেই কূপের পানি শেষ হয়ে গেলো। পরক্ষণেই বিলকুল শুকিয়ে গেলো। সাহাবায়ে কেরাম জানালেন, তাঁরা পিপাসিত। রসুলেপাক স. একটি তীর নিয়ে ধনুকে স্থাপন করলেন এবং কূপের ভিতরে তীরটি নিক্ষেপ করলেন। তীরটি কূপের তলদেশে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে পানির প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে গেলো। সকলে পর্যাপ্ত পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলেন। স্থানটিতে পানির অভাব খুব প্রকট ছিলো। তাই সেখানে এভাবে কয়েকবার মোজেজা প্রকাশ পেয়েছিলো। তন্মধ্যে এটি ছিলো অন্যতম। আরেকবার যখন এরকম পানির স্বল্পতা দেখা দিলো, তখন তিনি স. কূপের কিনারায় বসে অজু করলেন। অজু ও কুলি করার পানি কূপের ভিতর ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কূপের পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। সকল মানুষ ও পশু পরম তৃপ্তি সহকারে সে পানি পান করলো। আরেকবার লোকজন এসে বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্র রসুল! এখন কারো কাছে এক ফোঁটা পানি নেই। আপনার পেয়ালাটিই কেবল পানিপূর্ণ। তিনি স. অজু করলেন। স্বীয় পবিত্র হস্ত পেয়ালার মধ্যে রেখে দিলেন। দেখা গেলো তাঁর হাতের আঙ্গুল থেকে ঝর্ণার ন্যায় পানি

প্রবাহিত হচ্ছে। হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত জাবেরকে লোকেরা একবার জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের লোকসংখ্যা কত ছিলো? তিনি বললেন, পনের শত। তবে এক লাখও যদি আমরা হতাম তবুও পানির অভাব পড়তো না। অন্য আর একদিনের ঘটনা। লোকেরা এসে পানিহীনতার অভিযোগ করলো। তিনি স. দোয়া করলেন। অমনি বৃষ্টি বর্ষিত হলো। সবকিছুই জলে জলাকার হয়ে গেলো। হাদিসটি বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। রাতে বৃষ্টি হলো। তিনি স. ফজরের নামাজ শেষ করে সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা কি জানো তোমাদের প্রভুপালক কী বলেন? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা বলেন, আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি, আর আমার বান্দারা ওই অবস্থায় সকাল যাপন করে, যাতে কেউ হয় কাফের এবং কেউ হয় মুমিন। অর্থাৎ তখন যদি তারা বলে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অনুগ্রহে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, সে হয় আমার মুমিন বান্দা। আর যে বলে, তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার সাথে কুফুরীকারী। কেউ যদি এরকম বলে যে, চন্দ্র ওমুক মঞ্জিলে আসার কারণে বৃষ্টি হয়, সে যদি এরকম আকিদা রাখে যে, চন্দ্র ওমুক মঞ্জিলে এলে অবশ্যই বৃষ্টি হবে আর না এলে বৃষ্টি হবে না, তাহলে তার এমতো অপবিশ্বাস হবে কুফুরী। আর যদি এরকম আকিদা রাখে এবং বলে যে, চন্দ্র যখন ওমুক মঞ্জিলে আসবে তখন তকদিরে এলাহীর কারণে বৃষ্টি হবে। আর আল্লাহ্তায়ালা না চাইলে বৃষ্টি হবে না। আর চন্দ্র উক্ত মঞ্জিলে না আসা সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা হলে বৃষ্টি হবে। তাহলে তা কুফুরী হবে না। আর এ জাতীয় কথা মুখে না বললে, তা ইমান তাওহীদের অধিকতর নিকটবর্তী ও উপযোগী হবে।

কুরাইশদের দম্ভ

মুশরিকরা যখন দেখতে পেলো, রসুলে আকরম স. হেরেমের সম্মান রক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখছেন এবং হেরেমের সীমানার মধ্যে কোনো প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ করতে বা তাদেরকে উচ্ছেদ করতে তিনি সচেষ্ট নন, তখন তাদেরকে পেয়ে বসলো অহংকার। তারা বেওকুফী, মূর্খতা, অসৌজন্যতা এবং হতভাগ্যতায় নিমজ্জিত হয়ে চরম অবাধ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলো। তারা নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছু লোককে একত্র করলো। তারা সর্বপ্রথম পাঠালো বুদায়ল ইবনে ওরকাকে। সঙ্গে ছিলো তারই গোত্রের কয়েকজন। বুদায়ল জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই মুসলমানদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতেন। সব সময় মক্কার লোকদের গোপন খবরাখবর মদীনায় পৌঁছে দিতেন। অবশ্য তখন পর্যন্ত তিনি ইসলামের সূত্রে গ্রথিত হননি। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী বলে গণ্য করে থাকেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ও তাঁর পুত্র

আবদুল্লাহ এবং হাকীম ইবনে হাযাম মক্কাবিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হুনায়ন, তায়েফ এবং তবুক অভিযানে তিনি এবং তাঁর পুত্র অংশগ্রহণ করেছিলেন। রসুলেপাক স. এর জীবদ্দশায়ই তিনি শাহাদত বরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি সিফফীনের যুদ্ধে শহীদ হন। যা হোক, বুদায়ল রসুলেপাক স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, কুরাইশ এবং অন্যান্যরা একতাবদ্ধ হয়ে হুদায়বিয়ার কূপের অদূরে জামায়েত হয়েছে। তারা চায়, আপনি আপনার লোকদেরকে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করতে এবং খানায়েকাবা যিয়ারত করতে বারণ করবেন। আপনি যদি এরকম না করেন, তবে তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে। রসুলেপাক স. বললেন, আমরা তো যুদ্ধ করতে আসিনি। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল কাবাশরীফ তওয়াফ করা এবং ওমরা আদায় করা। তিনি আরও বললেন, কুরাইশরা যুদ্ধের দিকে খুব ঝুঁকে পড়েছে। এটা তাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর হবে। তারা যদি চায় তাহলে আমরা একটি সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারি। উক্ত সময়সীমার মধ্যে আমাদের ও তাদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। আর আমাকে অন্য মুশরিকদের জন্য যেনো ছেড়ে দেওয়া হয়, আমি তাদের সঙ্গে জিহাদ করবো। সে সব যুদ্ধে আমি যদি পরাজিত হই তাহলে তো তারা আমার পরাজয়ই কামনা করে। তাদের আশা পূরণ হবে। আর আমি যদি সে সব যুদ্ধে অন্যদের উপর বিজয়ী হই, তাহলে তাদের ইচ্ছা হলে অন্যান্যদের মতো তারা আমার আনুগত্য করতে পারে। আর যদি আনুগত্য নাও করে, তবুও সন্ধির নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আমরা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে দূরে থাকবো। যা আমি বললাম, এর পরও যদি কুরাইশরা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে তাহলে শপথ ওই আল্লাহ্পাকের, যাঁর কুদরতী হস্তে আমার জীবন, আমি ওই সময় পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো, যতক্ষণ না আমার দেহ থেকে মস্তক আলাদা হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হুকুম বাস্তবায়ন করবেন এবং তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবেন। বুদায়ল বললেন, আমি অতি তাড়াতাড়ি আপনার কথাগুলো তাদের কাছে পৌছে দিবো। তারপর তিনি রসুলেপাক স. এর মজলিশ থেকে মুশরিকদের লশকরের দিকে চলে গেলেন এবং তাদেরকে বললেন, আমি মোহাম্মদের সব কথা শুনেছি। তোমরা যদি অনুমতি দাও তাহলে তা তোমাদেরকে শোনাতে পারি। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন নির্বোধ লোক যেমন ইকরামা ইবনে আবু জাহেল এবং হাকাম ইবনুল আস বললো, তাঁর কথা শোনার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। বিবেকসম্পন্নরা বললো, তুমি যা কিছু তাঁর কাছ থেকে শুনেছো তা আমাদেরকে জানাও। বুদায়ল রসুলেপাক স. থেকে যা শুনেছেন সবকিছু খুলে বললেন। আরও বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা মোহাম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। তিনি বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছেন। তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা তাঁর নেই। তোমাদের জন্য এটাই সুন্দর হবে যে, তোমরা

তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কোরো না। কুরাইশরা বুদায়লের কথা বিশ্বাস করলো না। তারা মনে করলো বুদায়ল হয়তো মোহাম্মদের সঙ্গে যোগ-সাজশ করে ফেলেছে। কেননা খাযাআ গোত্রের লোকেরা সব সময়ই মোহাম্মদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতো। এমন সময় ওরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফী দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সন্তানতুল্য আর তোমরা আমার পিতৃতুল্য। তারা বললো, ঠিক বলেছো, এরকমই। সে বললো, আমি তোমাদের সঙ্গে কোনোরূপ খেয়ানত এবং দুশমনী করবো বলে কি তোমরা সন্দেহ করো? তারা বললো, না। তারপর ওরওয়া কুরাইশদের সঙ্গে যে সব হক আদায় করেছিলো সেগুলির কথা বর্ণনা করলো। ওরওয়া এমন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি প্রথম থেকে মানুষের হক আদায়ের প্রতি খুব যত্নবান থাকতেন। এই ওরওয়া হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর ভাই ওরওয়া ইবনে মাসউদ নন। বরং তিনি হচ্ছেন, ওরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফী। তিনি ছিলেন বনী ছাকীফ গোত্রের, আর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং তার ভাই ওরওয়া ইবনে মাসউদ ছিলেন হুযায়েল গোত্রের। ওরওয়া ইবনে মাসউদ তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। পরে এক সময় মুসলমান হয়ে মদীনায় হাজির হয়েছিলেন। তাঁর চার জনের অধিক স্ত্রী ছিলো। এতে রসুলেপাক স. তাকে হুকুম দিয়েছিলেন চারজনকে রেখে বাকীদেরকে ছেড়ে দাও। তিনি রসুলেপাক স. এর অনুমতি নিয়ে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে এসে কাওমের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু লোকেরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলো। একদিন ফজরের নামাজের সময় ঘরের দরজা জানালা খুলে তিনি যখন আযান দিচ্ছিলেন, যখন উচ্চারণ করছিলেন, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন কোনো এক ছাকাফী ব্যক্তি তাঁর দিকে তীর নিক্ষেপ করেছিলো। ওই আঘাতেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন। যা হোক, ওরওয়া কুরাইশদেরকে বললেন, তোমরা মোহাম্মদের যে সব কথা শুনলে আমার মনে হয় তা অতীব সুন্দর ও পছন্দনীয়। এ সকল কথা মেনে নেওয়াই সমীচীন। আমাকে যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে কথা বলে দেখতে পারি, তিনি কী বলেন। তারপর ওরওয়া রসুলে আকরম স. এর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি স. তাঁকে ওই সকল কথাই বললেন, যা বলেছিলেন বুদায়লকে। ওরওয়া বললেন, হে মোহাম্মদ! আপনিই বলুন, আপন সম্প্রদায়কে উৎখাত করা কি ভালো কাজ? আপনার পূর্বে কোনো আরব-ই আপন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে উদ্যত হননি। এরকম আচরণও প্রদর্শন করেননি, যা করতে যাচ্ছেন আপনি। পরাজিত যদি হন, তবে ভাবতে পারেন কী অবস্থা আপনার হবে? নিঃসন্দেহে এখন আপনার আশপাশে অনেক লোক সমবেত হয়েছে। কিন্তু যখন ওরকম অবস্থা হবে, তখন তারা আপনাকে একা ফেলে পালিয়ে যাবে। ওরওয়া এ ধরনের কথা বলেছিলেন তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আর পৃথিবীপূজকদের

জিঘাংসাবৃত্তির কথা তো সর্বজনবিদিতই। ওরওয়ার ভাবনা-দুর্ভাবনা তাই বাস্তব-সম্মতই ছিলো বলা যায়। কিন্তু রসুলে করীম স. এর ক্ষেত্রটি যে ভিন্নতর। এ ক্ষেত্রে রয়েছে নবুওয়াত, রিসালত, হকের দিকে দাওয়াত। আল্লাহ্র নির্দেশ ও আসমানী ওহীর প্রসঙ্গ। হজরত আবু বকর সিদ্দীক ওরওয়ার কথা শুনে রাগান্বিত হলেন। তাদের পূজিত মূর্তিসমূহের নিন্দাবাদ করতে লাগলেন। আরবদের প্রচলিত রীতি অনুসারে গালি দিয়ে বললেন, 'আমসিস বাযরিল লাত' (তুমি লাতের লজ্জা স্থান লেহন করো)। 'মাস' শব্দের অর্থ লেহন করা, চাটা। বাযর বলা হয় ওই গোশ্তের টুকরাকে, যা মেয়েলোকের খতনা করানোর পর অবশিষ্ট থেকে যায়। আর লাত বলা হয় কুরাইশ ও বনু ছাকীফ গোত্রের মূর্তিকে যার পূজা অর্চনা তারা করতো। আরবদের স্বভাব ছিলো, কাউকে কঠিন গালি দিতে চাইলে তারা বলতো 'আমসিস বাযরিল লাত' (লাতের লজ্জাস্থান চাটো)। হজরত আবু বকর সিদ্দীক গালি প্রদানে অতিরিক্ত করলেন এবং মা শব্দের স্থলে লাত শব্দটি ব্যবহার করলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তখন অত্যধিক রাগান্বিত ছিলেন বলেই এরকম কঠিন গালি দিয়েছিলেন। ওরওয়াও রসুলেপাক স. এর সম্মুখে অহংকার ভাব নিয়ে কথা বলছিলো। সাহাবীগণকে অকৃতজ্ঞ ও পলায়নকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছিলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, 'আনাহ্নু নাফিররু মিনহু ওয়া নাদ'আহু' (আমরা কি তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবো)? ওরওয়া হজরত আবু বকর সিদ্দীকের কথা শুনে বললো, এ লোকটি কে, যে এরূপ কথা বলছে? সাহাবীগণ বললেন, ইনি আবু বকর সিদ্দীক। ওরওয়া বললো, হে আবু বকর! জেনে রেখো, আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, তোমাদের উপর আমার হক আছে যা আমি ফেলে দিতে পারি না। যদি তা না হতো তাহলে আমি অবশ্যই তোমার কথার উপযুক্ত জবাব দিতাম এবং তোমাকে শাস্তি দিতাম। ওরওয়ার উপর হজরত আবু বকর সিদ্দীক এর হক ছিলো এই যে, জাহেলী যুগে ওরওয়ার উপর দিয়ত (রক্তপণ) লাজেম হয়েছিলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং ওকবার ভাইয়েরা মিলিতভাবে তাকে সাহায্য করেছিলেন। এক বর্ণনায় আছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক তখন তাকে দশটি জওয়ান উট দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এক বর্ণনায় আছে, সে সময় ওরওয়া তার সাথী-সঙ্গীদের কাছে সাহায্য চাইলে কেউ তাকে একটি বা দু'টি গরু দিয়ে সাহায্য করেছিলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাকে দশটি গরু দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, ওরওয়া কথা বলার সময় বার বার তার হাত রসুলেপাক স. এর দাড়ি-মুবারক পর্যন্ত নিয়ে আসছিলো, যেমন খারাপ ভাবের সময় আরবরা করে থাকে। হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা তার তলোয়ারের বাট তার হাতের উপর মেরে বললেন, বেআদব! হাত যথাস্থানে রেখে কথা বলো। আদবের সীমা লংঘন কোরো না। ওরওয়া বললেন, এ লোকটি কে, যে আমাকে আঘাত করলো। আমি মোহাম্মদের সহচরদের মধ্যে এরকম বেআদব

তো দেখিনি। লোকেরা বললো, ইনি হচ্ছেন, মুগীরা ইবনে শো'বা। ওরওয়া বললো, গাদ্দার! গাদ্দারীরকালে আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়েছিলাম, আর তুমি এখন আমার সাথে এরকম আচরণ করছো? ওরওয়া হজরত মুগীরার গাদ্দারীর কালে চেষ্টা করার ঘটনাটি এরকম— মূর্খতার যুগে কোনো এক সময় মুগীরা ছাকীফ গোত্রের বনী মালেক কবীলার তেরো জন লোকের সাথে ইস্কান্দারিয়াতে মাকুসাস বাদশাহ্র নিকট গিয়েছিলেন। মাকুসাস বাদশাহ্ বনী মালেক গোত্রের অন্যান্য লোকদেরকে হজরত মুগীরার উপর প্রাধান্য দিলো। বাদশাহ্ তাদেরকে হাদিয়া তোহফা দিয়ে সম্মানিত করলো। দলটি যখন ইস্কান্দারিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলো তখন তারা রাস্তায় শরাব পান করে মাতাল হয়ে পড়ে রইলো। মুগীরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রণোদিত হয়ে তাদের সকলকে হত্যা করে ফেললেন এবং তাদের মাল-আসবাব সবকিছু নিয়ে মদীনায় চলে এলেন। এগুলোকে তিনি গনিমতের মাল হিসেবে গণ্য করলেন এবং তিনি নিজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে মুগীরা! তোমার ইসলাম গ্রহণ করা তো ঠিক আছে, তবে তোমার এ সকল মালের প্রয়োজন আমার নেই। আমি এ থেকে পঞ্চমাংশ গ্রহণ করবো না। এ সংবাদ যখন মক্কায় পৌছলো, তখন বনী মালেকের সরদার মাসউদ ইবনে আমেরের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বললেন। ওরওয়ার এ বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। হজরত মুগীরার উপর তেরোজন হত্যাকৃত ব্যক্তির রক্তপণ ধার্য হয়ে গিয়েছিলো, যা পরিশোধ করা অপরিহার্য ছিলো তাঁর ওয়ারিশদের উপর। হত্যাকৃত ব্যক্তিদের ওযারিশরা রক্তপণের দাবী তুললো। অপরদিকে হজরত মুগীরার খান্দান যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। অবশেষে এই ওরওয়াই বিভিন্নভাবে টাল-বাহানা করে ঘটনার একটা দফারফা করেছিলো। ওরওয়া তার কথা দ্বারা সে ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করেছিলো।

জীবনীকারগণ বর্ণনা করেন, ওরওয়া ইবনে মাসউদ তখন আড় চোখে রসুলেপাক স. এর মজলিশের অবস্থা অবলোকন করছিলো। দেখছিলো সাহাবায়ে কেরাম রসুলেপাক স. এর প্রতি কী পরিমাণ আদব সম্মানপ্রদর্শন করে যাচ্ছেন। এসব দেখে সে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিলো। তাই মুশরিকদের কাছে যখন গেলো, তখন বললো, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি বড় বড় প্রতাপশালী ও অহংকারী রাজা বাদশাহদের দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তাদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। কায়সার, কিসরা এবং নাজ্জাশীর দরবারেও আমি গিয়েছি। কিন্তু কোনো বাদশাহকে তাদের খেদমতগারদের এরকম সম্মান প্রদর্শন করতে কখনও দেখিনি। যেমন করে মোহাম্মদের সঙ্গী-সাথীরা। তিনি যখন মুখ থেকে থুথু ফেলেন তখন সাহাবীগণ তা নিজেদের হাতে নিয়ে মুখের উপর মালিশ করতে থাকে। তিনি যখন কোনো সাধারণ কাজ করার জন্য হুকুম করেন, তখন তাদের মধ্যে বুজুর্গ সাহাবীরা তা

তামীল করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। তাঁর সামনে তারা নিম্নকণ্ঠে কথা বলে। আর তিনি যখন কোনো কথা বলেন, তখন তারা অত্যন্ত আদবসম্মানের সাথে তা শ্রবণ করে। তাঁর কথার সঙ্গে মিলিয়ে কেউ কথা বলে না। তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। তাঁর অজু করার সময় অজুর পানি নেওয়ার জন্য পরস্পরে এমন হুড়াহুড়ি করে যে, দেখে মনে হয় এক্ষণি হয়তো খুনাখুনি আরম্ভ হয়ে যাবে। তিনি যখন দাড়িতে অথবা মাথায় চিরুনি ব্যবহার করেন, তখন তাঁর স্খলিত কেশকে বরকতময় মনে করে ইজ্জত সম্মানের সাথে তা সংরক্ষণ করে। এ সব অবস্থা আমি স্বচক্ষে অবলোকন করেছি। তারপর ওরওয়া সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলে, তাদের বীরত্ব, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা কল্পনার অতীত। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমন বাহিনী দেখেছি যে, তারা তোমাদের সকলকে হত্যা না করা পর্যন্ত অথবা যুদ্ধে বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত ময়দান ছাড়বে না।

ওরওয়া শেষের দিকে হলেও ঈমান এনেছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ পুরুষ। মুশরিকদের মতো তিনি হঠকারী ছিলেন না। সেজন্যই তিনি যা দেখেছিলেন, তা কমবেশী না করে হুবহু বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু ওই হতভাগ্যরা তখনও অস্বীকারের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তারা বললো, উপদেশের কথা আমাদের কানে ভালো লাগে না। আমরা এ ইচ্ছার উপরই কায়েম আছি, মোহাম্মদ ও তার সাথীদেরকে আমরা মক্কায় প্রবেশ করতে দিবো না এবং কাবাগৃহও যিয়ারত করতে দিবো না। এ বৎসর তারা অবশ্যই চলে যাবে এবং পরবর্তী বৎসর আসবে। ওরওয়ার চেষ্টা ও গমনাগমনের মাধ্যমে যখন সন্ধির ভিত্তি রচিত হচ্ছিলো, তখন আবাবিল গোত্রের হুলায়স রসুলে আকরম স. এর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে কুরাইশদের অনুমতি নিয়ে মুসলিম লশকরের নিকট এসে পৌছলো। রসুলে আকরম স. বললেন, লোকটি ওই সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখে, যারা কোরবানীর পশুকে খুব সম্মান করে। তারপর বললেন, তোমরা কোরবানীর উটগুলোকে দাঁড় করিয়ে লোকটির সামনে দিয়ে অতিক্রম করিয়ে নিয়ে যাও। এরপর তিনি স. লাব্বায়েক বলতে বলতে সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে হুলায়সকে স্বাগতম জানানোর জন্য এগিয়ে গেলেন। হুলায়স যখন বুঝলো মুসলমানগণ শুধুমাত্র যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই এসেছেন, যুদ্ধবিগ্রহ করতে আসেননি, তখন তার চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। সে বলতে লাগলো, সুবহানাল্লাহ! এ কওমের উচিত হবে না মুসলমানদেরকে খানায়ে কাবার যিয়ারতে ও তওয়াফে বাধা দেওয়া। তারা তো কেবল যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই এসেছে। সে আরও বললো, 'হালাকাত কুরাইশিন ওয়া রব্বিল কা'বা' (কাবার রবের শপথ, কুরাইশরা ধ্বংস হয়ে যাবে)। হুলায়স রসুলেপাক স. এর সঙ্গে দেখা করেই ফিরে গেলো এবং কুরাইশদের কাছে গিয়ে বললো, আমি দেখলাম মোহাম্মদ এবং তাঁর সহকারীরা উটসমূহকে এশআর করে কেলাদা

পরিয়ে খানায়েকাবা যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া আমি ভালো মনে করি না। কুরাইশরা হুলায়সকে অযোগ্য মনে করলো। তার পরামর্শ গ্রহণ করাকে মূর্খতা ভাবলো। তারা অত্যন্ত কঠোরতার সাথে বলতে লাগলো, হে হুলায়স! তুমি নির্বোধ। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তুমি কিছুই জানো না। তাদের একথা শুনে হুলায়স রাগান্বিত হয়ে বললো, হে কুরাইশ! আমি তোমাদের সঙ্গে একমত নই। কসম ওই আল্লাহ্‌র যার কুদরতী হাতে হুলায়সের জীবন, তোমরা যদি মোহাম্মদকে কাবাগৃহ তওয়াফ করতে বাধা দাও তাহলে আমি আহাবীশ গোত্রের সকল লোক নিয়ে তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে চলে যাবো। কুরাইশরা আর কথা বাড়ালো না। তার মনোরঞ্জনার্থে বলতে লাগলো, হে হুলায়স! এ কথা বাদ দাও। আমরা আমাদের ইচ্ছা মতোই মোহাম্মদের সঙ্গে সন্ধি করতে যাচ্ছি।

জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন, কুরাইশদের পক্ষ থেকে যখন লোক আসছিলো এবং তাদের কঠোরতা দূর করার চেষ্টা করছিলো, তৎসত্ত্বেও হঠকারিতা কমছিলো না, তখন রসুলে আকরম স.ও চাচ্ছিলেন কাউকে প্রেরণ করে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা যাক। তিনি স. বনী খাযাআর এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন। তার নাম ছিলো হিরাশ ইবনে উমাইয়া কা'বী। তাকে একটি উট দেওয়া হলো। উদ্দেশ্য, উটটি দেখিয়ে কুরাইশদের বিশ্বাস অর্জন করা। একথা ভালোভাবে জানানো যে, তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য কেবল কাবা যিয়ারত ও ওমরা সম্পাদন করা, যুদ্ধবিগ্রহ নয়। তিনি যখন কুরাইশদের নিকট পৌঁছলেন তখন কুরাইশদের লোকেরা হেরাশ ইবনে উমাইয়ার উটটি ধরার এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলো। হেরাশ ইবনে উমাইয়ার কাওম বনু কা'ব এর লোকজন যারা সে সময় মক্কায় ছিলো তারা তাঁকে সাহায্য করে কুরাইশদের হাত থেকে উটটি ছাড়িয়ে নিলো এবং রসুলেপাক স. এর কাছে ফিরিয়ে দিলো। তিনি স. হজরত ওমর ফারুককে সম্বোধন করে বললেন, তোমাকে মক্কায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে তাদেরকে একথাটি বুঝাতে হবে যে, আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। কেবল ওমরা করার উদ্দেশ্যেই এসেছি। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার কাছে তো এটা সুস্পষ্ট যে, কুরাইশরা আমার কী মারাত্মক শত্রু। আমার প্রতি তাদের মনোভাব যে কতো কঠিন, তাতো আপনি জানেনই। তারা আমাকে কাছে পেলে নিশ্চয় মেরে ফেলবে। আর বনী আদী গোত্রের এমন কোনো লোক নেই, যে আমাকে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। তাই আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমাকে না পাঠিয়ে যদি ওছমানকে পাঠান, তাহলেই মনে হয় উত্তম হবে। কেননা তিনি কুরাইশদের প্রিয় ব্যক্তি। তাছাড়া মক্কায় তার প্রিয় ও নিকটজন অনেক রয়েছে। রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর পরামর্শটি গ্রহণ করলেন। আবু সুফিয়ান ও মক্কার অন্যান্য নেতাদের কাছে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন হজরত ওছমানকে। তিনি মালাহ নামক

স্থানে মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাঁর প্রস্তাব তাদের কাছে পৌছে দিলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাদের পূর্বের হঠকারিতা নিয়েই বসে রইলো। বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না তাদের মনোভাব। হজরত ওছমানকে একথাই বুঝিয়ে বললো যে, তারা মোহাম্মদ স.কে কিছুতেই অগ্রসর হতে এবং বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত করতে দিবে না। রসুলেপাক স. তবুও তাদের সাথে কোমল আচরণ করলেন। বার বার তাদেরকে একথাই বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসেননি। যদি আসতেন তাহলে তো প্রথমেই আক্রমণ করে বসতেন। একথা বলার পর আবান ইবনে সাঈদ ইবনুল আস হজরত উছমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো। তাঁকে তার বাহনের উপর বসিয়ে নিজে তাঁর পিছনে বসে মক্কায় নিয়ে গেলো। হজরত ওছমান রসুলেপাক স. এর প্রস্তাব আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কুরাইশ সরদারদের নিকট পৌছে দিলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন, তারা সকলেই তাদের পূর্ব মতের উপর স্থির হয়ে আছে। অবশেষে তিনি যখন ফিরে যেতে মনস্থ করলেন, তখন কুরাইশরা তাঁর সম্মান প্রদর্শনার্থে বললো, তুমি যদি চাও তাহলে উঠো। তওয়াফ করে নাও। হজরত ওছমান বললেন, আমি ওই সময় পর্যন্ত তওয়াফ করতে পারি না, যতক্ষণ না রসুলুল্লাহ তওয়াফ করবেন। তখন কুরাইশরা তাঁর প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাঁকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলো।

জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত ওছমান যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম বলতে লাগলেন, ওছমান কতই না সৌভাগ্যবান। তিনি মক্কায় পৌছে খানায়ে কাবা যিয়ারত করতে পারবেন। তাঁদের এ কথা শুনে রসুলে করীম স. বললেন, আমার ধারণা, সে আমাদেরকে ছাড়া তওয়াফ করবে না। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, হজরত ওছমান ছাড়া আরও দশজন মুহাজির রসুলেপাক স. এর অনুমতি নিয়ে মক্কায় গিয়েছিলেন। হজরত উছমানের ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে ইসলামী বাহিনীতে এ খবর প্রচারিত হয়ে গেলো যে, হজরত ওছমান ও ওই দশজন সাহাবীকে কুরাইশরা শহীদ করে দিয়েছে। এ সংবাদে রসুলেপাক স. মর্মাহত হলেন। একটি গাছে তাঁর পবিত্র পৃষ্ঠদেশ ঠেকিয়ে সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই মর্মে বায়াত গ্রহণ করলেন যে, তাঁরা সর্বাবস্থায় সুদৃঢ় থাকবেন এবং যদি যুদ্ধ বেঁধে যায়, তাহলে ময়দান থেকে কিছুতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন না। কুরআনে করীমে তাঁদের এহেন বায়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'লাক্বাদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনিল মু'মিনীনা ইয ইউবাইউনাকা তাহ্তাশ্ শাজ্বারা' (আল্লাহ তো মু'মিনদের উপর সন্তুষ্ট হইলেন যখন তাহারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল)। এ জন্যই এ বায়াতকে বায়াতে রেদওয়ান বলা হয়। হাদিস শরীফে এসেছে, বায়াতে রেদওয়ানে যাঁরা হাজির হয়েছিলেন আগুন তাঁদের কাছে পৌছবে না। এ বায়াতের সময় রসুলেপাক স. স্বীয় বাম হাতের দিকে ইশারা করে বলেছিলেন, এ হাত উছমানের, তারপর তিনি তাঁর ডান

হাতখানা বাম হাতের উপর রেখে নিজেই হজরত উছমানের পক্ষ থেকে বায়াত গ্রহণ করলেন। সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাই ছিলো হজরত উছমানের মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হওয়ার মাধ্যমে সাহাবীগণকে বায়াত করানো। কুরাইশরা যখন এই বায়াতের সংবাদ পেলো, তখন তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হলো এবং তারা মনে করতে লাগলো, মোহাম্মদ হয়তো যুদ্ধ করার সংকল্প করে ফেলেছেন। একথা ভেবে তারা অস্থির হয়ে গেলো এবং সন্ধির পথ বেছে নিলো। তারা তখন তাদের মুখপাত্র হিসেবে সুহায়ল ইবনে আমরকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রেরণ করলো। এক বর্ণনায় এসেছে, সুহায়ল ইবনে আমরের আগমনের পূর্বে হুলায়সের চলে যাওয়ার পর কুরয ইবনে হাফস নামক এক ব্যক্তি কুরাইশদের অনুমতি নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করলো। রসুলেপাক স. তাকে দূর থেকে দেখেই বললেন, এই যে কুরয ইবনে হাফস আসছে। সে এক দুষ্ট লোক। অপর এক বর্ণনানুসারে তিনি স. বললেন, সে গাদ্দার ও ধোঁকাবাজ। লোকটি এসে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলো। কথাবার্তা চলাকালে অকস্মাৎ সুহায়ল ইবনে আমর সেখানে উপস্থিত হলো। রসুলেপাক স. বললেন, 'সাহালা আমরুনা' (আমাদের কাজ সহজ হয়ে গেলো)। এক বিবরণে আছে, রসুলেপাক স. তখন বললেন, 'ক্বাদ সাহালা লাকুম আমরুকুম' (এখন তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে)। কুরয ইবনে হাফস ও খুরতাব ইবনে আবদুল উয্‌যাও সুহায়লের সঙ্গে ছিলো। তবে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো সুহায়লকে। এই সুহায়ল ইবনে আমরই বদরের যুদ্ধের দিন মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছিলো। সে কুরাইশদের মুখপাত্র ছিলো। ছিলো কুরাইশদের অন্যতম বক্তা। হজরত ওমর তার সম্পর্কে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এর দাঁতগুলি আমরা ভেঙে দেই, যাতে করে সে পরবর্তীতে আর কোনো সময় আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে না পারে। রসুলেপাক স. বললেন, আশা করা যায় এ জায়গায় দাঁড়িয়ে সে হয়তো একদিন পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় বক্তৃতা প্রদান করবে। সুহায়ল মক্কাবিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং সেই স্থানে দাঁড়িয়েই বক্তৃতা দিয়েছিলো, যে স্থানের কথা বলেছিলেন রসুলেপাক স.। তিনি স. যখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, মক্কার কিছু লোক মুরতাদ হয়ে গেলো, তখন তিনি দণ্ডায়মান হয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতের বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন এমনভাবে যেনো হজরত আবু বকর তাঁর বক্তব্য শুনতে পাচ্ছেন। তিনি তাঁর ভাষণে মানুষকে শান্ত রাখার এবং মতানৈক্য না করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালে তিনি আসওয়াসে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে আঠার হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ বেঁচে ছিলো না। আবু জন্দল নামক তাঁর এক পুত্রও ওই সময় প্লেগ রোগে মৃত্যু বরণ করে।

সন্ধি আলোচনার ভূমিকা উপস্থাপন করার পূর্বে সুহায়ল বললো, হে মুহাম্মদ! আমাদের একটি দল আপনার নিকট এখনও বন্দী আছে। আপনি তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। ঘটনাটি ছিলো এরকম— হুদায়বিয়ার দিন মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা নিরূপণের উদ্দেশ্যে কাফেররা পঞ্চাশজন লোককে পাঠিয়েছিলো। মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা ও তাঁর সাথীরা তাহাদেরকে বন্দী করে রসুলেপাক স. এর নিকট নিয়ে আসেন। তিনি তাদেরকে বন্দী করে রাখার হুকুম দিলেন। সুহায়ল যখন তাদের মুক্তির আবেদন জানালো, তখন তিনি স. বললেন, তাহলে তোমরা ওছমান ও তার দশজন সাথীকে পাঠিয়ে দাও। তারা এলে আমিও তোমাদের বন্দীদেরকে মুক্তি দিয়ে দিবো। তারপর খুয়তাব ইবনে আবদুল উযযা ও কুরয ইবনে হাফসকে সুহায়লের সঙ্গে ঐকমত্যের ভিত্তিতে হজরত ওছমান ও তাঁর সঙ্গী দশজন সাহাবী ফিরে এলেন। 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। তবে 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, কুরাইশদের পঞ্চাশজন ব্যক্তি যাদেরকে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বন্দী করে এনেছিলেন, রসুলেপাক স. তাদের প্রতি মেহেরবানী করলেন। সকলকেই মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। সন্ধি যখন সম্পাদিত হলো তখন তিনি স. সুহায়ল ইবনে আমরকে নিজে আটক করলেন। বললেন, যতক্ষণ ওছমান ফিরে না আসবে, ততক্ষণ আমরা তোমাকে ছাড়বো না। তখন সুহায়ল কুরাইশদের কাছে লিখে পাঠালো, তোমরা ওছমানকে পাঠিয়ে দাও, যাতে আমি মুক্ত হতে পারি। হজরত ওছমান যখন ফিরে এলেন তখন রসুলেপাক স. সুহায়লকে মুক্ত করে দিলেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবেও এরকম লিপিবদ্ধ রয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হুদায়বিয়ার সন্ধিনামা

হুয়ায়তাব ইবনে আবদুল উযযা, কুরয ইবনে হাফস এবং সুহায়ল ইবনে আমর সন্ধির উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা করতে চেয়ে প্রথমে শর্তারোপ করলো সুহায়ল ইবনে আমর। শর্তটি হচ্ছে— এ বৎসর মোহাম্মদ এখান থেকে ফিরে যাবেন; আগামী বৎসর ওমরার উদ্দেশ্যে আসবেন। দশ বৎসর পর্যন্ত এ সন্ধি স্থায়ী থাকবে। এ সময়ের মধ্যে দু'পক্ষের মধ্যে কোনো যুদ্ধবিগ্রহ হবে না। প্রত্যেকেই নাগরিক নিরাপত্তা লাভ করবে। একে অপরের উপর হামলা করবে না। সন্ধিবদ্ধ দু'পক্ষ কেউ কারো কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করবে না। বিখ্যাত বর্ণনা হচ্ছে, সন্ধির সময়সীমা দশ বৎসর। বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে এরূপ বর্ণনাই এসেছে। তবে আবু দাউদ শরীফে হজরত ইবনে ওমর এবং মসনদ গ্রন্থে আবু নাঈম আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন, সন্ধির সময়সীমা ছিলো চার বৎসর। হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করেছেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে— আগামী বৎসর মুসলমানগণ যখন মক্কায় আসবেন তখন তিন দিনের অধিক তারা মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন না এবং এ তিনদিন তারা তলোয়ার কোষমুক্ত করতে পারবেন না।

তৃতীয় শর্তটি ছিলো অত্যন্ত খারাপ এবং এটি বিস্ময়করও বটে। তা হচ্ছে এই যে, কুরাইশদের কাছ থেকে তাদের অনুমতি ছাড়া যদি কেউ নিজে নিজে মদীনায় চলে যায়, তাহলে তাদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। মুসলমান হয়ে গেলেও তাদেরকে গ্রহণ করা যাবে না। আর যদি কেউ মদীনা থেকে মক্কায় চলে আসে, তাহলে কুরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এ শর্ত শুনে মুসলমানগণ বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলো কেউ যদি মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে যায় তাহলে আমরা তাকে ফিরিয়ে দিবো কেমন করে? এক বর্ণনায় আছে, সুহায়ল যখন এ শর্তটি উল্লেখ করলো, তখন রসুলে আকরম স. বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি এ শর্ত মেনে নিচ্ছেন? তিনি স. মৃদু হেসে বললেন, কেউ কুরাইশদের কাছ থেকে মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে যদি চলে আসে আর আমরা তাকে যদি ফিরিয়েও দেই তবু তাকে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রশস্ততা দান করবেন। তার মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করে দিবেন। আর কেউ যদি আমাদের কাছ থেকে ফিরে গিয়ে মুশরিকদের সাথে যোগ দেয় তাহলে তাকে আমাদের কীইবা প্রয়োজন? সে তো কাফেরদের সাহচর্যের অধিকতর উপযোগী। তবে এরকম ঘটবে খুব কমই। প্রথমটি অবশ্য সংঘটিত হবে। তবুও এর পরিণতি ভালোই হবে। যেমন আবু বুসায়রের ঘটনা, যার আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে ইনশাআল্লাহ্‌তায়ালা।

কথাবার্তা চলছিলো, এমন সময় সুহায়ল ইবনে আমরের পুত্র আবু জন্দল যিনি প্রথম থেকেই মুসলমান ছিলেন এবং তাঁর পিতার কয়েদখানায় আবদ্ধ ছিলেন, তিনি কলেমা শাহাদত পড়তে পড়তে মুসলমানদের দলের মধ্যে চলে এলেন। সুহায়ল বললো, হে মোহাম্মদ! এ হচ্ছে প্রথম ঘটনা, যার উপর সন্ধি সাব্যস্ত হয়েছে। তাকে আমাদের কাছে তুলে দিন। রসুলেপাক স. বললেন, সন্ধিনামা এখনও লেখা হয়নি। এ শর্ত সন্ধিনামা সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে কার্যকর হবে। কিন্তু সে অহংকার ও বাড়াবাড়ি করে বলতে লাগলো, আপনি যদি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে না দেন, তাহলে আমরা আপনার সাথে কোনো সন্ধি করবো না। তিনি স. বললেন, বিষয়টিকে তোমরা একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখো। একটু বিনম্র হও। সে বললো, না। আমি তা করবো না। তিনি বললেন, মেনে নাও। সে বললো, না। আমি মানবো না। রসুলেপাক স. বারংবার এরকম বলতে লাগলেন। কিন্তু সে বারবারই প্রত্যাখ্যান করতে লাগলো। দুষ্ট ও গাদ্দার হওয়া সত্ত্বেও কুরয ইবনে হাফস বললো, ঠিক আছে আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সুহায়ল মেনে নিলো না। অবশেষে রসুলেপাক স. আবু জন্দলকে তাঁর পিতার কাছেই

সোপর্দ করে দিলেন। বললেন, দেখো, একে কষ্ট দিয়ো না। এ বিষয়ে কুরয দায়িত্ব গ্রহণ করলো। আবু জন্দল বললেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা আমাকে মুশরিকদের কাছে সমর্পণ করো না। আমি মুমিন ও মুসলমান হয়ে তোমাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছি। তোমরা তো জানো না এ কাফেরেরা আমাকে কীভাবে কষ্ট দিয়েছে। রসুলুল্লাহ স. বললেন, হে আবু জন্দল! ধৈর্যধারণ করো। অন্তরকে প্রফুল্ল রেখো। আর আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের উপর ভরসা করো। নিশ্চয়ই তিনি তোমার জন্য স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিবেন। এখনই কুরাইশদের সাথে সন্ধিনামা সম্পাদিত হতে যাচ্ছে। ওয়াদাভঙ্গ ও গাদ্দারী আমাদের কাজ নয়। ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই ধৈর্য স্বাচ্ছন্দ্যের চাবিকাঠি।

হজরত আবু জন্দলের এই ঘটনা সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম দু'টি দিক বর্ণনা করেছেন। একটি হচ্ছে, তিনি যে আযীমত (দৃঢ়তা) এর উপর আমল করেছেন, তাতে তিনি অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়েছেন। আর তিনি যদি রুখসত (সহজলভ্যতা) এর উপর আমল করতেন, যাহেরকে বাতেনের অনুকূলে না দেখাতেন এবং কাফেরদের কাছে ইসলাম প্রকাশ না করতেন, তবু তা জায়েয হতো। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, পিতা যতোই নির্যাতন করুক, নির্দয় পাষাণ হোক, তবুও পিতৃত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয় না; যতক্ষণ না মৃত্যু হবে। প্রথম দৃষ্টিকোণের আলোকে হজরত ওমর আবু জন্দলকে উৎসাহিত করেছিলেন তার পিতাকে হত্যা করে ফেলার জন্য। তিনি তাঁকে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, মুশরিকরা অপবিত্র। তাদের রক্ত কুকুরের রক্তের মতো অপবিত্র। তাঁকে বলেছিলেন, তুমি তোমার পিতাকে হত্যা করে ফেলো। কিন্তু আবু জন্দল তাঁর পিতাকে হত্যা করতে পারেননি। আপন পিতাকে হত্যা করার ব্যাপারে তিনি কৃপণতা করেছিলেন। অপরপক্ষে পিতাও তার পুত্রকে হত্যা করার ব্যাপারে হিম্মত দেখাতে পারেনি।

যা হোক, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যখন সন্ধির শর্তসমূহ সাব্যস্ত হলো, তখন রসুলে আকরম স. সন্ধিনামা লেখার জন্য দোয়াত, কলম ও কালি নিয়ে আউস ইবনে খাওলী আনসারীকে দিলেন। লেখার সময় সেখানে সীল মোহর রাখা হয়েছিলো। সুহায়ল বললো, হে মোহাম্মদ! সন্ধিনামা আপনার চাচাতো ভাই আলীকে লিখতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, কোনো সন্ধি চুক্তি করা বা তা ভঙ্গ করার বেলায় আমরা বা আপন জনই অধিকতর যোগ্য। এ কারণেই পরবর্তী সময়ে সুরা তওবা পাঠ করার জন্য রসুলেপাক স. হজরত আবু বকর সিদ্দীককে পাঠিয়েছিলেন। কাফেরদের সঙ্গে কৃত চুক্তিভঙ্গ করার বিধান নিয়ে সুরা তওবা নাযিল হয়েছিল। নির্দেশ ছিলো, সে সময় হজ্বের অনুষ্ঠানে হজরত আবু বকর সিদ্দীক ওই সুরা পাঠ করে শোনাবেন। পরে তিনি স. হজরত আলীকেও সেখানে পাঠিয়েছিলেন। অপর এক বিবরণে আছে, অথবা তারা দাবী করেছিলো সন্ধিনামা ওছমানকে লিখতে হবে। যেহেতু তিনিও রসুলেপাক স. এর আসাবা (আপনজন) তাঁর জামাতা। রসুলেপাক স. হজরত আলীকে ডেকে এনে বললেন, লেখো বিসমিল্লাহির রাহমানির

রাহীম। তখন সুহায়ল বললো, আমরা রহমানকে চিনি না। অপর এক বিবরণে আছে, তখন সে বললো, আররাহমান আররাহীম কী? আমরা তো তাকে চিনি না। সে বললো, এভাবে লেখো বিইসমিকা যা সাধারণ রীতি। মূর্খতার যুগে রীতিটি প্রসিদ্ধ ছিলো। কেউ চিঠি লিখলে প্রথমে লিখতো বিইসমিকা। পরে সমাজে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখার রীতি প্রচলিত হয়েছে ইসলামী রীতি হিসেবে।

মুসলমানগণ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ছাড়া কিছুই লিখবো না। রসুল স. বললেন, হে আলী! লেখো বিইসমিকা আল্লাহুম্মা। হজরত আলী বললেন, আমি তাই লিখেছি। এ ছিলো সুহায়লের ঝগড়া। নতুবা উভয় বাক্যের সারকথা একই। বিইসমিকা বলাতেও দোষের কিছুই ছিলো না। যদি তার ভাবার্থ হতো এরকম 'হে আল্লাহ্ তোমার নামে।' কিন্তু কাফেররা একথার দ্বারা তাদের পূজিত মূর্তিকে উদ্দেশ্য করতো। রসুলেপাক স. বললেন, লেখো। 'হাযা মা কাদা বিহী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' (এ হচ্ছে তা-ই যা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ফয়সালা করেছেন)। হজরত আলী লিখে নিলেন। কিন্তু সুহায়ল বলে উঠলো, আমরা তো আপনার রেসালতই স্বীকার করি না। আল্লাহ্র কসম! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রসুল বলেই মনে করতাম, তাহলে তো আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত করতে আপনাকে বাধা দিতাম না। আপনি লিখুন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। রসুলেপাক স. বললেন, আমি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহও, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহও। লিখে দাও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। রসুল ও আল্লাহ্ শব্দ দু'টি মুছে দিয়ে সেখানে লিখে নাও ইবনে আবদুল্লাহ্। হজরত আলী বললেন, আমি একাজ করতে পারবো না। 'রসুল' শব্দ আমি মুছে ফেলতে পারবো না। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হজরত আলী তখন হাত থেকে কলম রেখে দিয়ে তাতে তলোয়ার তুলে নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, হজরত আলীর 'রসুলুল্লাহ্' শব্দ মুছে ফেলার হুকুম পালন না করা বেআদবী ছিলো না; বরং তা ছিলো পূর্ণ আদবের বহিঃপ্রকাশ, যা বিশুদ্ধ ইশক ও মহব্বতকে প্রমাণিত করে। রসুলেপাক স. হজরত আলীর হাত থেকে লেখনীটি নিয়ে নিজ হাতে 'রসুলুল্লাহ্' শব্দটি মুছে দিয়ে তদস্থলে ইবনে আবদুল্লাহ লিখে দিলেন। প্রকাশ থাকে যে, এই হাদিসের বাহ্যিক বাক্যসমূহ এরকমই। বিবরণদৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ওই শব্দটি রসুলেপাক স. স্বহস্তে লিখেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে— রসুলুল্লাহ্ স. লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন সেরকম করে যেরকম করে কায়সার ও কেসরার নিকট চিঠি লেখার ব্যাপারে হাদিস বর্ণিত আছে। আরবী ভাষায় এরকম রূপকতার প্রচলন আছে। এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা আছে, যে বিষয়ে শেষে আলোকপাত করা হবে।

'মাআরেজুন নবুওয়াত' পুস্তকে আছে, রসুলেপাক স. তখন বললেন, হে আলী! এ রকম ঘটনা তোমার সামনেও ভবিষ্যতে উপস্থিত হবে। পরবর্তীকালের ঘটনাটি এরকম— সিফ্ফীনের যুদ্ধের সময় যখন সন্ধিনামা সাব্যস্ত হলো তখন

সন্ধিনামায় লিপিবদ্ধ করা হলো এই সন্ধিনামা আমীরুল মুমিনীন আলী ও মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে সংঘটিত হলো। তখন হজরত মুআবিয়া বললেন, আমীরুল মুমিনীন কথাটি কেটে দিয়ে সেখানে লিখো আলী ইবনে আবী তালিব। আমি যদি তাকে আমীরুল মুমিনীনই মনে করতাম তাহলে তো তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতাম না; বরং তার আনুগত্যই করতাম। তখন হজরত আলী বললেন, আল্লাহ্র রসুল সত্যই বলেছিলেন। তখন সন্ধিনামায় হজরত আলীর নাম মুআবিয়ার কথা মতোই লেখা হয়েছিলো।

জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন সাহাবায়ে কেরাম খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, তাঁদের অন্তরে এই খেয়ালটি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে, রসুলেপাক স. এর স্বপ্ন এ বৎসরই প্রতিফলিত হবে। মক্কাবিজয় হবে এবং মুসলমানগণ মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন। ইতিহাস গ্রন্থে এসেছে, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বর্ণনা করেছেন, ওই দিন আমি এতোই মনোক্ষুণ্ন হয়ে গিয়েছিলাম এবং রসুলেপাক স. এর এতো সামনে এসে গিয়েছিলাম যে, ইতোপূর্বে আমি তা কখনও করিনি। আমি তাঁর নিকটে হাজির হয়ে বললাম, আপনি কি সত্য নবী নন? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, আমরা কি হকের উপর নই? বিরুদ্ধবাদীরা কি বাতেলের উপর নয়? তিনি বললেন, হাঁ। তোমরা হকের উপর রয়েছো, আর বিরোধীরা রয়েছে বাতেলের উপর। আমি বললাম, তা হলে আমরা কেনো এরকম অপমান অপদস্থতা সহ্য করবো? এ ধরনের সন্ধি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবো কেনো? রসুলেপাক স. বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ্র প্রেরিত রসুল এবং আল্লাহ্তায়ালার হুকুম ছাড়া আমি কিছুই করি না। তিনিই আমার সাহায্যকারী। তিনি আমাকে এমনভাবে ছেড়ে দিবেন না। উপর্যুক্ত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, এ সন্ধি ওহীর নির্দেশানুসারে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। রায় বা ইজতেহাদের ভিত্তিতে নয়। হজরত ওমর বললেন, আমি বললাম, আপনি কি আমাদেরকে একথা বলেননি যে, আমরা অচিরেই মক্কায় প্রবেশ করবো এবং কাবা তওয়াফ করবো? তিনি স. বললেন, হাঁ। আমি এরকমই বলেছি। কিন্তু এ কথা তো বলিনি যে, এ বৎসরই এরকম হবে। হে ওমর! চিন্তা কোরো না। অবশ্যই তুমি কাবা যিয়ারত করবে এবং তা তওয়াফ করতে পারবে। হজরত ওমর বললেন, এরকম চিন্তা ও বিষণ্নতার মধ্য দিয়েই রসুলেপাক স. এর পবিত্র মজলিশ থেকে উঠে আমি আবু বকর সিদ্দীকের কাছে গেলাম। তাঁর সঙ্গে ওইভাবেই কথা বার্তা বললাম, যেভাবে বলেছিলাম রসুলেপাক স. এর সঙ্গে। তিনিও আমাকে একই রকম জবাব দিলেন, যেমন জবাব দিয়েছিলেন রসুলুল্লাহ স.। বিষয়টি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের এলেমের পূর্ণতা, সত্যবাদিতার পরিপূর্ণতা এবং দৃঢ়প্রত্যয়তা ও আনুগত্যের পরিচায়ক। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, 'মা আসাবাল্লাহু ফী সদ্‌রী শাইআন ইল্লা ওয়া সবাবতু ফী সদরী আবী বাকরি সিদ্দিক' (আল্লাহ্তায়লা আমার বক্ষে যা ঢেলে দিয়েছেন, আমি তাই আবু বকর সিদ্দীকের বক্ষে ঢেলে দিয়েছি।)

এক বিবৃতিতে আছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক হজরত ওমর ফারুককে বললেন, হে ওমর! যাও রসুলেপাক স. এর সৌভাগ্যের বাহনের রশি হাতে লও। কোনো প্রকার প্রশ্নের অবতারণা কোরো না। তিনি আল্লাহ্র প্রেরিত জন। তিনি যা কিছুই করেন, ওহীর মাধ্যমেই করেন। এতে কল্যাণ হবে। আল্লাহই তাঁর সাহয্যকারী। হজরত ওমর রসুলেপাক স.কে প্রশ্ন করেছিলেন কেবল জানার জন্য। নতুবা তিনি রসুলুল্লাহ স.কে সন্দেহ করেছিলেন, এ কথা ভাবাই যায় না। সকল সাহাবীই ছিলেন রসুল অন্তঃপ্রাণ। তারপরেও হজরত ওমর বলেছেন, ওমরের উপর দিয়ে সেই দিন অতিবাহিত হয়েছে, যেদিন শয়তানী ওয়াসওয়াসা এবং নফসের ধোকায় ওমরের অন্তর আছন্ন হয়ে পড়েছিলো। সে জন্য আমি এখনো আল্লাহ্র কাছে ইস্তেগফার করি। নেক আমলসমূহ যেমন, রোজা রাখা, নফল এবাদত করা, গোলাম আযাদ করা, দান খয়রাত করা ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমার ওসিলা তালাশ করি। যেনো তার কাফফারা হয়ে যায় এবং আমি মুক্তি পেয়ে যাই। বর্ণিত আছে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়সীমার মধ্যে এতো মুশরিক মুসলমান হয়েছিলো, যা রসুলেপাক স. এর আবির্ভাবের প্রথম থেকে নিয়ে সন্ধির সময় পর্যন্ত হয়েছিলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির মতো বিজয় আর কোনোটিতেই হয়নি। কিন্তু বিষয়টি সহজবোধ্য নয়। এর প্রকৃত রহস্য অবশ্য রসুলেপাক স. এবং আল্লাহ্তায়ালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। মানুষ দ্রুত ফলাফল পেতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাড়াহুড়া থেকে পবিত্র।

'মাওয়াহেব' রচয়িতা বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে যে সকল কল্যাণ ও সুস্পষ্ট ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মক্কাবিজয়। মক্কার লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করেছে। ব্যাপকহারে জনগণ আল্লাহ্র ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। কারণ, সন্ধির পূর্বে কাফেররা মুসলমানদের সাথে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতো না। ফলে নবী করীম স. এর চাল-চলন, আচার-আচরণ ও অবস্থাদি তাদের কাছে প্রকাশ পেতো না। ভয়ে তাঁর পবিত্র সাহচর্যে আসতেই পারতো না। ফলে তাঁর উদ্দেশ্য ও তার সম্পর্কে কিছু জানতে-বুঝতেও পারতো না। রসুলেপাক স. হুদায়বিয়ার সন্ধিনামা যখন সম্পাদিত করলেন তখন কাফেররা মুসলমানদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে লাগলো, মদীনায় আসতে লাগলো অবাধে। বুঝতে পারলো রসুলে আকরম স. এবং তাঁর সাহাবীগণের পবিত্র উদ্দেশ্য ও অবস্থা। সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের সামনে কোরআন মজীদ পাঠ করতেন এবং নির্ভয়ে কাফেরদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতেন। মুসলমানগণ বিনা বাধায় মক্কা মুকাররমায় যেতেন এবং আপন পরিবার পরিজন ও বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বসতেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিতেন। মক্কাবাসীরা যখন রসুলেপাক স. এর অবস্থা ও মোজেযা সম্পর্কে শুনলো এবং তাঁর নবুওয়াতের আলামতসমূহ অবলোকন করলো, তাঁর সুন্দর চরিত্র ও সুন্দর জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারলো,

তখন তাদের অন্তরে তাঁর প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হলো। তাদের অন্তর্জগত ঈমান ও ইসলামী বিধানাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হলো। যে লোকগুলো ইতোপূর্বে কাফের ও অবাধ্যদের কথা এবং নফস ও শয়তানের ধোকাবাজীর কথা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেতো না, হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কাবিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে তাদেরই বিশাল বিশাল জামাত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হলো। এমনকি এক পর্যায়ে মক্কাবিজয়ের নূর উদ্ভাসিত হলো। দ্বীনের দলিলসমূহ উজ্জ্বলতর হলো। আরববাসী ও আরবের বিভিন্ন গোত্র ছাড়াও মরুপ্রান্তর ও পর্বতের গুহায় বসবাসকারীরা মক্কা বিজয় ও মক্কার অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষমাণ ছিলো। তারা যখন দেখলো, মক্কা বিজিত হয়েছে এবং কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তারা দলবেধে এসে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলো। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'ইজা জ্বাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু ওয়া রাআইতান নাসা ইয়াদ খুলূনা ফী দ্বিনিল্লাহি আফওয়াজ্বা' (যখন আসিবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে)(১১০ঃ১-২)। মুফাসসিরিনে কেরামের অধিকাংশই 'ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাতহাম মুবীনা' (নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়)(৪৮ঃ১) আয়াতের 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বুঝিয়েছেন।

উলামায়ে কেরামের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে মতভেদ আছে যে, এমন কোনো সাধারণ মুসলমান যিনি নবী নন, তিনি কি মুশরিকদের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি করতে পারেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি কাফেরদের কাছ থেকে চলে আসে তাহলে তাকে ফিরেয়ে দিবে? একদল মনে করেন, তাকে ফিরিয়ে দেওয়া জায়েয নহে। হজরত আবু জন্দল ও হজরত আবু বুসায়রের ঘটনা এর প্রমাণ। আবার এক দল মনে করেন এ ধরনের চুক্তির বিধান রহিত হয়ে গেছে। রহিতকারী হাদিসটি এই— রসুলেপাক স. বলেছেন, 'আমি ওই মুসলমানের প্রতি অসন্তুষ্ট, যে মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে'। ইমাম আবু হানিফার মতও এরকম। তবে ঈমাম শাফেয়ীর মতে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে বিধানের পার্থক্য আছে। তার মানে এমতাবস্থায় পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ককে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। তবে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হলে চুক্তি মুতাবেক ফিরিয়ে দেওয়া যাবে।

স্বহস্তে লিখা প্রসঙ্গে

পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে, জীবনীবিশেষজ্ঞগণ এবং ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, রসুলেপাক স. চুক্তিনামা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, না হজরত আলীকে তা লেখার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন? প্রথম মতের

প্রবক্তাগণ হাদিসের বাহ্যিক শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে দলিল গ্রহণ করেছেন। রসুলেপাক স. হজরত আলীকে বলেছিলেন, তুমি আমাকে ওই স্থানটি দেখিয়ে দাও, যেখানে 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' লেখা আছে। তখন হজরত আলী সে জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন। তারপর তিনি স. 'রসুলুল্লাহ্' কথাটি স্বহস্তে মুছে দিয়ে সেখানে ইবনে আবদুল্লাহ্ লিখে দিলেন। আবুল ওলীদ বাজী, যিনি পাশ্চাত্যবিখ্যাত আলেমদের মধ্যে অন্যতম, তিনি এই মতের দিকেই গিয়েছেন। বলেছেন, রসুলেপাক স. লিখতে জানতেন না। তৎসত্ত্বেও তিনি স. ওই সন্ধিনামায় স্বাক্ষরকালে তা নিজ হাতেই লিখেছিলেন। তবে তাঁর সমসাময়িক উন্দুলুসের আলেমগণ এ বিষয়ে তাঁকে দোষারূপ করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি কুফুরীর ফতওয়া প্রদান করেছিলেন। তার কারণ হচ্ছে, তাঁর মতটি সরাসরি কোরআনের আয়াতের বিরোধী। উক্ত আলেমগণের মধ্য হতে একজন এই শেরটিও লিপিবদ্ধ করেছিলেন— 'বরইয়াত 'আন সারে দুনিয়া বা আখেরাহ্ ওয়া ক্বালা আন্না রসূলাল্লাহি ক্বাদ কাতাবা' (ওই ব্যক্তির প্রতি আমি অতুষ্ট, যে আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করলো এবং বললো, রসুল স্বহস্তে লিখেছেন)। উন্দুলুসের আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীবকে লেখা ও দেখে পড়া থেকে বিলকুল পবিত্র বলেছেন এবং তাঁকে উম্মী নবী হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন। আর এ উম্মী হওয়াকে তাঁর নবুওয়াতের দলিল সাব্যস্ত করেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'ওয়ামা কুংতা তাতলূ মিন ক্বাবলিহি মিন কিতাবিওঁ ওয়ালা তাখুত্বুহু বিইয়ামীনিকা ইজাল লারতাবাল মুবতিলূন' (তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিবে)(২৯ঃ৪৮)। সুতরাং রসুলেপাক স. লিখেছিলেন এরূপ সাব্যস্ত করলে তাঁর উম্মী নবী হওয়ার দলিলটিকে বাতিল করে দেওয়া হয় এবং তা কুফুরী। ওই দেশের আলেমদের মধ্যে একবার এ বিষয় নিয়ে বিতর্ক ও ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। তখন সে সময়ের আমীর তাঁদেরকে একত্রিত করেন। উক্ত আমীর উলামায়ে কেরামের মধ্যে আপন আপন এলেম ও মারেফত জাহিরের বাজি খেলায় সাহায্য করলেন। বললেন, মোহাম্মদ লিখতে পারতেন একথা বলা কোরআন মজীদের পরিপন্থী নয় বরং কুরআনের ভাবার্থ থেকেই একথা গৃহীত। আর তা হচ্ছে এভাবে যে, 'উম্মী' হওয়ার বিষয়টি কুরআন নাযিলের পূর্বের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। রসুলেপাক স. যে উম্মী এ বিষয়টি সাব্যস্ত হওয়ার পর 'লিখতে পারা' ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হওয়া— এটিও তাঁর একটি মোজেযা। ইবনে ওয়াহিয়া বর্ণনা করেছেন, আফ্রিকার আলেমদের এক জামাত এ বিষয়টি নিয়ে বাজীর অনুসরণ করেছেন। তিনি একজন বড় মাপের আলেম ছিলেন। ইমাম বোখারীর বর্ণনাকারীগণের অন্যতম আবু যর আবুল ফাতাহ নিশাপুরী এবং সে সময়ের

আরও অনেক আলেমও বাজির অনুসরণ করেছেন। কেউ কেউ তো ইবনে আবী শায়বার বিবরণ, যা মুজাহিদ, আউন, ইবনে আবদুল্লাহ্‌র মাধ্যমে এসেছে, 'মা মাতা রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত্তা কুতিবা' (রসুলুল্লাহ স. এর ওফাতই হয়নি যতক্ষণ না তিনি লিখেছেন) এর মাধ্যমে দলিল গ্রহণ করেছেন। মুজাহিদ বলেন, আমি এই ভাষ্যটি শা'বী থেকে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেছেন, আউন ঠিকই বলেছেন। নিঃসন্দেহে আমিও কারও কারও কাছ থেকে এরকম শুনেছি। কাজী আয়ায বলেছেন, এমন কিছু কিছু বিবৃতি পাওয়া যায়, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসুলেপাক স. এর আক্ষরিক জ্ঞান ছিলো। লিখন পদ্ধতি এবং সুন্দর লিপিকর্মও তিনি স. জানতেন। যেমন বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. তাঁর কাতেবকে বললেন, কলম তোমার কানের উপর রেখো, তাহলে ভুলে যাওয়া বস্তু স্মরণে সহায়ক হবে। হজরত উমাইয়াকে একদিন বলেছিলেন, কালো কে কালো রেখো। কালো বর্ণ স্পষ্ট করে লিখো। অক্ষরের রঙ যেনো ফিকে হয়ে না যায়। কলম প্রস্তুত করো। বা অক্ষরকে মোটা করে লিখো, সীনকে লম্বা করে টেনে লিখো, মীমকে গোল করো। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ্‌ এভাবে লিখো। কাজী আয়ায আরও বলেছেন, এ বর্ণনা দ্বারা অবশ্য একথা সাব্যস্ত হয় না যে, তিনি স. স্বহস্তে লিখেছেন। তবে তাঁর স্বহস্তে লেখা একেবারে অসম্ভবও নয়। হতে পারে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে লেখার ক্ষমতা দান করে থাকতে পারেন। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা তো তাঁকে সব কিছুরই এলেম দান করেছিলেন। জমহুর মুহাদ্দেছীন অবশ্য এ সকল বর্ণনাকে দুর্বল বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং হুদায়বিয়ার ঘটনায় লেখা সংক্রান্ত এরকম ঘটনা একটাই ঘটেছে। আর সেখানে কাতেব হজরত আলীই ছিলেন। মেসওয়ার ইবনে মাখরামার হাদিস যা হুদায়বিয়ার সন্ধির বিষয়ে মৌলিক হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, বোখারী যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. এর নির্দেশে হজরত আলীই ওই অক্ষরগুলো লিখেছিলেন। এখানে বর্ণনাকারীর নিজস্ব উদ্ধৃতি রয়েছে এরকম— রসুলেপাক স. তখন কাগজটি নিয়ে বললেন, শব্দটি কোন জায়গায় রয়েছে বলো, আলী যেটি মুছে ফেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তিনি তা নিজে মুছে দিলেন। সেখানে তিনি নিজে কিছু লিখেননি। বর্ণনাকারীর বিবরণে অবশ্য কিছু বিষয় উহ্য আছে। বাক্যটি মূলতঃ হবে এরকম— রসুলেপাক স. শব্দটি মুছে দিয়ে কাগজটি হজরত আলীকে দিলেন। অতঃপর হজরত আলী সেখানে লিখলেন। হাদিসের বাহ্যিক বাক্য থেকে এ কথা সাব্যস্ত হয় না যে, তিনি স্বহস্তে লিখেছিলেন। তবে একথা সত্য যে, তিনি লিখনপদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন। আর এ ধরনের ওয়াকিফ থাকার দরুন 'উম্মী' হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি দূরীভূত হয়ে যায় না। কেননা এরকম বহু লোক আছেন, যিনি নিজে লিখতে জানেন না, তবে কোনো কোনো শব্দের আকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে

জানেন। যেমন নিজের নাম দস্তখত করতে পারেন। কিন্তু স্বাভাবিক লেখা লিখতে পারেন না। অনেক বাদশাহও পৃথিবীতে এরকম ছিলেন। আবার এমনও হতে পারে যে, ওই সময় তাঁর পবিত্র হাতে লেখা জারী হয়েছিলো। সুতরাং তা স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে মোজেযা প্রকাশ করার পর্যায়ে হতে পারে। এরকম হলে 'উম্মী' হওয়ার বৈশিষ্ট্য থেকে বেরিয়ে আসতে হয় না। এরকম সমাধান দিয়েছেন উসুল শাস্ত্রবিদগণের অন্যতম আবু জাফর সুমনানী। ইবনে জওযী তা অনুসরণ করে বর্ণনা করেছেন।

বান্দা মিসকীন (মাদারেজুন নবুওয়াত গ্রন্থকার আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী) বলেন, স্বহস্তে লেখার বৈশিষ্ট্যের আলোকে আলোচনা করলে মতবিরোধ তো দেখা দিবেই। হাদিস শরীফের বাহ্যিক বাচনভঙ্গিও সেরূপ প্রমাণ করে। সুতরাং একে যদি মোজেযা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে 'উম্মী' হওয়ার বৈশিষ্ট্যটিও বলবৎ থাকে।

কেউ যদি এরকম বলে যে, 'উম্মী' হওয়া ও লিখতে না জানা কুরআন নাযিলের কাল পর্যন্ত ছিলো, তাহলে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। আর যদি তারপরে লেখার যোগ্যতা এসে থাকে, তাহলে তো এক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ নেই। দ্বিধা-সন্দেহের সূত্রপাত হওয়ার অবকাশ আর থাকে না। সুতরাং এ কথাটিও ভেবে দেখার বিষয়। কেননা বিরুদ্ধবাধীরা তখন বলার সুযোগ পাবে যে, তিনি লেখা পূর্ব থেকেই জানতেন, কিন্তু গোপন করে রেখেছিলেন। আর সে সময় এ আয়াতটিও 'ওয়ামা কুংতা তাতলূ মিন ক্বাবলিহী মিন কিতাবিওঁওয়ালা তাখুতুহু বিইয়ামিনিকা' (আপনি পূর্ব থেকেই কোনো কিতাব পাঠ করতে পারছিলেন না এবং আপনার ডান হাত লিখতে পারছিলো না) বিরুদ্ধবাদীদের কোনো উপকারে আসতো না। শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, সঠিক কথা এই যে, 'কাতাবা' (লিখেছেন) এর অর্থ লিখার হুকুম দিয়েছেন। ওয়াল্লাহু আলাম।

সন্ধির পর কোরবানী

সন্ধিনামা যখন লিপিবদ্ধ করা হলো তখন সমস্ত বড় বড় সাহাবী এবং কিছু কিছু মুশরিক আপন আপন সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করলো। তখন রসুলেপাক স. সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, ওঠো এবং আপন আপন কোরবাণীর পশু যবেহ করো। নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করে নাও এবং হেরেমের বাইরে চলে এসো। ওমরা না করে ফিরে আসতে হচ্ছে মনে করে সাহাবায়ে কেরাম সীমাহীন মনোপীড়ায় ভুগছিলেন। তাই কেউ উঠলেন না। তিনি স. রাগান্বিত হয়ে হজরত উম্মে সালামার তাঁবুতে প্রবেশ করলেন এবং সাহাবীগণের হুকুম পালনে ইতস্ততঃ করার বিষয়ে বললেন। উম্মে সালামা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল ! তাদেরকে মাযুর মনে করুন। কেননা তারা খুবই দুঃখ পেয়েছে। তাদের মনে মক্কাবিজয়ের আশা

রোপিত হয়েছিলো এবং তারা একথায় দৃঢ়বিশ্বাস করেছিলো যে, ওমরা করেই প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। এদিকে আপনি তো কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। তারা তাই মর্মাহত। আপনার যদি এমতো অভিপ্রায় থাকে যে, সাহাবীগণ কোরবানী করুক এবং মস্তক মুণ্ডন করুক, তাদেরকে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আপনি উঠুন, কোরবানী করুন এবং মস্তক মুণ্ডন করুন। আপনাকে এরকম করতে দেখলে আপনার অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই তাদের থাকবে না। তারাও সকলেই আপনাকে অনুসরণ করবে। রসুলেপাক স. হজরত উম্মে সালামার তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন ও কোরবানী করলেন। মস্তক মুণ্ডন করলেন। সাহাবায়ে কেরামও তাই করতে লাগলেন। কিন্তু চিন্তা ও মনোকষ্টে তখন তাঁদেরকে ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিলো। কোনো কোনো সাহাবী মস্তক মুণ্ডন করলেন। কেউ কেউ চুল কর্তন করলেন। রসুলেপাক স. দোয়া করলেন, 'আল্লাহুম্মাগফিরলি মুলহিক্বীন' (হে আল্লাহ! সমস্ত মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করে দাও)। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'ওয়াল মুক্বাস্‌সিরীনা ইয়া রসূলাল্লাহ' (চুল কর্তনকারীদের জন্যও কি? হে আল্লাহর রসুল!)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও রসুলেপাক স. বললেন, 'আল্লাহুম্মাগফিরিল মুহাল্লিক্বীন' (হে আল্লাহ! কর্তনকারীদের ক্ষমা করে দাও)। চতুর্থবার বললেন, 'আল মুক্বাস্‌সিরীন' (হাঁ, কর্তনকারীদের জন্যও)। তিনি স. মস্তক মুণ্ডনকারীদের জন্যও দোয়া করেছিলেন তিন বার। এটা ছিলো তাঁদের প্রভূত মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত।

জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, আবু জাহেলের যে উটটি রসুলুল্লাহ স. এর উটগুলোর সঙ্গে ছিলো, মুশরিকরা চেয়েছিলো সে উটটিকে যেনো যবেহ না করা হয়। সুহায়ল ইবনে ওমর যে সন্ধির ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী ছিলো, সে মুশরিকদেরকে অনেক তিরস্কার করলো এবং তাদেরকে বললো, তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এমনই হয়ে থাকে, তবে তার বিনিময়ে তোমরা মোহাম্মদকে একশ' উট দিয়ে দাও। তাহলে তিনি মেনে নিবেন। সুহায়লের পরামর্শক্রমে কুরাইশরা একশ' উট রসুলেপাক স. এর নিকট নিয়ে এলো। কিন্তু তিনি স. তা কবুল করলেন না। বললেন, এই উটটি যদি কোরবানীর জন্য নির্ধারণ করা না হতো তাহলে তোমাদের আবেদন কবুল করা হতো। এখানে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুশরিকরা ওই উটের ব্যাপারটি সন্ধির শর্তের মধ্যে উল্লেখ করেনি। অথবা উল্লেখ করেছিলো কিন্তু তা কবুল করা হয়নি। শ্রদ্ধেয় আলেমগণ বলেন, আবু জাহেলের উট জবেহ করার ইচ্ছায় কাফেরদের রাগের সূত্রপাত হয়েছিলো এবং তাদের অন্তরসমূহ ভেঙে গিয়েছিলো। জীবনীপ্রণেতাগণ বলেন, রসুলেপাক স. এর বিশটি উট, যার মধ্যে আবু জাহেলের উটও ছিলো, নিজ হাতে জবেহ করেছিলেন। অবশিষ্ট উটগুলো নাহিয়া ইবনে জুন্দুবকে দিলেন সেগুলো মক্কায় নিয়ে জবেহ করে সেখানকার দরিদ্রদের মধ্যে গোশত বণ্টন করে দেওয়ার জন্য। কেউ কেউ বলেন,

হুদীর সমস্ত উটই হুদায়বিয়ায় জবেহ করা হয়েছিলো। এজন্যই ইমাম শাফেয়ীর নিকট নহরের জন্য হেরেম শর্ত নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে হেরেমের মধ্যে নহর করা শর্ত। কেননা হুদায়বিয়ার কিয়দংশ ছিলো হেরেমের সীমানার মধ্যে আর কিয়দংশ ছিলো হেরেমের বাইরে। জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যখন কোরবানী এবং মস্তক মুণ্ডন শেষ করলেন, তখন আল্লাহ্তায়ালা সেখানে এক ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করে দিলেন। ওই ঝড়ো হাওয়া মুসলমানদের কর্তিত চুলগুলো উড়িয়ে মক্কায় নিয়ে গেলো এবং হেরেমের মধ্যে ফেলে দিলো। রসুলেপাক স. তাঁর নিজের কর্তিত কেশরাশি খেজুর গাছের নিচে রেখেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম সেগুলো নেওয়ার জন্য ভিড় করলেন। উম্মে আম্মারা বলেন, আমি বহু কষ্ট করে সেখান থেকে কয়েকখানা চুল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেগুলো আমি যত্নসহকারে আমার কাছে রেখে দিয়েছি। সে চুল পানির মধ্যে ধৌত করে উক্ত পানি কোনো রোগীকে পান করালে রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

হুদায়বিয়ার প্রান্তরে ইসলামী বাহিনী বিশ দিন অবস্থান করেছিলো। রসুলেপাক স. সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে দায়হান নামক স্থানের মতান্তরে কুরাউলগামীম নামক স্থানের নিকটবর্তী হলেন, তখন সুরা ইন্না ফাতাহ্না নাযিল হলো, যা দ্বীন ও দুনিয়ার মকসুদ ও জাহের ও বাতেনের কামালাতে ভরপুর। রসুলেপাক স. বললেন, আজ রাতে আমার উপর এমন এক সুরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমি ওই সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক পছন্দ করি, যেগুলোর উপর সূর্যের আলো পতিত হয়। অতঃপর তিনি সাহাবীগণকে সুরা ইন্না ফাতাহ্না পাঠ করে শোনালেন। তারপর শুভসংবাদ জানালেন। সাহাবীগণও আল্লাহ্র প্রশংসাধ্বনি উচ্চারণ করলেন। একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এই সূরায় উল্লিখিত বিজয় হচ্ছে হুদায়বিয়ার সন্ধি, যা সুমহান ফয়েজসমূহের উৎস ও ভূমিকা। বিষয়টি সুস্পষ্ট। অবশ্য কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দল 'ইন্না ফাতাহ্না' দ্বারা মক্কা বিজয় বুঝে থাকেন। আবার কেউ মনে করেন খয়বর বিজয়কে, যদিও এই বিজয় তখন পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তবু এখানে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করে তার বাস্তবায়ন যে অবশ্যম্ভাবী তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরবদের মধ্যে এবং কোরআন মজিদে এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের প্রচলন আছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হুদায়বিয়া সন্ধিকালে বিস্ময়কর যে সব ঘটনা ঘটেছিলো, তন্মধ্যে আবু বাসীর এর ঘটনা অন্যতম। তিনি ছিলেন উতবা ইবনে আসাদ ছাকাফীর পুত্র এবং বনী যুহরার মিত্র। ঘটনাটি এরকম— রসুলুল্লাহ স. যখন সন্ধিনামা সম্পন্ন করলেন এবং হুদায়বিয়া থেকে মদীনায় ফিরে এলেন, তখন আবু বাসীর মুসলমান হয়ে মক্কা মুকাররমা থেকে পলায়ন করে পায়ে হেঁটে সাত দিনে রসুলেপাক স. এর খেদমতে এসে উপস্থিত হলেন। কুরাইশ কাফেররা তাঁর

খোঁজে দু'জন লোক পাঠালো। একজন ছিলো বনী আমর গোত্রের। তার নাম জানা যায়নি। আর অপরজন তার কর্মচারী ও সাথী কাউছার। তারা দু'জনে এসে রসুলেপাক স. এর নিকট একটি পত্র হস্তান্তর করলো। তাতে লেখা ছিলো, মোহাম্মদের হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে আবু বাসীরকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত হবে। হজরত উবাই ইবনে কাআব মুশরিকদের চিঠি পাঠ করে শোনালেন। রসুলেপাক স. আবু বাসীরকে তাদের কাছে হস্তান্তর করলেন। আবু বাসীর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আমাকে মুশরিকদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন? রসুলেপাক স. বললেন, তারা তো আমার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। আর তুমি তো জানো, ওয়াদাভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের কাজ নয়। যাও, আল্লাহ্তায়ালা তোমার বিষয়ে প্রশস্ততা আনয়ন করবেন। তারপর প্রেরিত লোকদ্বয় তাঁকে নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হলো। তারা যখন যুলহুলায়ফাতে তাঁবু ফেললো, তখন আবু বাসীর সেখানকার মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে সঙ্গে আনা খাবার নিয়ে সামনে রেখে বসে পড়লেন। সাথীদ্বয়কেও খেতে ডাকলেন, যাতে তাদের সাথে ভাব জমানো যায়। আবু বাসীর আমেরীর নাম ও বংশ পরিচয় জানতে চাইলেন। আলাপ আলোচনার মধ্যে বললেন, বাহ! আপনার তলোয়ারটিতো খুব চমৎকার। আমেরী খুশী হলো। তলোয়ারটি খাপ থেকে বের করে বললো, তুমি ঠিকই বলেছো, আমি কয়েকবারই এটা পরীক্ষা করে দেখেছি। এটি খুবই ভালো কাজ দেয়। আবু বাসীর বললেন, আমাকে দেন না, দেখি। আমেরী অন্যমনষ্ক হয়ে তলোয়ারটি আবু বাসীরের হাতে দিয়ে দিলো। আবু বাসীর তলোয়ারটি হাতে নিয়ে তাকে সজোরে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হলো তার। কাউছার ভয়ে দৌড় দিলো। নবী করীম স. এর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করলো। রসুলেপাক স. দূর থেকে তাকে ছুটে আসতে দেখলেন। কাছে এসে সে বললো, আমার সাথীকে হত্যা করা হয়েছে। আমি পালিয়ে এসেছি। একটু পরে আবু বাসীর আমেরীর তলোয়ার হাতে নিয়ে এবং তারই বাহনে চড়ে সেখানে পৌছলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো আমাকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। এখন আল্লাহ্তায়ালা আমাকে তাদের কাছ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। রক্ষা করেছেন তাদের ক্ষতি থেকে। তিনি স. বললেন, আবু বাসীর তো যুদ্ধের আগুন উত্তপ্ত করেছে। এখন তার সাহায্যকারী কে হবে? তাঁর কথায় এই ইঙ্গিতটি নিহিত ছিলো যে, আবু বাসীরের উচিত হবে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া। যে সব মুসলমান মক্কায় আটকা আছে তাদের সাথে তার মিলে যাওয়া উচিত। ব্যাখ্যাকারগণ রসুলেপাক স. এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা এরকমই বের করেছেন। তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য আবু বাসীরের কাজের নিন্দা জ্ঞাপন করা ছিলো না; বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো এই মর্মে বিস্ময় প্রকাশ করা যে, সে বীরের মতো কাজ করেছে। এখন যদি কেউ তাকে সাহায্য করে, তবে সে

অনেক বড় বড় কাজও সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। যদিও বক্তব্যের বাহ্যিক ভঙ্গি থেকে বুঝা যায় যে, একথা দ্বারা তাঁর কাজের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। সে একটি যুদ্ধের আগুন উত্তপ্ত করেছে এ কথা ঠিক। কিন্তু এখন কেউ যেনো তাকে বুঝিয়ে দেয় যে, সে যেনো আমাদের কাছে না থাকে। এখান থেকে চলে যায়। কেননা এখানে তার অবস্থান যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। কেউ কি এখানে আছে যে, পুনরায় তাকে ধরে নিয়ে কুরাইশদের কাছে সোপর্দ করে দিয়ে আসবে? সে সুযোগও তো নেই।

আবু বাসীর রসুলেপাক স. এর বক্তব্য শুনে আর দেরী করলেন না। তৎক্ষণাৎ মসজিদ থেকে বের হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। এক পর্যায়ে তিনি সাগরের উপকূলে ঈস নামক স্থানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। স্থানটি ছিলো কুরাইশদের শাম দেশের দিকে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে কাফেলা আনাগোনার পথে। পরবর্তীতে এমন হয়েছিলো যে, যারাই মক্কা থেকে মুসলমান হয়ে আসতো তারাই আবু বাসীরের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যেতো। এভাবে তাঁরা এখানে সংঘবদ্ধ দলে পরিণত হয়ে গেলেন। জীবনীলেখকগণ বলেন, আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুক আবু জন্দলের কাছে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন, আবু জন্দল সুহায়ল ইবনে আমরের পুত্র। তিনি হুদায়বিয়ার কালে মুসলমান হয়ে রসুলেপাক স. এর কাছে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি স. তাঁকে তাঁর পিতার কাছে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। হজরত ওমর রা. তাঁর কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে আবু বাসীরের ঘটনা শুনিয়ে পিতার পক্ষ ছেড়ে আবু বাসীরের কাছে চলে আসার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। আবু জন্দলও একদিন পালিয়ে এসে আবু বাসীরের সঙ্গে একত্রিত হলেন। এভাবে সেখানে তৈরী হয়ে গেলো প্রায় তিনশত লোকের একটি বড় দল। কুরাইশদের কোনো কাফেলা শাম দেশের দিকে যাত্রা করলে পথিমধ্যে তাঁরা একযোগে তাদেরকে আক্রমণ করতেন। কাফেলার লোকদেরকে হত্যা করতেন এবং তাদের মাল সহায়-সম্পদ হস্তগত করতেন। কুরাইশরা বিপাকে পড়ে গেলো। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য পেরেশান হতে লাগলো। তারা আবু সুফিয়ান ইবনে হারবকে রসুলেপাক স. এর দরবারে পাঠালো। আবু সুফিয়ান প্রস্তাব দিলো, আমরা সন্ধির এই শর্তটি প্রত্যাহার করে নিলাম। এখন থেকে কেউ ইচ্ছা করলে মুসলমান হয়ে আপনার কাছে চলে আসতে পারবে। আপনি তাদের নিরাপত্তা দিতে পারবেন। এ ব্যাপারে আমাদের আর কোনো আপত্তি নেই। রসুলেপাক স. আবু বাসীরের দলকে মদীনায় ডেকে আনালেন। আপন মেহেরবাণীর ছায়াতলে আশ্রয় দিলেন। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. তখন আবু বাসীরের কাছে একটি পত্র পাঠিয়ে বলেছিলেন, তুমি তোমার সকল সাথীকে নিয়ে আমাদের এখানে চলে এসো। রসুলেপাক স. এর পবিত্র পত্রখানা যখন তাঁর নিকট পৌঁছলো, তখন তিনি মৃত্যু শয্যায়। তিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর পবিত্র পত্রখানা

হাতে নিয়ে মাথা ও চোখের উপর স্থাপন করলেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর প্রাণপাখি জান্নাতের পথে যাত্রা করলো। আবু জন্দল তাঁকে গোছল দিয়ে কাফন পরিয়ে দাফন করলেন এবং তাঁর কবরের কাছে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। তারপর সাথীদেরকে নিয়ে মদীনায় চলে এলেন।

বাদশাহ্দের কাছে দূত ও ফরমান প্রেরণ

এ বৎসর রসুলে আকরম স. আশেপাশের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের কাছে দূত ও ফরমান প্রেরণ করেন। কোনো কোনো জীবনীলেখকের ধারণা, ফরমান প্রেরণের কাজটি হয়েছিলো হিজরতের সপ্তম বৎসরে মহররম মাসে। এ কাজটি ষষ্ঠ সালের শেষে এবং সপ্তম সালের শুরুতে হয়েছিলো। একথার অর্থ— ষষ্ঠ সালে তিনি স. এরকম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, আর সে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেছিলেন সপ্তম সালে। অথবা এমনও হতে পারে যে, কিছু কাজ হয়েছিলো ষষ্ঠ সালে এবং কিছু হয়েছিলো সপ্তম সালে। এ কারণেই এ বিষয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আংটি মুবারক

রসুলেপাক স. যখন বাদশাহ্দের নিকট ফরমান প্রেরণের ইচ্ছা করলেন, তখন সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, যে চিঠির মধ্যে সীলমোহর থাকে না, তার প্রতি রাজা-বাদশাহ্রা যথাযথ গুরুত্ব দেয় না এবং তারা তা পাঠও করে না। তাই তিনি স. একটি স্বর্ণের আংটি বানিয়ে নিলেন। তা দেখে সাহাবীগণ নিজেদের জন্য স্বর্ণের আংটি তৈয়ার করলেন। হজরত জিবরাইল এসে বললেন, পুরুষদের জন্য দুনিয়াতে স্বর্ণ পরিধান করা হারাম। তখন রসুলেপাক স. পবিত্র হাত থেকে আংটি খুলে ফেললেন। সাহাবীগণও খুলে ফেললেন। এবার তিনি স. রৌপ্যের আংটি বানানোর নির্দেশ দিলেন, যার কলম ও নগীনা উভয়টিই হবে রৌপ্যের। নগীনার উপর 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' খোদাই থাকতে হবে। খোদাই করতে হবে এভাবে— 'আল্লাহ' প্রথম লাইনে, 'রাসুল' দ্বিতীয় লাইনে এবং 'মুহাম্মদ' তৃতীয় লাইনে।

ওই আংটির সীলমোহরের মাধ্যমে যে সকল বাদশাহ্র নিকট পত্র পাঠানো হয়েছিলো, তাঁদের একজন ছিলেন হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশী। দ্বিতীয় জন ছিলেন রোমের সম্রাট হেরাকাল। আর তৃতীয় জন ছিলেন পারস্যের বাদশাহ কেসরা। চতুর্থ জন ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ্ মাকুকাস। পঞ্চম শাম দেশের বাদশাহ আবু শামর গাসসানী। ষষ্ঠ ইয়ামামার গর্ভনর হাওদা ইবনে আলী হানাফী। এ ছ'জনের

নিকট রসুলেপাক স. চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। কোনো কোনো জীবনীলেখক সপ্তম জনের নামও উল্লেখ করেছেন। তিনি হচ্ছেন, বাহরাইনের শাসক মুনযির ইবনে সাবী। জীবনীলেখক 'ণ বর্ণনা করেন, যে সকল বাদশাহ্র কাছে দূত প্রেরণ করা হয়েছিলো, আল্লাহতায়ালা তাঁদের প্রত্যেকের জবানে এলহাম করে দিয়েছিলেন। এটিও ছিলো রসুলেপাক স. এর অন্যতম মোজেযা।

হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশী

নাজ্জাশীর নাম ছিলো মূলতঃ আসমাহা ইবনুল হবর। তাঁর কাছে দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো আমর ইবনে উমাইয়া যমরীকে। তিনি নবীজীর দরবারের একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। রসুলেপাক স. এর পবিত্র পত্রখানা যখন তাঁর হাতে পৌঁছলো, তখন তিনি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। সিংহাসন থেকে নেমে মাটিতে এসে আদব ও তাযীমের সাথে পত্রখানা হাতে নিলেন। তাতে চুম্বন করলেন। চোখের উপর স্থাপন করলেন। পবিত্র পত্রখানা পাঠ করার জন্য হুকুম দিলেন। চিঠিতে লেখা ছিলো— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহর পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর প্রতি। আমি তোমার কাছে ওই আল্লাহ্তায়ালার হামদ ও ছানা প্রেরণ করছি যিনি সত্যিকারের বাদশাহ্ এবং একচ্ছত্র মালিক। তিনি সব দোষ ও ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি সমস্ত বিপদ ও আয়েব থেকে সুরক্ষিত। আয়াত ও মোজেযাসমূহের মাধ্যমে তিনি তাঁর নবীগণকে সত্যাধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষাকারী। তিনিই তাঁর নবীগণকে উচ্চ মর্যাদা দানকারী। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, বলপ্রয়োগকারী, অহংকারকারী এবং সর্বজ্ঞাতা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ঈসা আল্লাহ্র রূহ এবং তাঁর কলেমা। সে কলেমাকে তিনি পুতপবিত্রা মরিয়মের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং তা ঈসায় পরিণত হয়েছে। তারপর আল্লাহ্তায়ালা ঈসাকে তাঁর রূহ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সে রূহ মরিয়মের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন। যেমন আদমকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছিলেন। অতঃপর নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে সত্যধর্ম ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইতোপূর্বে আমি তোমার কাছে আমার চাচাত ভাই জাফর ইবনে আবী তালেব এবং তার সাথী মুসলমানদেরকে পাঠিয়েছিলাম। তোমার জন্য সমীচীন হবে অহংকার প্রদর্শন না করা। সত্য গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতে সদুপদেশ শ্রবণ করা এবং আনুগত্যের মধ্যে প্রবেশ করা। ওয়াস্ সালামু আ'লা মান ইত্তাবাআল হুদা।

নাজ্জাশী কলেমা তাইয়্যেবা এবং কলেমা শাহাদত উচ্চারণ করলেন। বললেন, সাধ্য থাকলে আমি নিজেই রসুলুল্লাহর দরবারে হাজির হতাম এবং নিজেকে ধন্য করতাম।

রসুলেপাক স. এর পবিত্র চিঠির উত্তরে নাজ্জাশী লিখলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌র প্রতি। হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার উপর ওই আল্লাহ্‌র শান্তি, রহমত ও বরকত, যিনি ব্যতীত উপাসনা গ্রহণের যোগ্য আর কেউ নেই। তিনিই আমার ইসলামের পথ প্রদর্শক। অতঃপর নিঃসন্দেহে আপনার চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। নবী ঈসার সম্পর্কে আসমান যমীনের রবের সাথে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি তার চেয়ে বেশী কিছু নন। এক বর্ণনায় আছে, খেজুরের আঁটির উপর যে টুকু আবরণ থাকে, সে পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী কিছু তিনি নন। নিশ্চয়ই আমি আপনার আনীত শরীয়তের হাকীকত সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আমি আপনার চাচার পুত্র এবং তাঁর সাথে আগত সাহাবীগণকে সম্মান করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র সত্যবাদী রসুল। অতীতের নবীগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহ আপনাকে প্রত্যয়ন করেছে। আমি আপনার চাচার পুত্রের মাধ্যমে আপনার কাছে বায়াত গ্রহণ করছি এবং প্রকারান্তরে আপনার পবিত্র হাতেই ইসলাম কবুল করে নিলাম। ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আমি আপনার খেদমতে আমার পুত্র আরছা ইবনে আসমাহাকে প্রেরণ করলাম। হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যদি হুকুম করেন তাহলে আমি নিজেও আপনার খেদমতে উপস্থিত হবো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি যা কিছু বলেছেন, তা সবই সত্য। ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ!

নাজ্জাশীর নামে দ্বিতীয় চিঠি

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. নাজ্জাশীর নামে আরেকটি পত্র লিখেছিলেন, যার বিষয়বস্তু ছিলো এরকম— আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবা যিনি হাবশায় হিজরতকারী মুহাজিরদের মধ্যে আছেন তাঁকে আমার বিবাহের পয়গাম দিয়ে মদীনায় পাঠিয়ে দাও। তাছাড়া হাবশায় আর যত মুহাজির রয়েছে তাদের সকলকেই মদীনায় পাঠিয়ে দাও। নাজ্জাশী উম্মে হাবীবার নিকট রসুলেপাক স. এর বিবাহের প্রস্তাব পৌছে দিলেন। হজরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আসকে বিবাহের উকীল বানানো হলো। মোহরানা ধার্য করা হলো চারশ' মিছকাল স্বর্ণ। সমস্ত মুহাজিরদের জন্য সাজসজ্জা প্রস্তুত করে দু'টি নৌকায় আরোহণ করিয়ে আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর সঙ্গে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করা হলো।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, নাজ্জাশী হাতির দাঁতের নির্মিত একটি সিন্দুক আনয়ন করে তার মধ্যে রসুলেপাক স. এর পবিত্র পত্র দু'খানা সংরক্ষণ করে বলেছিলেন, পত্র দু'খানা যতদিন হাবশাবাসীদের কাছে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত খায়ের ও বরকত বর্ষিত হতে থাকবে। জীবনীলেখকগণ আরও বলেন, রসুলেপাক স. এর পত্র দু'খানা এখন পর্যন্ত হাবশার বাদশাহদের হাতে আছে। তারা এর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে আছে, নাজ্জাশীর মূল নাম ছিলো আসমাহা। নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে মুসলমানগণ হিজরত করে তাঁর কাছেই গিয়েছিলেন। আর ষষ্ঠ সালে রসুলেপাক স. তাঁর কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। আসমাহা নাজ্জাশী হিজরী নবম সালে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. মদীনায় তাঁর জানাযার নামাজ পড়েছিলেন। তারপর অপর এক নাজ্জাশী হাবশার শাসক হয়েছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁর প্রতিও পত্র লিখেছিলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা, তা জানা যায় না। ঐতিহাসিকগণ এই দুই নাজ্জাশীর মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলেছেন এবং দু'জনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেননি। সহীহ্ বোখারীতে যে নাজ্জাশীর উল্লেখ করা হয়েছে, সে নাজ্জাশী রসুলেপাক স. কর্তৃক প্রেরিত পত্রের প্রাপক নয়। ওই নাজ্জাশীও নয়, যার জানাযা পড়েছিলেন স্বয়ং রসুলেপাক স.। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রোমের বাদশাহ্ হেরাকলের নামে

হেরাকল রোমের বাদশাহ্র নাম। অভিধানগ্রন্থে আছে, হেরাকল হচ্ছেন রোমের প্রথম বাদশাহ্। যিনি সে দেশে মুদ্রা ও আশরাফী চালু করেছিলেন এবং দীনারের ছাঁচও তৈয়ার করেছিলেন। ইনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাদশাহ্দের কাছে বায়াতের প্রথা চালু করেছিলেন। তাঁর কাছে বিখ্যাত সাহাবী হজরত দাহিয়াতুল কালবীকে দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো। উল্লেখ্য, হজরত জিবরাইল অধিকাংশ সময় দাহিয়াতুল কালবীর সুরতে নবী করীম স. এর দরবারে আগমন করতেন। তিনি খুব সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। রসুলুল্লাহ্ স. তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তুমি বসরার শাসনকর্তার কাছে চলে যাও। সে তোমার সঙ্গে এমন কাউকে দিবে, যে তোমাকে হেরাকলের কাছে নিয়ে যাবে। নির্দেশানুসারে তিনি বসরার শাসনকর্তার কাছে গেলেন। সেখানকার হারেছ ইবনে আবী শামর এই পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন সম্মানিত লোক ছিলেন। তিনি আবী ইবনে হাতেম তাঈয়ের সংসর্গে থাকতেন। তিনিই হজরত দাহিয়াতুল কলবীকে সঙ্গে নিয়ে হেরাকলের রাজধানীর দিকে রওয়ানা হলেন। ঘটনাক্রমে বাদশাহ্ হেরাকল সে সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে যিয়ারতে গিয়েছিলেন। ইতোপূর্বে বাদশাহ্ হেরাকল মান্নত করেছিলেন, রোমের

কিছু অংশ, যা পারস্যাধিপতি খসরু পারভেজের কবজায় চলে গিয়েছিলো, তা যদি তার কবজা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন, তবে কনষ্টান্টিনোপল থেকে খালি পায়ে হেঁটে বায়তুল মুকাদ্দাস যাবেন এবং মসজিদে আকসায় নামাজ আদায় করবেন। অন্যান্য ইবাদতও করবেন। পরবর্তীতে যখন রোমীয়রা পারসিকদের উপর বিজয়ী হলো, তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, রাস্তায় গালিচা বিছিয়ে তার উপর ফুল ও সুগন্ধি ছড়ানো হোক। যথারীতি নির্দেশ পালিত হলো। হেরাকল তার উপর পা রেখে বায়তুল মুকাদ্দাস গেলেন এবং মান্নত পুরা করলেন। সেখানে অবস্থানের সময় এক রাতে তারকারাজীর গতি প্রতিক্রিয়া ও বিধানের উপর গবেষণা করলেন। অনুধাবন করলেন, তাঁর নিজের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে। বিষয়টি নিয়ে হেরাকল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। মুসাহেবরা জিজ্ঞেস করলো, আজ আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে কেনো? হেরাকল বললেন, আসমানী গতিবিধির আলোকে প্রতীয়মান হচ্ছে, খতনাকৃত সম্প্রদায়ের বাদশাহের আবির্ভাব ঘটেছে। অচিরেই আমাদের রাজত্বে তাদের প্রভাব বিস্তার হবে। আমাদের দেশের শহরগুলো তাদের অধীনে চলে যাবে। তোমরা আমাকে বলো দেখি, এমন সম্প্রদায় আছে কি, খতনা করা যাদের আদর্শ?

মুসাহেবরা বললো, ইহুদীরাই খতনা করে থাকে। হেরাকল হুকুম দিলেন, ইহুদীদেরকে যেখানে পাও হত্যা করে ফেলো। এমনি অবস্থায় হেরাকলের কানে লোকেরা পৌছালো, আরব দেশে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর অনেক বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রকাশ পাচ্ছে। বর্ণনাকরীরা তাকে নূরে নবুওয়াতের বহিঃপ্রকাশ বলে আখ্যায়িত করছে। তারা বলছে, তিনি শেষ যামানার নবী। আর এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, তিনি একজন খতনাকৃত ব্যক্তি। হেরাকল বললেন, তারকারাজীর পথনির্দেশনা থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, যে জামাতের বাদশাহর আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেলো, সেটি এই জামাতই। এমন সময় হজরত দাহিয়াতুল কালবী আদী ইবনে হাতেম বসরীর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন। রসুলেপাক স. এর পত্র হস্তান্তর করলেন। পত্রে লখা ছিলো— বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসুল মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রোমাধিপতি হেরাকলের নিকট। শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর যে সরল পথের অনুসারী। অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের কলেমার দিকে আহবান জানাচ্ছি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো। শান্তিতে থাকবে। আল্লাহতায়ালা তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো, এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করো, সত্যের আহবানকে স্বীকার করতে না চাও, তাহলে তোমার প্রজাদের পাপরাশিও তোমার উপর বর্তাবে। কোরআন মজীদে স্বয়ং আল্লাহ বলেন—'ইয়া আহ্‌লাল কিতাবী তাআ'লাও ইলা কালিমাতিন সাওয়াইম

বাইনানা ওয়া বাইনাকুম আল্লা না'বুদা ইল্লাল্লাহা ওয়ালা নুশরিকা বিহি শাইয়াওঁ ওয়ালা ইয়াত্তাখিযা বা'দ্বুনা বা'দ্বান আরবাবাম মিন দূনিল্লাহি ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকুলূশহাদূ বিআন্না মুসলিমূন' (হে কিতাবীগণ! আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি, কোনো কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম)(৩ঃ৬৪)। পত্র পাঠ করে হেরাকল ভীত হলেন। তার কপালে ঘাম দেখা গেলো। তার মজলিশে শোরগোল আরম্ভ হয়ে গেলো। তিনি সভাসদদেরকে বললেন, খুঁজে দেখো তো আমার রাজ্যে এমন কোনো ব্যক্তি আছে কিনা, যে নবুওয়াতের দাবীদার সম্প্রদায়ভূত? আমি তার কাছে ওই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জানবো। ঘটনাক্রমে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আবু সুফিয়ান ইবনুল হারব ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশে ছিলেন। রসুলেপাক স. এর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। লোকেরা হেরাকলের হুকুমে তাঁকে বায়তুলমুকাদ্দাসে অবস্থানরত হেরাকলের কাছে নিয়ে গেলো। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আবু সুফিয়ান বলেন, আমরা যখন রোম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হলাম তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো, যে বংশসম্পর্কের দিক দিয়ে এই ব্যক্তির (নবী করীম স.) অধিক নিকটবর্তী? আমি বললাম, আমি। তিনি আমার সম্ভ্রান্ত চাচার সন্তান। বাহ্যিক অর্থে আবু সুফিয়ানের কথাটি সঠিক ছিলো না। তবে তার কথা অঠিকও নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, রসুলেপাক স. এবং তাঁর পিতা পিতামহগণের সংগে তাঁর বংশীয় সম্পর্ক যে রয়েছে, সেকথা জানানো। আবু সুফিয়ানের দাদা ছিলেন উমাইয়া ইবনে আবদে শামছ ইবনে আবদে মানাফ। আর রসুলেপাক স. এর দাদা হচ্ছেন আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ। এ হিসেবে কয়েক পুরুষ উপরে তাঁদের উভয়ের বংশ এক হয়ে গিয়েছে। আবু সুফিয়ান একটু বাড়িয়েই বলেছিলেন। তিনি বলেন, হেরাকল আমাকে তাঁর সামনে দাঁড়াতে বললেন। আমার সাথীদেরকে দাঁড় করালেন আমার পশ্চাতে। দোভাষীকে বললেন, এর সাথীদেরকে বলে দাও, আমি আবু সুফিয়ানকে সেই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞেস করবো। সে যদি বাস্তবের বিপরীত জবাব দেয়, তবে তার সাথীরা যেনো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আবু সুফিয়ান বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি একথার লজ্জা-শরম না রাখতাম যে আমাকে মিথ্যাবাদী বলা হবে, তবে আমি তাঁর সম্পর্কে অনেক মিথ্যা বলতাম। আবু সুফিয়ান সত্যই বলেছিলেন। নবী করীম স. এর সঙ্গে তাঁর তো ছিলো ঘোর শত্রুতা। তাই রসুলুল্লাহ্ স. সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানই ছিলো তাঁর জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর শরম লজ্জার কথাটা ছিলো নিছক কথার কথা। কেননা লজ্জা-শরম তো তার মধ্যেই থাকে, যার ইমান

আছে। আর আবু সুফিয়ানের তো সে সময় ইমানই ছিলো না। তবে হাঁ, মানুষের সামনা-সামনি অপমান-অপদস্থ হওয়ার ভয়টি অবশ্য সে সময় তাঁর মধ্যে কাজ করেছিলো। কেননা হেরাকল আবু সুফিয়ানের সাথীদেরকে নিয়োজিত করে রেখেছিলো তাঁর কথার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য। আবার মিথ্যা বললে, শাস্তির ভয় ছিলো। আবু সুফিয়ানের ক্ষেত্রে সেই ভয়টিই ছিলো আসল ভয়। এছাড়া অন্য কোনো বাধা তাঁর ছিলো না।

আবু সুফিয়ান বলেন, হেরাকল প্রশ্ন করলেন, সেই মহান ব্যক্তির বংশমর্যাদা কী রকম? আমি বললাম, তিনি সমূচ্চ বংশমর্যাদাধারী। সম্মানিত এবং মহান। উল্লেখ্য, বনী হাশেম ও আবদে মানাফের বংশমর্যাদা আরব জাহানে সুস্বীকৃত ছিলো। একথা হাদিস শরীফেও এসেছে। যেমন রসুলেপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা ইব্রাহিমের আওলাদগণের মধ্যে ইসমাঈলকে সম্মানিত করেছেন। আওলাদে ইসমাঈল থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে হাশেমকে, আওলাদে হাশেম থেকে আবদুল মুত্তালিবকে। সুতরাং সম্মানিতদের মধ্যে আমি সর্বাধিক সম্মানিত। হেরাকল বললেন, নবী-রসুলগণ এরকম সম্মানিত বংশেরই হয়ে থাকেন, যাতে করে তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে কোনো রকম লজ্জা শরম ও হীনমন্যতা কাজ না করে। হেরাকল আবার প্রশ্ন করলেন, আরব দেশে কুরাইশ বংশ থেকে ইতোপূর্বে আরও কেউ কি নবুওয়াতের দাবী করেছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, কেউ যদি নবুওয়াতের দাবী করে থাকতো তাহলে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে পারতো যে, তিনি তাঁর পূর্ববর্তীগণের কথার অনুসরণ করছেন। আবু সুফিয়ান বলেন, অতঃপর হেরাকল জিজ্ঞেস করলেন, সে ব্যক্তির পূর্ব পুরুষদের মধ্য থেকে কেউ কি বাদশাহী করেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এমন যদি হতো, তাহলে আমি বলতাম, এ ব্যক্তি তাঁর পিতার বাদশাহী পুনরুদ্ধারকামী। নবুওয়াত কেবল বাহানা। রাজত্ব কামনাই তাঁর লক্ষ্য। হেরাকল বললেন, শক্তিশালী এবং বড় বড় লোক তাঁর অনুসরণ করে— না দুর্বল ও অভাবী লোকেরা? আমি বললাম, দরিদ্র লোকেরা। তিনি বললেন, নবীগণকে দুর্বল লোকেরাই অনুসরণ করে থাকে। হেরাকল আবার প্রশ্ন করলেন, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমে যাচ্ছে? আমি বললাম, বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, এভাবেই ইমানের কাজ দিন দিন বৃদ্ধি পায়। এমনকি পূর্ণতার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হেরাকল জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর ধর্ম থেকে কি কেউ ফিরে গিয়েছে? তাঁর এই সুস্পষ্ট ধর্মকে অপছন্দ করে কেউ কি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, ইমানের স্বাদ এমনই জিনিস, যখন তা অন্তরে অনুপ্রবেশ করে, তখন তা প্রাণের মধ্যে স্থায়ীভাবে গ্রথিত হয়ে যায়। হেরাকল জিজ্ঞেস করলেন, নবুওয়াতের দাবীর পূর্বে লোকেরা কি কখনও তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তো ঠিকই

আছে। এখন তিনি মানুষের কাছে এবং আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করবেন কেনো? হেরাকল জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন? যুদ্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কখনও কোনো অঙ্গীকার করে থাকলে তা কি তিনি ভঙ্গ করেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, নবীগণের অবস্থা এরকমই হয়ে থাকে। তাঁরা কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। ওয়াদা খেলাফ করে দুনিয়াদারেরা। নবীগণ তো দুনিয়া অন্বেষণকারী নন। আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, অধুনা আমাদের ও তার মধ্যে একটি সন্ধিনামা সম্পাদিত হয়েছে। আবু সুফিয়ান বলেন, আমার একথা বাড়িয়ে বলার উদ্দেশ্য ছিলো, যদি এর মাধ্যমে মুসলমানদের সম্পর্কে বাদশাহ্র কাছে কোনো ক্রটি প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে তো ভালোই হয়। হেরাকল বিষয়টির প্রতি লক্ষ্যই করলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ও সেই ব্যক্তির মধ্যে কি কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করো। আমি বললাম, কখনও তিনি আমাদের উপর বিজয়ী হয়েছেন, যেমন বদরে। আবার কখনও আমরা তাঁদের উপর বিজয়ী হয়েছি, যেমন উহুদে। তিনি বললেন, নবীগণের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। কখনও তাঁরা দুশমনদের প্রাবল্যের ফলে পরাজিত হয়ে যান। তবে পরিণামে তাঁরাই বিজয় লাভ করেন। হেরাকল বললেন, তিনি তোমাদিগকে কি কি বিষয়ে হুকুম দিয়ে থাকেন? আমি বললাম, তিনি আমাদিগকে এ মর্মে হুকুম দিয়ে থাকেন যে, তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করো, যার কোনো শরীক নেই। কোনো কিছুকে তার সাথে শরীক কোরো না। তোমাদের পিতা-পিতামহগণ যা বলেছেন এবং করেছেন তা বর্জন করো। তিনি আমাদিগকে নামাজ, রোজা, দান, সত্যবাদীতা, পবিত্রতা ও রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম দিয়ে থাকেন। তিনি বললেন, যা কিছু তুমি বললে, এ সবই নবীগণের প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং প্রশংসিত স্বভাব। বিস্ময়ের ব্যাপার, হেরাকল আবু সুফিয়ানকে কিন্তু প্রশ্ন করলেন না যে, তাহলে তোমরা তাঁর আনুগত্য করছো না কেনো? তাঁর উপর ইমান আনছো না কেনো? সম্ভবতঃ তিনি ধারণা করেছিলেন, তিনি হয়তো বলবেন, তিনি আমাদের বাপদাদাগণের বিরুদ্ধে হুকুম দিয়ে থাকেন। তার এরকম প্রশ্ন না করার আরেকটি কারণ ছিলো, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, আবু সুফিয়ান কাফের। জীবনীলেখক বলেন, হেরাকল রসুলেপাক স. এর পবিত্র চিঠি রেশমী কাপড়ে আবৃত করে সিন্দুকের মধ্যে সংরক্ষণ করেছিলেন। চিঠিখানি বংশানুক্রমে তাঁদের মধ্যে ছিলো এবং কোনো বাদশাহ্ই তা আপন মহল থেকে বের করেননি।

এরপর রোমের বাদশাহ্ হেরাকল আবু সুফিয়ানকে বললেন, ওই ব্যক্তির যে গুণাবলীর কথা তুমি বললে, তা যদি সত্যিই হয়, তবে অচিরেই তিনি আমার এ রাজত্ব পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে যাবেন এবং এ শহর পর্যন্ত তাঁর নির্দেশ কার্যকর হবে।

আমি দৃঢ়তার সাথেই জানতাম বর্ণিত গুণাবলীসম্পন্ন একজন নবী অবশ্যই জন্মগ্রহণ করবেন। তবে এটা অকাট্যভাবে জানতাম না যে, সে নবী তোমাদের মধ্য থেকেই আগমন করবেন। যদি জানতাম এবং যদি সম্ভব হতো, তাহলে অবশ্যই ইতোপূর্বেই তাঁর কাছে হাজির হওয়ার চেষ্টা করতাম এবং সৌভাগ্য লাভে ধন্য হতাম।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, তারপর হেরাকল হজরত দাহিয়াতুল কালবীকে নির্জনে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি জানি, তিনি প্রেরিত রসুল এবং তিনিই সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর জন্য আমরা অপেক্ষমাণ। তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা আমি আসমানী কিতাবসমূহে পাঠ করেছি। কিন্তু আমি ভয় করছি, আমি যদি তাঁর অনুসরণ করি, তাহলে রোমকগণ আমাকে হত্যা করে ফেলবে। এরপর হেরাকল হজরত দাহিয়াতুল কালবীকে আরেক রোমীয় ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তার নাম সানআতের। লোকটি নাসারাদের পথপ্রদর্শক এবং ঈসায়ী ধর্মের ইমাম ছিলেন। হজরত দাহিয়াতুল কালবী যখন তাঁর কাছে গেলেন, তখন তিনিও উক্তরূপ মন্তব্য করলেন। বললেন, আল্লাহ্র শপথ! মোহাম্মদ সত্য। তোমরা তাঁর যে সব গুণাবলী বর্ণনা করেছো, তা আমরা আমাদের কিতাবসমূহে পাঠ করেছি। তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। সানআতের উঠে দাঁড়ালেন এবং গির্জায় গিয়ে উপস্থিত জনতাকে বললেন, হে রোমকগণ! আহমদ আরাবীর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে একটি পত্র পাঠানো হয়েছে। উক্ত পত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে সত্যধর্মের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁর রেসালতের বাস্তবতা সূর্যের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট। তোমরা স্বীকার করে নাও, আল্লাহ্ এক এবং আহমদ তাঁর রসুল। নাসারারা যখন সানআতের মুখ থেকে এই শাহাদতের বাণী শুনলো, তখন তারা তীর ও তলোয়ারের আঘাতে তাকে শহীদ করে দিলো। হজরত দাহিয়াতুল কালবী সেখান থেকে ফিরে এসে হেরাকলের কাছে যাবতীয় বৃত্তান্ত পেশ করলেন। হেরাকল বললেন, আমি তোমাকে তো বলেই ছিলাম, আমি নাসারাদেরকে ভয় করি। আল্লাহ্র কসম! সানআতের ছিলেন আমার চেয়ে অধিক শ্রদ্ধার্হ। রোমকরা আমার চেয়ে তাকেই বেশী বিশ্বাস করতো। এই বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্যতার স্তরে পৌঁছেছে যে, হেরাকল যখন সানআতেরের সংবাদ জানতে পারলেন, তখন তিনি বায়তুলমুকাদ্দাস ছেড়ে তাঁর রাজধানী হেমসে চলে গেলেন। প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে তাঁর দরবারে আহবান করলেন এবং তাদেরকে সেকরায় অবস্থান করতে দিলেন। সেকরা বলা হয় এমন মহলকে, যার পাশে ছোটো ছোটো অনেক ঘর থাকে। তিনি নির্দেশ দিলেন, সেকরার দরজাসমূহ বন্ধ করে দাও। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। তিনি ঘরের এক

জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলতে লাগলেন, হে রোমকগণ! তোমরা যদি নিজেদের কল্যাণ, মুক্তি ও সঠিক পথের আকাঙ্খা রাখো এবং যদি চাও তোমাদের রাজ্য ঠিক থাকুক, তাহলে ওই নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ করো, যিনি আরবে আবির্ভূত হয়েছেন। রোমকরা হেরাকলের কথা শুনে উন্মাদের মতো যে যেদিকে পারলো দৌড়ে পালাতে উদ্যত হলো এবং গাধার মতো চিৎকার করতে করতে বিভিন্ন স্থানে লাথি মারতে লাগলো। মহলের দরজার মুখোমুখি হয়ে দেখলো দরজা বন্ধ। হেরাকল তাদের চরম উত্তেজিতভাব দেখে তাদের ইমান আনার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেলেন। তিনি সকলকে ফিরে আসতে বললেন। সবাই যখন ফিরে এলো তখন তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই এরকম বলেছি। তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা যাচাই করতে চেয়েছিলাম আমি। এখন বুঝতে পারলাম, আপন ধর্মের প্রতি তোমাদের রয়েছে সুদৃঢ় প্রত্যয়। রোমকরা খুশি হলো এবং তাঁকে সেজদা করে একে একে সকলেই বিদায় নিয়ে গেলো।

ইমাম বোখারী তাঁর সহীহ বোখারীতে উল্লেখ করেছেন, বাদশাহ্ হেরাকলের সর্বশেষ অবস্থা কী ছিলো? তিনি কি দুনিয়া থেকে মুসলমান অবস্থায় বিদায় নিয়েছিলেন? না কি কাফের অবস্থায়? এ প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কোনো কোনো আলেমের মতে হেরাকল দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং তিনি ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেননি। সহীহ্ বোখারীর বর্ণিত হাদিসের আলোকে জানা যায়, ওই ঘটনার দুই বৎসর পর মুতার যুদ্ধে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিলো। ওই যুদ্ধে অনেক মুসলমান শাহাদত বরণ করেছিলেন। তবুকের প্রান্তরেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্যসমাবেশ করেছিলো তারা। উলামায়ে কেরামের আরেকটি দলের মত এরকম— সম্ভবতঃ তিনি গোপনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তবে নিজের ধ্বংস ও বাদশাহী হারানোর আশংকায় বিশ্বাসকে প্রকাশ করতে পারেননি। তবে মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তবুক প্রান্তর থেকে রসুলেপাক স. এর খেদমতে একটি পত্র পাঠিয়ে বলেছিলেন, আমি মুসলমান হয়েছি। রসুলেপাক স. বলেছিলেন, সে মিথ্যা বলেছে। বরং সে তার নাসারা ধর্মমতের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ঐতিহাসিকদের নিকট এ বিষয়টি নিয়েও মতভেদ আছে যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক অথবা হজরত ওমর ফারুকের শাসনামলে তাঁর পুত্রকে মুসলমানগণ ধরে এনেছিলো। তবে প্রকাশ্য কথা এই যে, স্বয়ং বাদশাহ হেরাকলকেই ধরে আনা হয়েছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

পারস্যের বাদশাহ্ কেসরা

কেসরা পারস্যের বাদশাহ্র উপাধি। সে সময় পারস্যের বাদশাহ্ ছিলেন খসরু পারভেজ ইবনে হুরমুজ ইবনে নওশেরওয়া। ঐতিহাসিকগণ বলেন, সে সময় বাদশাহ্ ছিলেন নওশেরওয়া। কথাটি ভুল। কেননা নওশেরওয়া বাদশাহ্ ছিলেন রসুলেপাক স. এর জন্মগ্রহণের সময়। যেমন তিনি স. বলেছেন, 'উলিদতু ফী যামানিল মালিকিল আ'দিল' (অর্থাৎ আমি একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্র কালে জন্ম গ্রহণ করেছি)। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট তা বিশুদ্ধ নয়। এটা কেমন করে হতে পারে যে, শিরকের সিফতের সঙ্গে আদলের সিফত যুক্ত হবে? কেননা শিরক হচ্ছে স্বয়ং বিরাট যুলুম। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'ইন্নাশ শিরকা লাযুলমুন আ'যীম' (নিশ্চয়ই শিরক বড় যুলুম)। ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'আদল' অর্থ এখানে প্রজাদেরকে দেখাশোনা করা, তাদের প্রতি সহমর্মী হওয়া ও তাদের ফরিয়াদ কবুল করা। সাধারণ অর্থে এটাকেই 'আদল' বলা হয়ে থাকে।

পারস্যাধিপতির নিকট রসুলেপাক স. এর পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী। তিনি ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির সাহাবীগণের একজন। তাঁর বংশসম্বন্ধ ছিলো কুরাইশের শাখা সাহম ইবনে আমর কুতাইয়ের সঙ্গে। তাঁকে হুকুম দেওয়া হয়েছিলো তিনি যেনো বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট পত্রখানি পৌছে দেন এবং তাঁকে বলেন, তিনিই যেনো কেসরার কাছে পত্রখানা পৌছানোর ব্যবস্থা করেন।

কেসরা পারভেজের নিকট প্রেরিত পত্র

এই পত্রের মূল বিষয় ছিলো এরকম— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে পারস্যের বাদশাহ্ কেসরার নামে। সালাম ওই ব্যক্তির উপর, যে সঠিক পথের অনুসারী ও আল্লাহ্র উপর ইমান আনয়নকারী। আর যে সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ্ এক এবং মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল। আমি তোমাকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। নিঃসন্দেহে সমগ্র মানবজাতির প্রতি আমি আল্লাহ্র রসুল। আমি প্রেরিত হয়েছি মানুষকে (আখেরাতের শাস্তির বিষয়ে) ভয় প্রদর্শন করতে এবং কাফেরদের উপর দলিল কায়েম করতে। তুমি মুসলমান হয়ে যাও, তাহলে শান্তিতে থাকতে পারবে। আর যদি অস্বীকার করো ও অবাধ্য হও, তাহলে তোমার জন্য রয়েছে অগ্নিপূজকদের অপপরিণতি।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এর পত্র পাঠ করে খসরু পারভেজ বললো, মোহাম্মদ আমার কাছে এভাবে চিঠি লিখলো? সে তো আমার গোলাম ও প্রজা (নাউযুবিল্লাহ)। বলা বাহুল্য, পারভেজের এতোটুকু জ্ঞানও ছিলো না যে, রসুলেপাক স. আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগৃহীত বান্দা। যাঁকে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর অন্যান্য সকল বান্দার উপর নেতা ও বিচারক বানিয়েছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, সে আরও অনেক অপমন্তব্য করেছিলো। বলেছিলো, মোহাম্মদ তার নিজের নাম আমার নামের উপর লিখেছে। চিঠি লেখার রীতিই এরকম যে, প্রেরকের নাম প্রাপকের আগে লিখতে হয়। আর রসূলেপাক স. এর নাম তো আরশের উপরেও লিখিত আছে। কিন্তু হতভাগা খসরু সে কথা জানে না। তুমি খসরু কে, আর তোমার নামই বা কী? নিরেট কাফের ও জাহান্নামী। সে সীমালংঘন করলো। রাগান্বিত হয়ে রসুলেপাক স. এর পত্রখানি টুকরা টুকরা করে ফেললো এবং পাগলের মতো প্রলাপ বকতে শুরু করলো। পত্রবাহকের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলো না। পত্রের উত্তরও লিখলো না। রসুলেপাক স. এর কাছে যখন এই সংবাদ পৌছলো, তখন তিনি স. বললেন, 'মায্‌যাক্বা কিতাবী মায্‌যাক্বাল্লাহু মুলকাহু' (হতভাগা আমার চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছে। আল্লাহ-তায়ালা তার রাজত্বও টুকরা টুকরা করে ফেলবেন)। অতঃপর খসরু ইয়ামনের শাসনকর্তা বাজানের নিকট পত্র লিখলো, শোনা যাচ্ছে, আরব দেশের হেজাজে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, যে নবুওয়াতের দাবী করছে। তুমি দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি পাঠিয়ে তাকে বন্দী করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। নির্দেশানুসারে সে তার রাজ্যের খাজাঞ্চীকে পাঠিয়ে দিলো। তার নাম ছিলো বাতুইয়া। সে ছিলো পারস্যের জ্ঞানী ও বাহাদুরদের অন্যতম। তার সঙ্গে আরেক ব্যক্তিকেও পাঠানো হলো, যার নাম ছিলো খারখারা। সেও ছিলো পারস্যের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাদের দু'জনকে রসুলেপাক স. এর অবস্থার খোঁজ-খবর করার জন্য পাঠানো হলো। খসরু পারভেজ ইয়ামনের শাসনকর্তা বাজানের কাছে আর একটি চিঠি লিখলো। নির্দেশ দিলো— তুমি অবশ্যই ওই ব্যক্তির সাথে পারস্যাধিপতির সঙ্গে দেখা করবে। কথিত ব্যক্তিদ্বয় তায়েফে পৌছে এবং সেখানকার কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদের যেমন— আবু সুফিয়ান ও সফওয়ান ইবনে উমাইয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাথে দেখা করে রসুলেপাক স. এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। তারা বললো, সে এখন ইয়াছরিবে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একথা বুঝতে পেরে খুব খুশী হলো। পারস্যাধিপতির সঙ্গে এবার মোহাম্মদের বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। এবার নিশ্চয়ই দুশমন নিপাত হবে।

প্রেরিত ব্যক্তিদ্বয় মদীনা মুনাওয়ারা পৌছে রসুলেপাক স. এর মজলিশে হাজির হলো। বললো, শাহানশাহে কেসরা ইয়ামনের শাসনকর্তা বাজানের নিকট পত্র পাঠিয়েছেন। সে পত্রের মূল বক্তব্য হচ্ছে, দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যেনো

আপনার কাছে যায় এবং আপনার যাবতীয় অবস্থা জেনে আসে। আমরাই সেই প্রেরিত ব্যক্তিদ্বয়। বাজান আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমরা চাই, আপনি আমাদের সাথে শাহানশাহ্ খসরু পারভেজের কাছে চলুন। আপনি যদি খুশি ও আগ্রহের সাথে আমাদের সঙ্গে চলেন, তবে বাজান শাহানশাহের নিকট সুপারিশনামা লিখে দিবেন। অতীতের ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি স্বেচ্ছায় যেতে অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করেন, তবে কেসরার বিক্রম ও পরাক্রম সম্পর্কে আপনার তো অবশ্যই জানা আছে। আপনি এও জানেন যে, তিনি কী ধরনের বাদশাহ্। তিনি আপনার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিবেন এবং আপনার শহরকে করে দিবেন ধূলিস্যাত। একথা বলার পর তারা বাজানের লিখিত পত্রটি রসুলেপাক স. এর কাছে হস্তান্তর করলো। তাদের প্রলাপোক্তি শুনে রসুলেপাক স. মৃদু হাসলেন। এক বিবরণে আছে, বাতুইয়া ও খারখারা রসুলেপাক স. এর দরবারে এসেছিলো হাতে স্বর্ণের চুরি পরিধান করে এবং রেশমী পোশাক পরে। কোমরে ছিলো কারুকার্য খচিত মোটা কোমরবন্দ। তাদের দাঁড়ি ছিলো মুণ্ডিত। আর গোঁফ ছিলো এতো লম্বা যে, তাতে আবৃত হয়েছিলো ওষ্ঠাধর। অবশ্য অগ্নিপূজকেরা এভাবেই তাদের শৌর্যবীর্য প্রকাশ করতো। রসুলেপাক স. তাদের বেশভুষাকে খুবই অপছন্দ করলেন। বললেন, আক্ষেপ-আফসোছ তোমাদের জন্য! এভাবে দাড়ি কামাতে এবং গোঁফ লম্বা করতে তোমাদেরকে কে হুকুম দিয়েছে? তারা বললো, আমাদের প্রভু কেসরা। রসুলেপাক স. বললেন, কিন্তু আমার প্রভু আমাকে দাঁড়ি লম্বা এবং গোঁফ ছোটো রাখতে আদেশ করেছেন। ঠিক আছে। এবার তোমরা বসে পড়ো। উভয়েই দু'জানু হয়ে বসে গেলো। রসুলেপাক স. তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। পরকালের পুরস্কারের প্রতি উৎসাহিত করলেন। আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখালেন। তারা বললো, মোহাম্মদ! এবার উঠে পড়ুন এবং যাত্রারম্ভ করুন। আপনাকে আমরা শাহানশাহের কাছে নিয়ে যাবো। যদি না যান, তাহলে আজমের শাহানশাহ এক আঘাতে আপনাকে আপন অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। সকলকে হত্যা করে ফেলবেন, অথবা দেশান্তরিত করে দিবেন। বর্ণিত আছে, ওই দুই নাপাক কাফেরের আচরণ ও বেআদবী করা সত্ত্বেও নবুওয়াতের চিহ্নের আজমত ও পবিত্র মজলিশের ভীতি তাদের মধ্যে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, তাদের দেহের অস্থিসন্ধিসমূহ ঠক ঠক করে কাঁপছিলো। ভয়ভীতির কারণে তারা বিগলিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। কেননা তারা যা বলছিলো, তা ছিলো নবুওয়াতের দরবারে চরম বেআদবী। কিন্তু রসুলেপাক স. তাদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর আচরণ প্রদর্শন করে যাচ্ছিলেন। তিনি স. বাজানের পত্রের জবাব দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। তাদেরকে বললেন, এখন যাও। আজ তোমরা তোমাদের অবস্থানস্থলে গিয়ে বিশ্রাম করো। আগামীকাল এসো। দেখা যাক কী করা যায়। দূতদ্বয় যখন রসুলেপাক স. এর মজলিস থেকে বাইরে এলো, তখন একজন বলতে লাগলো, আমরা ওই মজলিসে আরও কিছু সময়

অবস্থান করলে মনে হয় ধ্বংসই হয়ে যেতাম। অপরজন বললো, সারা জীবনে আর কখনো আমার উপর এরকম ভয়-ভীতি চেপে বসেনি, আজকে যেরকম হলো। মনে হচ্ছে, এ লোক অলৌকিক প্রভু কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত এবং তার কাজ সেই প্রভুরই কাজ। পরদিন তারা রসুলেপাক স. এর দরবারে যখন হাযির হলো, তখন তিনি স. বললেন, তোমরা বাজানকে জানিয়ে দাও, আমার প্রভুপালক তোমাদের শাহানশাহ থেকে আমাকে নিস্কৃতি দিয়েছেন (তোমাদের শাহানশাহ খসরুকে হত্যা করা হয়েছে)। এখন থেকে সাত ঘণ্টা পূর্বে রাত্রিকালে তার পুত্র শিরভিয়াকে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। সে তার পিতার পেট ফেঁড়ে দিয়েছে। রাত্রটি ছিলো ৭ম হিজরীর জমাদিউসসানী মাসের মঙ্গলবারের রাত্র। রসুলেপাক স. বাজানের প্রেরিত দূতদ্বয়কে আরো বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীকে আরো বলে দিয়ো যে, অতিসত্বর কেসরার রাজ্যে আমার ধর্ম বিজয়ী হবে। সে যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে যতটুকু অঞ্চল তার অধিকারে আছে তা তাকেই দিয়ে দেওয়া হবে। পারস্যের শাসনকর্তা হিসাবে তাকেই নিযুক্ত করা হবে।

দূতদ্বয় চলে গেলো। ইয়ামনে পৌঁছে তারা বাজানের কাছে সব কিছু খুলে বললো। বাজান জিজ্ঞেস করলো, ওই ব্যক্তির কি কোনো পাহারাদার আছে? তারা বললো, না। তিনি তো বাজারসমূহে এবং মানুষের মহল্লায় মহল্লায় স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করেন। বাজান বললো, আল্লাহ্র কসম! তোমরা যা বলছো, তা শুনে মনে হচ্ছে, তিনি তো কোনো বাদশাহ্ নন। আমার মনে হয় তিনি নবী ও রসুল। তাঁর নবুওয়াতের মধ্যে কোনো সন্দেহ আছে বলে আমার মনে হয় না। কোনো বাদশাহ্ আমার আগে তাঁর উপর ইমান আনতে পারবে না। সে মুহূর্তেই বাজানের নিকট পারভেজের পুত্র শিরভিয়ার পত্র পৌঁছলো। পত্রের সারমর্ম ছিলো এরকম— কেসরা পারস্যের বড় বড় লোকদেরকে বিনা অপরাধে হত্যা করছিলো। রাজ্যের বড় বড় দলের মধ্যে বিভেদ বিশৃংখলা সৃষ্টি করছিলো। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাকে হত্যা করেছি এবং জনগণকে তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ করেছি। এখন তোমার উচিত আমার আনুগত্য করা এবং জনগণকে আমার আনুগত্যের প্রতি আহবান করা। খবরদার আরব ও আজমের সেই বিত্তবান ব্যক্তি, যিনি নবুওয়াতের দাবী করেছেন, কক্ষণও তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে না, যতক্ষণ না সে বিষয়ে আমার কোনো ফরমান তোমার কাছে পৌঁছবে। পত্রপাঠ করার পরক্ষণেই বাজান নির্দ্বিধায় খাঁটি অন্তরে কলেমা শাহাদত উচ্চারণ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলেন। সেখানকার অন্যান্য পারসিকরাও ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য করলেন। শিরভিয়ার রাজত্ব লাভের পর পারস্যবাসীদের অবস্থা কী হয়েছিলো, রসুলেপাক স. এর সাথে তাদের আচার-আচরণ কীরূপ ছিলো এ সকল তথ্যের সবিস্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে 'ইতিহাস' গ্রন্থে। আগ্রহী পাঠক সেখানেই সবকিছু দেখে নিতে পারেন।

মিসর ও ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ্ মাকুকাস

মিসর ও ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ্ মাকুকাসের নিকট দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো বিখ্যাত সাহাবী হজরত হাতেব ইবনে আবী বুলতাআকে। তার কাছে প্রেরিত পত্রের শিরোনাম ও সারমর্ম হেরাকলের নিকট প্রেরিত পত্রের শিরোনাম ও সারমর্মের অনুরূপ। হজরত হাতেব ইবনে আবী বুলতাআ যখন পবিত্র পত্রখানি তার কাছে পৌছালেন, তখন বাদশাহ্ মাকুকাস তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং এ বিষয়ে উত্তম মন্তব্য করলেন। হজরত হাতেবকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর কাছ থেকে রসুলেপাক স. এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শুনলেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে যাবতীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ হুবহু ওই রকমই পেলেন, যে রকম বলে গিয়েছেন হজরত ঈসা আ. আখেরী জামানার নবী সম্পর্কে। বললেন, তিনিতো ওই রসুল যাঁর আগমন সম্পর্কে নবী ঈসা সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি বিজয়ী হবেন এবং এ সকল দেশ তাঁর সাহাবীগণের করতলগত হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মাকুকাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। ইমানী অধীনতা ও আনুগত্যের পথ গ্রহণ করে সৌভাগ্যবান হতে পারেনি।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে আছে, হজরত হাতেব যখন মাকুকাসের নিকট পৌছলেন, তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মাকুকাস! আপনার পূর্বে এ রাজ্যে একজন নৃপতি ছিলো, যে মনে করতো এবং দাবীও করতো 'আনা রব্বুকুমুল আ'লা' (আমি তোমাদের বড় প্রভুপালক)। তার পরিণতি কী হয়েছিলো, তা-ও আপনার জানা আছে। 'ফাআখাযাহুল্লাহু নাকালাল আখিরাতি ওয়াল উলা' (অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করিলেন)। মাকুকাস বললেন, আমাদের একটি ধর্ম আছে, আমরা তা বর্জন করতে পারি না এর চেয়ে উত্তম কোনো ধর্ম ব্যতীত। হজরত হাতেব বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্র ধর্মের দিকে আহবান জানাচ্ছি, যে ধর্মের নাম ইসলাম। আল্লাহ্তায়ালা এ ধর্মের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্ম থেকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই এই সম্মানিত নবী লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু কুরাইশদের হৃদয় কঠিন। অধিকতর শত্রুতা পোষণ করে ইহুদীরাও। আর তাদের নিকটতম নাসারারা। আমার জীবনের শপথ! নবী মুসার সুসংবাদ নবী ঈসার জন্য এমন নয়, যেমন নবী ঈসার সুসংবাদ নবীয়ে খায়েরুজ্জামান মোহাম্মদ আরাবীর জন্য। আমরা আপনাদেরকে কোরআনের দিকে ওইভাবেই আহবান জানাচ্ছি, যেমন আপনারা আহবান জানিয়েছেন তৌরাতের অনুসারীদেরকে ইনজিলের দিকে। নবীগণ আবির্ভূত হয়ে যে সম্প্রদায়কে পান সেই সম্প্রদায়কেই সত্যের আহবান জানান। আর সত্যের আহবানকে কখনো প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

আপনাদের উচিত এই নবীর আনুগত্যকে স্বীকার করে নেওয়া। আপনি এই নবীকে পেয়েছেন। সুতরাং তাঁর প্রতি ইমান আনয়ন করুন। এটা আপনার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। নবী ঈসার ধর্মকে আমরা তো অস্বীকার করি না। বরং তাঁকে প্রকৃত স্বীকৃতিদানকারী আমরাই। তাঁর বিধান এটাই যে, আখেরী জামানার নবীর মহাআবির্ভাব যখন ঘটবে, তখন তাঁর প্রতি অবশ্যই ইমান আনতে হবে। মাকুকাস বললেন, আমি এই নবীর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমি একথাও জানি যে, তিনি অগ্রহণযোগ্য কোনো বিষয়ের নির্দেশ দেননি। এমন কোনো কিছু থেকেও বাধা দেননি, যা শওক ও আগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি জাদুকর নন এবং মিথ্যাবাদী গণকও নন। তবে এ বিষয়ে আমি আরও বেশী চিন্তা-ভাবনা করতে চাই।

তারপর মাকুকাস রসুলেপাক স. এর পত্রখানি হাতে নিলেন এবং হাতীর দাঁতের নির্মিত সিন্দুকে রেখে দিলেন। রসুলেপাক স. এর দরবারে পত্র লেখার জন্য কাতেবকে আদেশ করলেন। পত্রটির বিষয়বস্তু এরকম— মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্র প্রতি আযীমুল কিবত মাকুকাসের পক্ষ থেকে। আমি আপনার পত্র পাঠ করেছি এবং পত্রে যা কিছু লেখা ছিলো এবং আপনি যে বিষয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তা আমার বোধগম্য হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমি জানি, এমন একজন নবী বাকী রয়ে গেছেন, যিনি হবেন খাতেমুল আম্বিয়া। আমার ধারণা, তাঁর আবির্ভাব শাম দেশে হবে। আমি আপনার দূতের আগমনকে স্বাগতম জানিয়েছি। আমি আপনার নিকট মারিয়া ও সিরীনকে প্রেরণ করছি। তাঁরা কিবতিদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাধারিণী। কিছু পোশাক, উপহার সামগ্রী এবং বাহন হিসেবে একটি উট প্রেরণ করলাম। ওয়াস্‌সালাম। মাকুমাস এর চেয়ে বেশী কিছু লিখেনি এবং ইসলামও গ্রহণ করেনি।

'ইস্তিয়াব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে— হজরত হাতেব বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. আমাকে ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ্ মাকুকাসের নিকট প্রেরণ করলেন। আমি তাঁর কাছে রসুলেপাক স. এর পত্র হস্তান্তর করলাম। তিনি আমাকে তাঁর আপন মহলে নিয়ে গেলেন। কয়েক রাত্র আমি সেখানে অতিবাহিত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রভু সম্পর্কে আমাকে বলো দেখি, তিনি কি আল্লাহ্র রসুল? আমি বললাম, হাঁ। তিনি আল্লাহ্র রসুল। তিনি বললেন, তাহলে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া করলেন না কেনো, যারা তাঁকে আপন শহর থেকে বের করে দিলো। আমি বললাম, তাহলে প্রশ্ন করি, নবী ঈসাকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা পাকড়াও করলো কেনো? কেনোই বা তাঁকে শূলীতে চড়ালো। তিনিও তো তাদের জন্য বদদোয়া করেননি। তাহলে তো আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। মাকুকাস বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। তবে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে এরকম আদেশই এসেছিলো।

হজরত হাতেব যখন মাকুকাসের নিকট থেকে ফিরে এলেন, তখন রসুলেপাক স. বললেন, দুষ্টটি তার বাদশাহী হারানোর ভয়ে বখিলী করেছে। অথচ তার বাদশাহী অবশিষ্ট থাকবে না। মাকুকাস হজরত ওমর ফারুকের খেলাফত কালে মৃত্যুবরণ করেছিলো। রসুলেপাক স. তাঁর পাঠানো তোহফাসমূহ কবুল করেছিলেন। হজরত মারিয়া কিবতিয়া ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁর পবিত্র উদর থেকেই হজরত ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সিরীনকে সমর্পণ করেছিলেন হজরত হাস্সান ইবনে ছাবেতের কাছে। তাঁর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন আবদুর রহমান ইবনে হাসসান।

'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে আছে, বাদশাহ মাকুকাস রসুলেপাক স.কে চারজন তুর্কী বাঁদী উপহার দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন মারিয়া ও অপরজন তাঁর ভগ্নি সিরীন। আরও দিয়েছিলেন একটি শাদা উট। তার নাম ছিলো দুলদুল। একটি গাধাও ছিলো তাঁর উপঢৌকনের মধ্যে। নাম ছিলো আফির বা ইয়া'ফুর। আরো ছিলো একটি তীর, বিশ প্রস্ত পোশাক এবং এক হাজার মেছকাল স্বর্ণ। এ সকল ছিলো রসুলেপাক স. এর জন্য। আর হজরত হাতেব ইবনে আবু বুলতাআকে দিয়েছিলেন একশ মিছকাল স্বর্ণ। পাঁচ প্রস্ত পোশাক। রসুলেপাক স. মারিয়া কিবতিয়াকে বাঁদী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর গর্ভ থেকে হজরত ইব্রাহীম ইবনে রসুলুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর সিরীনকে দিয়েছিলেন হাস্সান ইবনে ছাবেতের অধীনে। উপঢৌকনের মধ্যে আরও দু'জন বাঁদী ছিলো। কিন্তু তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। গাধাটির উপর রসুলেপাক স. কখনও কখনও আরোহণ করতেন। গাধাটি মারা গিয়েছিলো বিদায় হজ্বের সময়। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে এরকম বর্ণনা এসেছে। অপর এক বিবরণে এসেছে, গাধাটি রসুলেপাক স. এর মহাতিরোধানের পর শোকাকুল হয়ে কূপে ডুবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো। রসুলেপাক স. দুলদুলকে তাঁর নিজস্ব বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে হজরত আলী মুর্তজা তাতে আরোহণ করতেন। দুলদুল বলতে ওই শাদা উটকে বুঝানো হয়েছে, যাতে হজরত আলী মুর্তজার পর ইমাম হাসান আরোহণ করতেন। হজরত আলী ও হজরত মুআবিয়ার জামানায় তার মৃত্যু হয়েছিলো। অন্তিমকালে তার দাঁত পড়ে গিয়েছিলো। আটা পানিতে গুলে তাকে খাওয়াতে হতো। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে উপঢৌকনসমূহের তালিকায় বনহানের মধুর কথাও রয়েছে। তিনি স. ওই মধু খুব পছন্দ করেছিলেন। বনহান মিশরের একটি গ্রামের নাম। ওই মধুর ব্যাপারে রসুলুল্লাহ স. বরকতের দোয়া করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'বারাকাল্লাহু ফী আ'সলিন বানহানা' (আল্লাহ্তাআ'লা বানহানের মধুতে বরকত দান করুন)। জীবনীগ্রন্থসমূহে হজরত মারিয়া কিবতিয়া এবং দুলদুলের বর্ণনাই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হারেছ ইবনে আবী শামার গাসসানীর নিকট পত্র

রসুলুল্লাহ্ স. হারেছ ইবনে আবী শামার গাসসানীর কাছে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন শুজা ই নে ওয়াহাব আসাদীকে। তিনি যখন শাম দেশের সীমানায় পৌছলেন, জানতে পারলেন, হারেছ শামী দামেশকের গোয়াত নামক স্থানে গিয়েছেন হেরাকলের জন্য উপঢৌকন পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। হেরাকল তখন অবস্থান করছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসের ইলিয়াতে। শুজা কয়েকদিন গোয়াতে অবস্থান করলেন। কিন্তু হারেছের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলো না। হারেছের এক পাহারাদার ছিলো, যার অন্তরে ছিলো ইসলামের প্রতি ভালোবাসা। হজরত শুজা তাকে হারেছের নিকট চিঠি পাঠানোর মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলেন। কয়েকদিন অতিবাহিত হলো, কিন্তু তার সঙ্গেও দেখা হলো না। অকস্মাৎ একদিন হারেছকে দেখা গেলো, মাথায় মুকুট পরিহিত অবস্থায় তিনি সিংহাসনে বসে আছেন। হজরত শুজা তার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং রসুলেপাক স. এর প্রেরিত পত্রখানা তার হাতে দিলেন। পাঠ করার পর সে পত্রখানি মাটিতে নিক্ষেপ করলো এবং কিছু অশোভন উক্তিও করলো। লোকদেরকে হুকুম দিলো ঘোড়া প্রস্তুত করার জন্য, যেনো সে এই মুহূর্তেই রসুলেপাক স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে। এরপর সে বাদশাহ্ হেরাকলের নিকট একটি আবেদনপত্র লিপিবদ্ধ করলো। প্রথমে রসুলুল্লাহ স. এর চিঠির বিষয়ে জানালো। তার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে সে কথাও উল্লেখ করলো। হেরাকল বলে পাঠালেন, ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। প্রথমে তুমি আমার সাথে দেখা করে অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করো। তারপর কাজ করো। হেরাকলের চিঠি যখন হারেছের কাছে পৌছলো, তখন সে হজরত শুজাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তোমার মনিবের কাছে কবে প্রত্যাবর্তন করবে? তিনি বললেন, আগামীকাল। হারেছ তাঁকে একশত মিছকাল স্বর্ণ দিয়ে বিদায় দিলো। প্রহরী যখন হজরত শুজার কাছ থেকে বিস্তারিত বর্ণনা শুনলো, তখন কান্নায় ভেঙে পড়লো। বললো, আমি ইঞ্জিল কিতাবে মোহাম্মদ এবং তাঁর দ্বীন ও শরীয়ত সম্বন্ধে সকল বর্ণনাই পেয়েছি, যা আপনি বর্ণনা করলেন। আমি তাঁর উপর ইমান আনলাম এবং তাঁর সত্যতাকে স্বীকার করলাম। তবে হারেছকে আমি ভয় করছি। সে হয়তো আমাকে হত্যা করে ফেলবে। প্রহরী হজরত শুজাকে দাওয়াত করলেন এবং তার প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করলেন। তাঁকে কিছু কাপড় চোপড় ও পথখরচ দান করলেন। হজরত শুজা মদীনায় ফিরে এলেন। বিস্তারিত বৃত্তান্ত শুনে রসুলুল্লাহ স. বললেন, সে ধ্বংস হয়ে গেলো। তার রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মক্কাবিজয়ের বৎসর হারেছ জাহান্নামের যাত্রী হলো এবং তার রাজ্য জাবালা ইবনে আইহাস গাসসানীর হস্তগত হয়ে গেলো। কোনো কোনো জীবনীবিশেষজ্ঞ মনে করেন,

হারেছ মুসলমান হয়েছিলেন। তবে কায়সারের ভয়ে তাঁর ইমানকে তিনি প্রকাশ করেননি। যেমন বলা হয়ে থাকে কায়সার সম্পর্কেও। তিনিও নাকি ইমান এনেছিলেন, কিন্তু তা গোপন রেখেছিলেন। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওদা ইবনে হানাফীর নিকট

রসুলেপাক স. ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওদা ইবনে হানাফীর কাছেও চিঠি পাঠিয়েছিলেন। দূত হিসেবে গিয়েছিলেন হজরত সালীত ইবনে আমর আমেরী। হাওদা রসুলেপাক স. এর চিঠি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলেন। হজরত সালীতকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং প্রদান করলেন তাঁর খাস মহলের আতিথেয়তা। পত্রের সারমর্ম ছিলো এরকম— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর পক্ষ থেকে হাওদা ইবনে হানাফীর নামে। শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর যে হেদায়েতের অনুসরণ করে। জেনে রাখা উচিত যে, আমার দ্বীন অচিরেই খেফ ও হাফেরের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে (খেফ বলা হয় উট বকরীর ঝুটিকে। আর হাফের বলা হয় ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের ক্ষুরকে। একথার তাৎপর্য হচ্ছে, রসুলেপাক স. বোঝাতে চেয়েছেন, যেখান পর্যন্ত চতুষ্পদ প্রাণীর পা পড়বে এবং যেখানে লোকালয়ের শেষ প্রান্ত হবে সেখান পর্যন্ত আমার ধর্মমত পৌঁছে যাবে)। সুতরাং মুসলমান হয়ে যাও, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতের ভয়-ভীতি ও আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে। হাওদা রসুলেপাক স. এর চিঠির জবাবে লিখলেন, আপনার আমন্ত্রণের রীতি কতোই না উত্তম। আমি আমার সম্প্রদায়ের একজন কবি ও বাগ্মী। আরববাসীরা আমাকে ভয় পায়। আমার প্রতি রয়েছে তাদের প্রভূত সম্ভ্রমবোধ। তারা আমাকে মহান বলেই জানে। সুতরাং আমাকে কিছু কাজ সম্পাদন করার সুযোগ দিন। তাহলে আমি আপনার অনুসরণ করতে পারবো। আপনি আপনার শহরসমূহের বিধি নিষেধের বিষয়াদি আমার উপরে ন্যস্ত করুন। আর শহরবাসীদেরকে আমার কর্তৃত্বে দিয়ে দিন। যদি এরকম করেন, তবে আমি আপনার অনুসরণ করবো এবং আপনার কাছে চলে আসবো।

তিনি দূত সলীতকে বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করে দিলেন। সলীত মদীনায় পৌঁছে হাওদার চিঠি রসুলেপাক স. এর কাছে হস্তান্তর করলেন। চিঠিতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বিষয়ে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিলো তা দেখে তিনি স. বললেন, সে যদি আমার কাছে যমীনের একটি খেজুরের খোশা পরিমাণ জিনিসও চায়, তবুও আমি তা তাকে দেবো না এবং এরকম দেওয়াকে বৈধও মনে করবো না। তার কর্তৃত্বে যে সব রাজত্ব আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে আছে, জীবনী গ্রন্থাবলীতে এসেছে, সাবাবা আঙ্গুল অর্থাৎ সে যদি এক আঙ্গুল পরিমাণ যমীনও আমার কাছে চায়, আমি তাকে তা দিবো না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয় যখন সম্পন্ন হলো, তখন হজরত জিবরাইল হাওদার মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে এলেন। রসুলেপাক স. বললেন, এরপর ইয়ামামায় এক মিথ্যাবাদী জন্মগ্রহণ করবে। সে নবুওয়াতের দাবী করবে এবং পরবর্তীতে তাকে হত্যা করা হবে। রসুলেপাক স. একথার দ্বারা মুসায়লামা কায্যাবের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করলেন। সে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফত কালে মারা পড়েছিলো।

বাহ্রাইনের প্রতি প্রেরিত সপ্তম পত্র

কোনো কোনো জীবনীবিশেষজ্ঞ রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে আরও একটি পত্র প্রেরিত হয়েছিলো বলে বর্ণনা করেছেন। চিঠিটি পাঠানো হয়েছিলো বাহরাইনের শাসনকর্তা মুনযির ইবনে সাদীর নিকট। পত্রবাহক ছিলেন হজরত আলা ইবনুল হাযরামী। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে আছে, স্বসূত্রে আল্লামা ওয়াকেদী উল্লেখ করেছেন, হজরত ইকরামা বলেছেন, আমি ওই চিঠিখানি হজরত ইবনে আশাকের মৃত্যুর পর তার পুস্তকসমূহের মধ্যে পেয়েছিলাম। সেখান থেকেই আমি চিঠিখানির সারমর্ম সংকলন করেছি। ঘটনাটি এরকম— রসুলুল্লাহ স. আলা ইবনে হাযরামীকে মুনযির ইবনে সাদীর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠিতে তাঁকে ইসলামের দিকে আহবান করা হয়েছিলো। মুনযির এর জবাব দিয়ে ছিলেন এভাবে— হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনার প্রেরিত পত্র পাঠ করেছি, যা আপনি লিখেছেন বাহরাইনবাসীদের উদ্দেশ্যে। এখানে কিছু লোক এমন আছে, যারা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছে। খুশি মনে তারা ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে। আর কিছু লোক তা অপছন্দ করেছে এবং তারা ইসলামে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যেমন ইহুদী ও অগ্নিপূজকের দল। সুতরাং এমতাবস্থায় আপনি যা হুকুম করবেন, আমি তার উপরই আমল করবো। রসুলেপাক স. পুনরায় তাঁর নিকট লিখলেন— বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহীম। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুনযিরের নামে। শান্তি বর্ষিত হোক তোমার উপর। আমি তোমার পক্ষ থেকে ওই আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ এক এবং মোহাম্মদ তাঁর রসুল। অতঃপর আমি তোমাকে আল্লাহ্তায়ালার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। কোনো ব্যক্তি যদি কারও জন্য কল্যাণ কামনা করে— তাহলে সে কল্যাণ কামনা করে প্রকারান্তরে তার নিজের জন্যই। আর যে আমার দূতগণের আনুগত্য করে ও তাদের অনুসরণ করে, সে যেনো আমারই আনুগত্য ও অনুসরণ করলো। আর যে আমার দূতগণের কল্যাণ কামনা করে, সে যেনো আমারই

কল্যাণ কামনা করলো। আমার দূতগণ তোমার শিষ্টাচারের প্রশংসা করেছে। আমি তোমার কাছে তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারে সুপারিশ করছি। তুমি মুসলমানদেরকে ধর্ম শিক্ষা ও শরীয়তের বিধান শিক্ষার মধ্যে নিয়োজিত রেখো এবং তাদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখো, যতক্ষণ তারা সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যারা ইহুদী বা নাসারা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করে দিয়ো। মুসলমানদের জন্য তাদের যবেহকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ বৈধ নয়। তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনও অনুচিত। জিযিয়া আদায় করার দায়িত্ব দেওয়া হলো আলা আল হাযরামীর উপর। উল্লেখ্য, বর্ণিত নির্দেশনার প্রেক্ষিতেই আলা আল হাযরামী জিযিয়ার মাল উসুল করে রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির করতেন।

প্রকাশ থাকে যে, রসুলেপাক স. এর এ ধরনের চিঠিপত্র, যা ধর্মীয় বা জাগতিক বিষয়ে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও ব্যক্তির কাছে লিখেছিলেন, তার সংখ্যা অনেক। এখানে ওই সকল চিঠি পত্রের বর্ণনা দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিলো, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন বিভিন্ন বাদশাহগণের নিকট। বিশেষ করে হিজরী ষষ্ঠ সালে যেগুলো লেখা হয়েছিলো। সে কারণেই এখানে বাহরাইনের শাসনকর্তা মুনযির ইবনে সাদীর নিকট প্রেরিত পত্রের বর্ণনা প্রদান করা হলো। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে ওই চিঠির বিষয়ে বলা হয়েছে, চিঠিখানি হিজরী ৮ম সালে মক্কাবিজয়ের পরে প্রেরণ করা হয়েছিলো। আর জাবালা ইবনে আইহাস গাস্‌সানীর নামে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিলো, হারেছ ইবনে আলা শামার গাসসানীর মৃত্যুর পর বাদশাহ হয়েছিলো, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে পত্রটি ছিলো সপ্তম হিজরী সনের খয়বরের যুদ্ধের পরে।

আম্মানের বাদশাহ্‌র নিকট লিখিত পত্র

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে আরেকটি পত্রের উল্লেখ রয়েছে, যা তিনি স. পাঠিয়েছিলেন আম্মানের বাদশাহ্‌র কাছে। পত্রবাহক ছিলেন হজরত আমর ইবনুল আস। তবে চিঠিটি এ বৎসরই পাঠানো হয়েছিলো কি না, তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তথাপি এ স্থানের উপযোগী বলে তার বর্ণনা এখানে লিখে দেওয়া হলো। চিঠির সারাংশ ছিলো এরকম— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আবদুল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহ্‌র রসুল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে জায়ফার এবং আবদে জলন্দের পুত্রদ্বয়ের নামে। শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর, যে সত্যপথের অনুসরণ করে। অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো। শান্তিতে থাকতে পারবে। নিঃসন্দেহে আমি সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র রসুল। কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকবে, অর্থাৎ তার দেহের ভিতর

প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখিয়েই যাবো। আমি কিন্তু কাফেরদের উপর দলিল প্রতিষ্ঠা করেছি। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে আমি তোমাকেই সে দেশের শাসক নিযুক্ত করবো। তোমার রাজ্য তোমার কাছেই থাকবে। আর যদি অস্বীকার করো এবং ইসলাম গ্রহণ করা থেকে পরান্মুখ হও তাহলে তোমার কাছ থেকে তোমার রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমার ঘোড়া তোমার ময়দানসমূহে ঘোরাফেরা করবে। তোমার রাজ্যে আমার নবুওয়াত প্রবল হবে। চিঠিটি লিখেছিলেন হজরত উবাই ইবনে কাআব। চিঠিতে সীল মোহরও লাগিয়েছিলেন তিনিই।

আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেন, পত্রখানি নিয়ে আমি রওয়ানা দিলাম এবং যথারীতি আম্মানের নিকট পৌঁছে গেলাম। ভাবলাম, প্রথমে আবদের সাথে মিলিত হবো। কেননা জলন্দের দুইপুত্র জায়ফার ও আবদ স্বভাব চরিত্রে নরম প্রকৃতির লোক ছিলো। অতঃপর তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি রসুলের দূত। তোমাদের কাছেই প্রেরিত হয়েছি। তোমার ভাই সন বৎসর ও রাজত্বের দিক দিয়ে তোমার উপর অগ্রগামী। আমি তোমাকে তোমার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যেতে চাই, যাতে করে সে তোমাকে চিঠিটি পাঠ করে শোনাতে পারে। সে বললো, তুমি কিসের দিকে আহবান জানাচ্ছো? আমি বললাম, ওই আল্লাহ্‌র দিকে, যিনি একক অদ্বিতীয় ও যাঁর কোনো শরীক নেই। তোমরা তাঁর উপর ইমান আনো। তিনি ছাড়া যেগুলোর আনুগত্য-উপাসনা করে যাচ্ছো, সেগুলোকে ছেড়ে দাও। সাক্ষ্য প্রদান করো যে, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল। আবদ বললো, হে আমর! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের একজন নেতার পুত্র। বলো তো দেখি, তোমার পিতা কি করেছিলেন। তাহলে আমি তার অনুসরণ করবো। আমি বললাম, আমার পিতা মারা গিয়েছেন। তিনি মোহাম্মদের উপর ইমান আনেননি। আমার বিশ্বাস তিনি যদি মুসলমান হয়ে মারা যেতেন তাহলে ভালো হতো। অবশ্য তখন আমিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিনি। আমি আমার পিতার মতোই ছিলাম। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে হেদায়েত দান করলেন এবং আমি মুসলমান হলাম। তিনি বললেন, তুমি কবে মুসলমান হয়েছো? আমি বললাম, এই তো কিছু দিন হলো। তিনি বললেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, হাবশার বাদশাহ্‌ নাজ্জাশীর কাছে। আমি তাঁকে সংবাদ দিলাম, নাজ্জাশীও মুসলমান হয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, নাজ্জাশী মুসলামন হয়ে যাওয়ার পর তার জাতি গোষ্ঠী ও প্রজারা কি করেছে? আমি বললাম, তিনি ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং তার প্রজাগণ তাঁর অনুসরণ করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, নাসারাদের বিজ্ঞজনেরা এবং তাদের পাদ্রীরা কী করেছে? তারা কি তাঁকে মান্য করেছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, হে আমর! বুঝেশুনে কথা বলো। মিথ্যা বলার চেয়ে লাঞ্ছনা ও নিন্দনীয় কোনো কাজ আর নেই। আমি বললাম, আমি তো মিথ্যা বলছি না। আর মিথ্যা বলা তো আমাদের ধর্মে বৈধও নয়। তারপর তিনি বললেন, আমাকে বলো দেখি, মোহাম্মদ মানুষকে কিসের নির্দেশ

দেন। মানুষদেরকে বাধাই বা প্রদান করেন কী কী বিষয়ে। আমি বললাম, তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্য করতে বলেন। আর তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেন। রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখতে বলেন এবং যুলুম ও অত্যাচার করতে মানা করেন। বলেন, শরাব পান, মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ। আবদ বললো, কতোইনা ভালো শিক্ষা, আর কতোইনা উৎকৃষ্টতার দাওয়াত। আমার ভাই যদি আমাকে মানে এবং আমার অনুসরণ করে তাহলে আমরা উভয়েই রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হবো এবং তাঁর উপর ইমান আনবো। আমার ভাই তার রাজত্বের প্রতি লোভী। সে কবে যে তা ত্যাগ করবে? আমি বললাম, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে রসুলেপাক স. তার সম্প্রদায়ের উপর তাঁকেই শাসক হিসেবে রাখবেন। তিনি মানুষের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে অভাবী ও দরিদ্রদেরকে দান করবেন। সে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! এ নিয়ম তো খুবই উত্তম। যাকাত কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও দেখি। মোহাম্মদ কী ধরনের সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করেন? আমি যাকাতের বিধান সম্পর্কে তাঁকে বিস্তারিত অবহিত করলাম। উটের যাকাত সম্পর্কেও বর্ণনা দিলাম। সে বললো, হে আমর! ওই সকল উটেরও কি যাকাত দিতে হয়, যা আমরা গাছ ও ঘাস খাইয়ে প্রতিপালন করি? পানির পাড়ে নিয়ে যাই। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা এই হুকুমের অনুসরণ করবে বলে তো মনে হয় না। আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেন, তার পর আমি কয়েকদিন সেখানে অপেক্ষা করলাম। এর মধ্যে আবদ একদিন তাঁর ভাইয়ের কাছে গেলেন এবং আমার আগমন সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। একদিন তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডাকিয়ে নিলেন। আমি কাছে যেতেই তার বন্ধুরা আমার বাহু ধরে ফেললো। তিনি নিষেধ করলেন। বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। তারা আমাকে ছেড়ে দিলো। সামনে অগ্রসর হলাম, বসতে ইচ্ছা করেছিলো। কিন্তু তারা আমাকে বসতে বললো না। আমি একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনি বললেন, তোমার উদ্দেশ্য কী, বলো? আমি রসুলেপাক স. এর মোহরকৃত পত্রখানি তাঁকে দিলাম। তিনি পত্র পাঠ করলেন। তারপর পত্রটি তাঁর ভাইকে দিলেন। তার ভাইও তা পাঠ করলেন। তাঁর ভাইকে তাঁর চেয়েও কোমলমতির বলে মনে হলো। তিনি বললেন, বলো তো দেখি, কুরাইশদের শেষ পরিণতি কী হয়েছে? আমি বললাম, তারা সকলেই রসুলুল্লাহ্‌র আনুগত্য গ্রহণ করে নিয়েছে। তিনি বললেন, তারা কি আগ্রহ ও মনের খুশিতে দ্বীন গ্রহণ করেছে? নাকি তলোয়ারের কাছে পরাজিত হয়ে বাধ্য হয়ে এরকম করেছে? কোন লোকেরা তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেছে? আমি বললাম, মানুষ ইসলাম ধর্মের প্রতি আন্তরিকতা ও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কোনো রকম বলপ্রয়োগ ছাড়াই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা তাদের বিবেককে হেদায়েতের অনুকূল বানিয়ে নিয়েছে। কেননা পূর্বে তারা ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো। এখন আপনি ছাড়া আর কেউ বাকী আছে কি না তা আমি জানি না। আজ যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তাহলে এমনি এমনি আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। ইসলামের অশ্ববহর আপনাকে পদদলিত করে ফেলবে। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে

নিরাপদে থাকবেন এবং আপনাকেই আপনার কওমের শাসক নিযুক্ত করা হবে। তিনি বললেন, আজকের দিনের জন্য আমাকে অবকাশ দাও। কাল তুমি আমার কাছে এসো, যাতে আমি কোনো একটা জবাব দিতে পারি। এরপর আমি তার ভাইয়ের নিকট গেলাম। তিনি বললেন, হে আমর! আমি আশা পোষণ করছি, আমার ভাই নিরাপদে থাকবে, যদি সে তার রাজত্বের জন্য কার্পণ্য না করে। পর দিন আমি তাঁর কাছে যেতে চাইলাম। তিনি অস্বীকার করলেন এবং আমাকে প্রবেশ করার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হলো না। আমি তাঁর ভাইয়ের কাছে গেলাম এবং তাকে বৃত্তান্ত সবকিছু খুলে বললাম। আরও বললাম, আমাকে তাঁর কাছে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি বললেন, আমি তোমার দেওয়া দাওয়াতের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি। আমি আরবদের মধ্যে দুর্বলতম ব্যক্তি। আরবে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর মুকাবেলা করতে আমি যদি সক্ষম হতাম, তাহলে তো কোনো কথাই ছিলো না। আমি ভয় করছি, তার অশ্ববাহিনী যদি আমার এখান পর্যন্ত পৌছে যায়, তবে এমন এক যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যা ইতোপূর্বে কখনও ঘটেনি। আমি বললাম, আমি আগামীকাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তারা যখন আমার চলে যাওয়ার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হলো, তখন তারা দুই ভাই নির্জনে পরামর্শ করলেন। সকাল হলে এক ব্যক্তির মাধ্যমে আমাকে সেখানে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। ওয়ালহামদু লিল্লাহি আ'লা জালিক।

খাওলা বিনতে ছা'লাবার সাথে যেহারের ঘটনা

এ বৎসর খাওলা বিনতে ছা'লাবার সঙ্গে যেহার হয়েছিলো তাঁর স্বামী আউস ইবনে আখরাম আনসারীর। জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেন, খাওলা ছিলেন রূপসী, বুদ্ধিমতী এবং পুণ্যবতী। তাঁর স্বামী আউস ইবনে আখরাম ছিলেন একটু কম বুদ্ধিসম্পন্ন। শেষ বয়সে তিনি হয়ে গিয়েছিলেন দুর্বল, দরিদ্র, অন্ধ এবং বদমেজাজী। একদিন তিনি খাওলাকে এক সাথে শয়ন করার জন্য আহবান জানালেন। কিন্তু তিনি তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন না। তিনি রাগান্বিত হলেন। বলে ফেললেন, আনতি আ'লাইয়া কাযাহ্‌রি উম্মী (তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পীঠের মতো)। এ কথা বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ক্রোধাগ্নি যখন নিভে গেলো, তখন তিনি অনুতপ্ত হলেন খুব। উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করতে চাইলেন। খাওলা বললেন, মিলমিশ করার কোনো উপায় নেই। রসুল স.কে প্রকৃত অবস্থা জানাতে হবে। তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সবকিছু জানালেন। রসুলেপাক স. বললেন, যেহার তো জাহেলীযুগের তালাকের বিধান। এখন পর্যন্ত আমার কাছে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান অবতীর্ণ হয়নি। খাওলা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার অবস্থা খুবই কঠিন। আমি যদি আমার স্বামীর সন্তানদেরকে ছেড়ে চলে যাই তাহলে এরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি নিজের কাছে রাখি তাহলে না খেয়ে থাকবে। এই মুশকিল অবস্থা

একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালাই আসান করতে পারেন। বর্ণিত আছে, খাওলা তাঁর দুঃখের অবস্থা বর্ণনা করার পর উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রকোষ্ঠের এক কোণে গিয়ে সেজদায় পড়ে কাঁদতে লাগলেন। দোয়া করতে লাগলেন— 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আশকুরু ইলাইকা ওয়াহদাতী ওয়াহসাতী ওয়া ফিরাকা যাওজী ওয়া ওয়াজদী' (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অনুযোগ করছি আমার এক হয়ে যাওয়ার বিষয়ে, দুরবস্থায় নিপতিত হওয়া ও স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ও আমার অস্থিরতার বিষয়ে)।

খাওলা তখনও সেজদা থেকে মাথা তোলেননি। এমন সময় হজরত জিবরাইল এসে গেলেন। অবতীর্ণ হলো সুরা মুজাদালার প্রথম কয়েকটি আয়াত। যেহারের কাফফারার বিষয়ে সেখানে বিধান দেওয়া হলো এভাবে— 'ক্বাদ সামিআ'ল্লাহু ক্বাওলাল লাতী তুজ্বাদিলুকা ফী যাওজ্বিহা ওয়া তাশতাকী ইলাল্লাহি ওয়াল্লাহু ইয়াসমাউ' তাহাউরা কুমা' (আল্লাহ্‌ অবশ্যই শুনিয়াছেন সেই নারীর কথা, যে তাহার স্বামীর বিষয়ে তোমার সহিত বাদানুবাদ করিতেছে। আল্লাহ্‌ তোমাদের কথোপকথন শুনেন)(৫৮ঃ১)। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমি আল্লাহ্‌তায়ালার পরিপূর্ণ শ্রবণশক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। কেননা খাওলা তার স্বামীর বিষয়ে রসুলেপাক স. এর সংগে গোপনে কথাবার্তা বলেছিলো। অন্য কেউ তার কথা শুনতেই পায়নি। আমি ঘরে থাকা সত্ত্বেও সে আলোচানার কোনো কিছু শুনতে পাইনি। অথচ আল্লাহ্‌তায়ালা সঙ্গে সঙ্গে সে কথা শুনে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাযিল করে বলে দিলেন 'ক্বাদ সামিআ'ল্লাহু ক্বাওলাল লাতী তুজ্বাদিলুকা ফী যাওজ্বিহা' (আল্লাহ্‌ অবশ্যই শুনিয়াছেন সেই নারীর কথা, যে তাহার স্বামীর বিষয়ে তোমার সহিত বাদানুবাদ করিতেছে)। বলা হয়ে থাকে, এই ঘটনার পর মুসলমানদের কাছে হজরত খাওলার মান-মর্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়ে গেলো এই হিসেবে যে, নিশ্চয়ই খাওলা আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ নৈকট্যধন্যা। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব খাওলাকে দেখলেই মন্তব্য করতেন, 'ক্বাদ সামিআ'ল্লাহু বিহা' (আল্লাহ অবশ্যই শুনিয়াছেন সেই নারীর কথা)। একদিন তিনি কুরাইশ নেতাদের এক দলের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন, এমন সময় খাওলা সেখানে উপস্থিত হলেন। হজরত ওমর ফারুক সকাশে তিনি তাঁর কোনো একটি প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করলেন। যতক্ষণ খাওলা সেখানে ছিলেন, ততক্ষণ হজরত ওমরও দাঁড়িয়ে ছিলেন। অন্যান্যরাও দাঁড়িয়ে ছিলো। তারা বিস্মিত হয়েছিলো একথা ভেবে যে, এরকম একজন বৃদ্ধার জন্য এ সকল সম্মানিত লোকেরা সম্মান প্রদর্শন করছে কেনো? হজরত ওমর বললেন, ইনি তো সেই সৌভাগ্যবতী, যার অভিযোগ আল্লাহ্‌তায়ালা সপ্তম আকাশের উপর থেকে শুনেছেন।

যেহারের কাফ্‌ফারার বিধান যখন নাযিল হলো, তখন নবী করীম স. আউসকে ডেকে এনে বললেন, খাওলার সঙ্গে সহবাস করার পূর্বে তোমাকে একটি গোলাম আযাদ করতে হবে। তিনি বললেন, আমার সে রকম ক্ষমতা নেই। তিনি স. বললেন, তাহলে বিরতিহীনভাবে দু'মাস রোজা রাখতে হবে। আউস বললেন, তাও আমি করতে পারবো না। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার অবস্থা তো এরকম যে, একদিন যদি আমি দু'তিনবার আহার না করি, তাহলে আমার দু'চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। রসুলেপাক স. বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার কারাও। তিনি নিবেদন করলেন, এরকম করার মতো ক্ষমতাও আমার নেই। এমন সময় এক ব্যক্তি এক থলে খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলো। খেজুরের পরিমাণ ছিলো প্রায় পনের ছা এর কাছাকাছি। রসুলেপাক স. বললেন, খেজুরগুলো নিয়ে যাও এবং দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। তাহলেই তোমার যেহারের কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যাবে। আউস বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার চেয়ে বেশী দরিদ্র আর কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। আপনি যদি হুকুম দেন, তাহলে এগুলো আমার এবং আমার পরিজনের মধ্যে বণ্টন করে দেই। রসুলেপাক স. বললেন, ঠিক আছে, তবে তাই করো।

বিষয়টি নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কারও মতে কাফ্‌ফারা আদায়কারী যদি ফকীর হয, তাহলে এরকম করা জায়েয হবে। নিজেই সেই কাফ্‌ফারার মাল খরচ করতে পারবে। হাদিসের প্রকাশ্য দিকে লক্ষ্য করে এর বৈধতার দিকে মত পেশ করেছেন অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম। তবে আমাদের (হানাফী) মতে এরকম করা জায়েয নয়। কেননা, এক্ষেত্রে রসুলেপাক স. এর উদ্দেশ্য ছিলো এরকম— ঠিক আছে এখন তুমি তা ভোগ করো; কিন্তু পরবর্তীতে কাফ্‌ফারা আদায় করে দিয়ো।

উট ও ঘোড় দৌড়

হিজরী ষষ্ঠ বর্ষে উট ও ঘোড়ার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। রসুলেপাক স. একদিন বললেন, মুসলমানদের উচিত নিজেদের ঘোড়া ও উটসমূহকে দৌড়ানোর অভ্যাস করা। দৌড়প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। এতে করে বোঝা যাবে, কোন্ উট অথবা ঘোড়া অধিক ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। এগুলো হচ্ছে জেহাদের সরঞ্জাম। এ বিষয়ে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আর দৌড়ের প্রতিযোগিতায় কোনো শর্ত আরোপ করাও জায়েয হবে। যেমন একজন বললো, যদি অপরপক্ষ দৌড়ে জিততে পারে, তাহলে তাকে এ রকম মাল পুরস্কার দেওয়া হবে। তবে দু'পক্ষ থেকে এরকম ঘোষণা করা জায়েয হবে না। তাহলে তা জুয়া হিসেবে গণ্য হবে এবং তা হবে হারাম।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেন, রসুলেপাক স. এর একটি উটনী ছিলো, যার নাম ছিলো কাসওয়া। কোনো উটই প্রতিযোগিতায় তার চেয়ে অগ্রগামী হতে পারতো না। একবার এক বেদুঈন এলো। তার উটটি ছিলো খুব দুর্বল। তৎসত্ত্বেও দৌড়প্রতিযোগিতায় কাসওয়াকে হারিয়ে দিলো। মুসলমানগণ মনোক্ষুণ্ন হলেন। রসুলেপাক স. তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হকতায়ালার শান অবশ্যই সত্য। দুনিয়াবী জিনিসের মাধ্যমে যে উচ্চ মর্তবা লাভ করে, আল্লাহ্তায়ালা তাকে নীচু করে দেন। এহেন এরশাদের অনুকূলেই বোধ হয় তৈরী হয়েছে এই লোক বচনটি— হার কামালে রা যাওয়াল, ওয়া হার শরফে রা ওয়াবাল। কাবা ঘরের যে ইয্যত সম্মান তার স্থিতিতেই এ দুনিয়া স্থিতিলাভ করে আছে। তারও একদিন এমন অবস্থা হবে যে, কিয়ামতের সময় ঘনিয়ে এলে আল্লাহ্তায়ালা এক হাবশীকে নিযুক্ত করবেন। সে এই কাবা ঘরের এক একটি ইট খুলে নিয়ে যাবে। তারপর কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে—'কুল্লু শাই্ইন হালিকুন ইল্লা ওয়াজ্বহাহু' (আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।)

এ ধরনের দৌড়ে রসুলেপাক স. দূরত্ব নির্ধারণ করে দিতেন এভাবে, বলতেন, এ স্থান থেকে ওই স্থান পর্যন্ত দৌড়াতে হবে। মুযমার ও অমুযমার ঘোড়ার মধ্যে দৌড়ের দূরত্ব পৃথক রাখতেন। মুযমার অর্থাৎ দ্রুতগামী তেজী ঘোড়ার দৌড়ের জন্য স্থান নির্ধারণ করতেন হাসবা থেকে ছানিয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত। স্থান দু'টি মদীনার কাছাকাছি স্থানে এক মাইল দূরত্বে অবস্থিত। 'মুযমার' ওই সকল ঘোড়াকে বলা হয়, যেগুলোকে ঘাস পানি খাইয়ে বানানো হয় মোটা ও শক্তিশালী। তারপর আস্তে আস্তে সে ঘাস ও খাদ্য এ পরিমাণে কমিয়ে আনে যে, পেটে ক্ষুধা থেকে যায়। সেই ঘোড়াসমূহ এমতাবস্থায় ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয় এবং তাদের শরীরের উপর চাদর জড়িয়ে রাখা হয়, যাতে গরম পেয়ে তাদের শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। এভাবে ধীরে ধীরে তাদের শরীরের মাংশ শুকিয়ে আসে এবং ঘোড়াগুলো হয়ে যায় দ্রুতগামী। অনুশীলনটি করা হয় চল্লিশ দিন ধরে। আর 'যমীর' শব্দের আভিধানিক অর্থ শরীর হালকা পাতলা হওয়া। 'মুযমার' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে 'যমীর' থেকে। এর অর্থ ময়দান। এধরনের হালকা পাতলা ও দ্রুতগামী ঘোড়ার জন্য দূরত্ব বেশী নির্ধারণ করা হয়। আর 'অমুযমার' (মোটা ও ধীর গতিসম্পন্ন) ঘোড়াগুলোর জন্য দৌড়ের দূরত্ব নির্ধারণ করা হয় কম। হাদিস শরীফে এসেছে, 'লা সাবাকা ইল্লা ফী নাস্লীন আও খুফ্‌ফিন আও হাফির' অর্থাৎ তীরন্দাজী ঘোড়া ও উটের দৌড় ব্যতীত আর কোনো কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই। হাতী ও গাধা, উট ও ঘোড়ার বিধানেই পড়বে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেহাদে ঘোড়াই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার মানুষের দৌড় ও পাথর নিক্ষেপ করাকেও উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকার মাতা উম্মে রুমানের মৃত্যু

ষষ্ঠ হিজরীতে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার মাতা উম্মে রুমানের মৃত্যু হয়। তাঁর মূল নাম ছিলো যয়নব বিনতে আমের। তাঁর নসবনামা সম্পর্কে অনেক মতভেদ আছে। তবে ঐকমত্য হয়েছে একথার উপর যে, তাঁর নসব হচ্ছে বনী গনম ইবনে মালেক ইবনে কানানা। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ও হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে আবু বকর ছিলেন তাঁরই উদরজাত। আর মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরের মাতা ছিলেন আসমা বিনতে উমায়স শা'মিয়া। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সন্তান। তাঁর মাতার নাম ছিলো কুতায়বা। কেউ কেউ বলেছেন, কাতলা। হজরত আসমা বিনতে আবু বকরের মাতা ছিলেন শাকীফা। উম্মে রুমানের মৃত্যু হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর পৃথিবীর জীবদ্দশায়। তিনি স. তাঁর দাফন কার্যে উপস্থিত ছিলেন। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. তাঁর কবরে প্রবেশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, কেউ যদি বেহেশতের হুর দেখতে চায়, তাহলে সে যেনো উম্মে রুমানকে দেখে নেয়।

এ বৎসরের শেষের দিকে, এক মতানুসারে হিজরী সপ্তম বর্ষের প্রারম্ভে হজরত আবু হুরায়রা ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত বর্ণনা তাঁর জীবনালেখ্যে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলী এবং খয়বর যুদ্ধের বর্ণনা

খয়বর' একটি বড় শহরের নাম। সেখানে অনেক দুর্গ ও বহু শস্যভূমি ছিলো। স্থানটি মদীনা শরীফ থেকে আট বরীদ দূরত্বে শাম দেশের দিকে অবস্থিত। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। অভিধানগ্রন্থে আছে, খয়বর একটি বিখ্যাত দুর্গের নাম। জীবনীকারগণ বলেছেন, মদীনা (শহর) বলা হয় অনেক বাড়ি ঘরের সমষ্টিকে, যা গ্রামের চেয়ে অনেক বড় হয়। ঘর বাড়ি ও ইমারত বেশী থাকে সেখানে। তবে তা মেসর এর স্তরে পৌঁছে না। সর্বাধিক ছোটো হয় গ্রাম, আর সর্বাধিক বৃহৎ হয়ে থাকে মেসর। আর মদীনা হয় এই দু'এর মধ্যস্তরের। কেউ কেউ বলেছেন, মদীনা হচ্ছে মেসর ও বালাদের চেয়ে উন্নততর এবং মদীনাকে মেসরের সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করা হয়। আর খয়বর হলো দুর্গসমূহের সমষ্টির নাম। সে হিসেবে প্রত্যেকটি কেল্লা বা দুর্গ এক একটি করিয়া বা গ্রামের সমমর্যাদাসম্পন্ন। আর মদীনা হচ্ছে কেল্লাসমূহের সমষ্টির নাম। খয়বরে সর্বমোট আটটি কেল্লা ছিলো। সেগুলোর নাম ১. কিয়াসা ২. নায়েম ৩. সাআব ৪. শাক্ক ৫. গমুস ৬. বাতাত ৭. সাতীহ্ ও ৮. সালেম।

খয়বরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো সপ্তম হিজরীতে। ইবনে ইসহাক বলেন, রসুলুল্লাহ স. সপ্তম হিজরীর মহররম মাসের শেষের দিকে খয়বরে পৌছেন এবং দশ বা বারো দিন তা অবরোধ করে রাখেন। অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা খয়বরের বিজয় দান করেন। কেউ কেউ বলেছেন, ওই অভিযান সংঘটিত হয়েছিলো ষষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে। ইমাম মালেক থেকে এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে হাজারও এর উপর জোর দিয়েছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইবনে ইসহাক যা বলেছেন, তা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। দু'টি মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে তিনি বলেছেন, যিনি 'ষষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে' বলেছেন, তিনি হিজরী সনের প্রারম্ভ ধরেন রবিউল আউয়ালকে। সে হিসেবে মহররম মাস হয় বৎসরের শেষ মাস। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। ইবনে সাআদ ও ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি ১৮ই রমজান তারিখে রসুলুল্লাহর সাথে খয়বরের দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। সঠিক কথা হচ্ছে, ঘটনাটি ছিলো মক্কাবিজয়ের, যা সংঘটিত হয়েছিলো রমজানের শেষের দিকে। ভুলবশত সেখানে খয়বরের কথা এসেছে। যা হোক, রসুলেপাক স. এ অভিযানে একহাজর চারশ' সাহাবীকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে বলা হয়েছে এক হাজার একশ' ছিলেন পদব্রজী, আর দু'শ ছিলেন আরোহী।

এ যুদ্ধের কারণ ছিলো এরকম— হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আল্লাহ্তায়ালা সুরা ইন্না ফাতাহ্না নাযিল করেন। এর মাধ্যমে বিজয়ের সুসংবাদ জানালেন। নবী করীম স.কে বিজয় ও গনিমত দান করবেন বলে ওয়াদা করলেন। এমর্মে ঘোষণা দিলেন— ওয়াদাকুমুল্লাহু মাগ্যানিমা কাছীরাতান তা'খুযূনাহা ফাআ'জ্জালা লাকুম হাজিহি' (আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যাহার অধিকারী হইবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন)(৪৮ঃ২০)। রসুলেপাক স. উক্ত গনিমতের ওয়াদাকে খয়বর বিজয় হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন, যদিও তাঁর সম্মানিত স্বভাব ছিলো তওরিয়া করা এবং ইশারা ইঙ্গিতে কথা বলা। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সুস্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমরা বাহিনী প্রস্তত করো; কেননা আমরা খয়বরের যুদ্ধে যাচ্ছি। মদীনা মুনাওয়ারায় সেবা ইবনে উরফুতা গেফারীকে স্থলাভিষিক্ত করা হলো। রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিণী সাইয়্যেদা হজরত উম্মে সালামা। আক্রান্তদের সেবা করার ও বিভিন্ন খেদমতের জন্য বিশজন মুসলমান রমণীকেও সঙ্গে নিলেন। বাহিনীর অগ্রভাগে নিযুক্ত করলেন হজরত উকাশা ইবনে মেহসান আসাদীকে, ডান ভাগের নেতৃত্বে নিযুক্ত করলেন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে, বাম দিকের বাহিনী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীর দায়িত্ব দিলেন আরও কতিপয় সাহাবীকে।

মুসলিম বাহিনীর মধ্যে দু'শ অশ্বারোহী ছিলো। তিনটি ঘোড়া রসুলেপাক স. এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত ছিলো। উট ছিলো অনেক। রসুলেপাক স. হুকুম দিলেন, এ যুদ্ধে যেনো এমন কেউ অংশগ্রহণ না করে, যার দুনিয়ার সম্পদের জন্য রয়েছে সামান্যতম লোভ। এক বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল মুনাফিক রসুলেপাক স. এর সঙ্গী হওয়ার জন্য অনুমতি চেয়েছিলো। তিনি স. উত্তরে বলেছিলেন, এই মুনাফিক ইহুদীদের কাছে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে যে, মোহাম্মদ তোমাদেরকে উৎপাটিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। খবরদার তোমরা তোমাদের কিল্লাসমূহে প্রবেশ করবে না। কিল্লার বাইরে এসে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। কেননা তোমাদের কাছে রয়েছে সুপ্রতুল সমরসরঞ্জাম। আর তোমাদের পরিচারক-পরিচারিকার সংখ্যাও অনেক।

রসুলেপাক স. মুনাফিকদেরকে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে দেননি। কারণ আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে এ যুদ্ধে মুসলমানদেরকে অধিক গনিমত প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো। আর এর উপরই নির্ভর করবে সিরাতুল মুস্তাকীম লাভ। তাই আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং এই যুদ্ধকে মুনাফিকদের সংস্পর্শ থেকে পবিত্র রেখেছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা গনিমতের মালে খালেস মুসলমানদের সঙ্গে মুনাফিকদের শরীক হতে দেননি। আল্লাহ্তায়ালই প্রকৃত পরিজ্ঞাতা।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অথবা আংশিক হিসেবে বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের লেখার ধারা যেহেতু সংক্ষিপ্ত, কাজেই এর বড় বড় পূর্ণাঙ্গ ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে পেশ করবো। এতে করে লাভ যেমন অধিক হবে, তেমনি দলিলও হবে অকাট্য।

সহীহ্ বোখারী শরীফে সালামা ইবনে আকওয়া থেকে এই মর্মে হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বর্ণনা করেছেন, আমরা রসুলুল্লাহর সঙ্গে খয়বরের যুদ্ধের জন্য বের হলাম। পথ অতিক্রমকালে এক রাত্রে আমাদের একজন আমের ইবনে সেনান ইবনুল আকওয়াকে বললো, তুমি আমাদেরকে কিছু কবিতা শোনাচ্ছো না কেনো, যা তোমার জানা আছে? আমের ছিলেন কবি। উচ্চকণ্ঠের অধিকারী। উচ্চস্বরে কবিতা আবৃত্তিতে তিনি ছিলেন যথেষ্ট পারঙ্গম। আরবদের অভ্যাস ছিলো, পথ চলতে ক্লান্তি এলে অথবা চলতে অক্ষম হয়ে গেলে তারা কবিতা পাঠ করতো। তখন তাদের ক্লান্তি দূর হয়ে যেতো এবং তাদের উটগুলোও চলতে শুরু করতো নতুন উদ্যমে। আমের উট থেকে নামলেন। আমের ইবনে সেনান ইবনুল আকওয়া কবিতা পাঠ করতে শুরু করলেন, যার প্রথমাংশ এরকম— 'আল্লাহুম্মা লাও লা আংতা মাহ্তাদাইনা ওয়ালা তাসাদ্দাক্বনা ওয়ালা সল্লাইনা'। তিনি সুললিত কণ্ঠে ও মধুর সুরে পাঠ করতে লাগলেন। তাঁর সুন্দর আবৃত্তি শুনে সাহাবায়ে কেরামের সময় খুব ভালোভাবেই অতিবাহিত হচ্ছিলো এবং তাঁদের অন্তরে কোমলতা ও আবেগ এসে যাচ্ছিলো। তাঁদের উটগুলোও মাতাল হয়ে রাস্তা

অতিক্রম করতে লাগলো। রসুলেপাক স. বললেন, কে উটগুলোকে এভাবে পরিচালিত করছে এবং সুর করে ছন্দ গাইছে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমের ইবনে সেনান ইবনুল আকওয়া। রসুলেপাক স. বললেন, ইয়ারহামুহুল্লাহ। (আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন)। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. বললেন, গাফারা লাকা রব্বুকা (তোমার রব তোমাকে ক্ষমা করে দিন)। মুসলিম বাহিনী থেকে একজন নিবেদন করলেন, এক বর্ণনায় আছে, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তার জন্য তো শাহাদত ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তাকে আরও কিছু সময় আমাদের মধ্যে থাকতে দিলেন না কেনো? তাহলে তো আমরা তার থেকে উপকৃত হতে পারতাম এবং তিনিও কিছু হায়াত বেশী পেয়ে আমাদের সঙ্গে কাটাতে পারতেন। যেহেতু রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব ছিলো, তিনি যাকে এ ধরনের দোয়া করতেন তিনি শাহাদত বরণ করে ধন্য হতেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে একটু সীমাবদ্ধ করে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. এ যুদ্ধে যার জন্যই এরকম দোয়া করেছেন, অবশেষে তিনিই শাহাদত বরণ করেছেন।

'রওজাতুল আহবাব' ও 'মাআরেজুন নবুওয়াত' পুস্তকদ্বয়ে উল্লিখিত একটি হাদিসে কবিতার একটি ছন্দই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী ছন্দগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে পুরো কবিতাটিই উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এস্থানের চাহিদা অনুসারে আমরা পুরো কবিতাটিই এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। তাতে কিছু সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে।

কবিতা—

আল্লাহুম্মা লাও লা আংতা মাহ্তাদাইনা ✿ ওয়ালা তাসাদ্দাক্বনা ওয়ালা সল্লাইনা'
ফাগফির ফিদাআল্ লাকা মাত্তাক্বাইনা ✿ ওয়া ছাব্বিত আক্বদামা আল্ লাক্বীনা
ফাআনযালা সাকীনাতা আলাইনা ✿ ইন্না ইযা আসবাহা বিনা আতাইনা
ইন্নাল লাযীনা ক্বাদ বাগাও আলাইনা ✿ ইযা আরাদা ওয়া ফিতনাতা আবাইনা

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তোমার রহমত যদি না হতো, তাহলে আমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতাম না। আমরা কোনো দান-সদকাও করতাম না এবং নামাজও পড়তাম না। তোমার ফজল ও করমে আমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছি। নামাজ পড়া ও যাকাত দেওয়ার তওফীকও পেয়েছি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আমরা তোমার জন্য কোরবান হয়ে যাবো, যেনো আমাদের মধ্যে তাকওয়া পয়দা হয়। আর তুমি আমাদের শপথসমূহকে স্থির রেখে দিয়ো, যদি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার দ্বীনের দুশমনেরা আগমন করে। আমাদের উপর শান্তি ও রহমত নাযিল করে দিয়ো। আমরা যখন সকাল বেলায় উপনীত হবো এই অবস্থায় যে, আমাদের

উপর আক্রমণ শুরু হয়ে যায় ও দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে, তখন আমাদের উপর শান্তি নাযিল কোরো। নিশ্চয়ই যারা জুলুম করেছে ও আমাদের উপর ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, তারা যখন আমাদের উপর পরীক্ষা ও ফেতনার আকাংখা করে, তখন আমরা যেনো তা অস্বীকার করি এবং তাদের ফেতনায় যেনো পতিত না হই।

বর্ণিত আছে, সাহাবীগণ যখন শেষ পঙক্তিতে 'আবাইনা' শব্দটি উচ্চারণ করতেন, তখন তার মধ্যে জোর দিয়ে দু'দু'বার করে বলতেন। উল্লিখিত কাবিতাংশে 'ফেদাআন লাকা' বলা হয়েছে। শব্দটির ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। তাদের কারও কারও মতে 'ফেদাআন' শব্দটি আল্লাহ্তায়ালার শানে ব্যবহার করা বৈধ নয়। এরকম বলা জায়েয হবে যে 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্য কোরবান হবো'। কারণ 'ফেদা' শব্দটি এমন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যখন কোনো ব্যক্তির উপর কোনো শক্ত মুসিবত ও কষ্ট আসে আর অপর কোনো ব্যক্তি উক্ত দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবত তার নিজের উপর নিয়ে নেয় এবং আক্রান্তজনকে নাজাত দিতে চায়। 'ফিদইয়া' শব্দটিও এ মর্মেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা এধরনের অবস্থা থেকে বিলকুল পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার শানে 'ফেদাআন' ব্যবহার করা বৈধ নয়। এর জবাবে বলা যেতে পারে, এ শব্দটি এখানে প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হবে না। যেমন বলা হয়ে থাকে 'কাতালাহুল্লাহ্' (আল্লাহ্ তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন)। এ ধরনের বাক্য দোয়া বা বদদোয়ার ক্ষেত্রে 'কতল' অর্থ হবে না। অথবা যেমন বলা হয়ে থাকে 'তাববাত ইয়ামীনুকা' অথবা 'তাব্বাত ইয়াদাহু' এ ধরনের বাক্য সর্বসাধারণের মধ্যে প্রবচন হিসেবে প্রচলিত আছে। কিন্তু এগুলোর হাকীকী অর্থ গ্রহণ করা হয় না। এগুলো এক ধরনের মাজায বা রূপক বাক্য। কেননা উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি যার উপর উৎসর্গ হচ্ছে, সে তার সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে। সুতরাং এক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ এমন হতে পারে যে, আমার জীবন তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় কোরবান করে দিবো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, উক্ত বাক্যে রসুলুল্লাহ স.কে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে, হে রসুল! আপনার প্রতি সাহায্য সহযোগিতার বিষয়ে আমাদের যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তাতে আমাদেরকে ধর-পাকড় করবেন না। তখন বাক্যে ব্যবহৃত 'আল্লাহুম্মা' শব্দ দ্বারা আল্লাহ্কে আহবান বা সম্বোধন করা বুঝাবে না। বরং তখন 'আল্লাহুম্মা' বাক্যের শুরুতে বরকতের জন্য নেওয়া হয়েছে এরকম মনে করতে হবে। এবং 'লাও লা আন্তা' দ্বারা রসুলেপাক স.কে সম্বোধন করা বুঝাবে। কিন্তু তার পরে প্রশ্ন আসে, 'ফাআনযালা সাকীনাতা আলাইনা ওয়া ছাব্বিত আক্বদামা আল্ লাক্বীনা' এই পঙক্তিতে তো আল্লাহ্তায়ালার কাছে দোয়া করা হয়েছে। সুতরাং উপর্যুক্ত বাক্য আর এই পঙক্তি

তো পরস্পরবিরোধী হয়ে গেলো। একথার উত্তরে বলা যায়, রসুল স. উক্ত বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার কাছে যেনো দোয়া করেন, যাতে তিনি সাকীনা নাযিল করেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে সুদৃঢ় রাখেন।

বান্দা মিসকীন (মাদারেজুন নবুওয়াত গ্রন্থকার) বলেছেন, যদি দোয়াটি রসুল করীম স. এর পক্ষ থেকে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি হয় যিনি আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে উকীল ও দূত, সুতরাং তার বাস্তবায়ন ক্ষমতা তাঁর হাতেই এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের লাগামও তাঁর হাতেই ন্যাস্ত, যদিও প্রকৃত কর্তা আল্লাহ্তায়ালাই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ব্যাখ্যা অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে হতে পারে। এর জন্য কবিতার বক্তব্যের মধ্যে কোনোকিছু নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না।

'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে কোনো এক জীবনীগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, হজরত আমের যখন আবৃত্তি বন্ধ করতেন তখন তিনি স. আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে বলতেন, তুমি কি আমাদেরকে ছন্দ শোনাবে না? উটগুলোকে দ্রুতগতিতে পরিচালিত করবে না? তখন তিনিও ছন্দ বলা শুরু করে দিতেন। তিনি ওই ছন্দগুলোই বলতেন, যা হজরত আমের বলেছিলেন। তবে তার শেষে একটি পঙক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি স. তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকেও বলেছিলেন, 'রহিমাহুল্লাহ' তাই তিনি মুতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ্! কী আজীব দরবার! এ দরবারের খেদমতের পুরস্কার, ছওয়াব ও রহমত লাভ মানে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া। শহীদ হয়ে যাওয়া। প্রকৃতপক্ষে তৃপ্তি ও রহমত এটাই যে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি লাভ করা। আর এক্ষেত্রে নিজের জান কোরবানী করা ছাড়া আর কোনো উপায়ও যে নেই।

খয়বর যুদ্ধের সফরে প্রথমে হজরত আমের ও পরে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সুর করে ছন্দ গড়েছিলেন। এরকম করাকে বলা হয় হুদী। হুদী শ্রবণ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। রসুলেপাক স. নিজে হুদী শুনেছেন এবং পছন্দ করেছেন। জানা যায়, রসুলুল্লাহ স. এর একজন হুদী গায়ক ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো আনজাশা। তিনি সুললিত ও মধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। হুদী বলা হয় সুন্দর ও বৈধ সুরে নরম আওয়াজে কিছু গাওয়া। হুদী শুনলে সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি লাঘব হয়। মনে প্রেরণা আসে। উটগুলোও দ্রুতগতিতে রাস্তা অতিক্রম করে এবং ভারী বোঝা বহন করে নিয়ে যেতে পারে। আর এক প্রকারের সঙ্গীত আছে, যাকে রুকইয়ানী বলা হয়। সফরের শ্রান্তি কমানোর জন্য সওয়ারীর উপর বসে এরকম সঙ্গীত গাওয়া হয়। এটিও বৈধ। আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুক সফরে রুকইয়ানী অনেকবারই শুনেছেন। সঙ্গীতের আরেকটি প্রকার আছে, যার নাম নাশীদ। শের, কসীদা ও গজলকে সুন্দর সুরের মাধ্যমে অথবা উঁচু-নীচু আওয়াজে বিশেষ লয়-তাল-মাত্রায় সঙ্গীতের নিয়মকানুন মেনে সুর সহযোগে গাওয়া হয়। এ বিষয়ে অবশ্য দীর্ঘ আলোচনা আছে। ইবাদতের বর্ণনায় এসবকিছুর কিয়দাংশ আলোকপাত করা হয়েছে।

খয়বর যুদ্ধের ঘটনাবলী

খয়বরের বাসিন্দারা যখন রসুলেপাক স. এর দৃঢ় সংকল্পের কথা জানতে পারলো, তখন তারা কেনানা ইবনে আবুল হাকীককে তাদের মিত্রগোত্র গাতফানীদের কাছে সাহায্যের জন্য পাঠালো। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তারা খয়বরবাসীদের কথার কোনো গুরুত্ব দেয়নি। অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, গাতফানীদের মধ্য থেকে খয়বরবাসীদের সাহায্য করার জন্য চারহাজার যোদ্ধা প্রস্তুত হয়েছিলো। তারা রাস্তার প্রথম মঞ্জিলে থাকা অবস্থায়ই আসমানের দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলো— তোমরা যাদেরকে আপন আপন ঘর বাড়িতে রেখে এসেছো, তাদের উপর ধ্বংসলীলা নাযিল হয়েছে। তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে গেলো। তাছাড়া এরকম বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, তারা বের হওয়ার পর পিছন দিক থেকে কিসের যেনো নড়াচড়ার শব্দ পায়। তখন তারা মনে করতে থাকে, মুসলমানগণ বুঝি তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ছুটে আসছে। এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এটা ছিলো রসুলেপাক স. এর মোজেযা। এতদসত্ত্বেও জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেন, খয়বর যোদ্ধাদের সঙ্গে দশ হাজার আরোহী সৈন্য ছিলো। তারা সকলেই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছিলো।

জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেন, রসুলেপাক স. যখন খয়বরে প্রবেশ করে সেখানকার বস্তিগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং এই দোয়া পাঠ করলেন— 'আল্লাহুম্মা রব্বিস্ সামাওয়াতিস্ সাবই' ওয়ামা আয্লাল্না ওয়া রব্বিল আরদ্বীনাস্ সাবই' ওয়ামা আক্বলাল্না ওয়া রব্বিশ শাইয়াতীনা ওয়ামা আদ্বলাল্না ওয়া রব্বির রিইয়াহি ওয়ামা যীনা আসআলুকা খাইরা হাজিহিল ক্বার্ইয়াতি ওয়া খইরা মা ফীহা ওয়া আউজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা।' সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনও এই দোয়া পাঠ করলেন। তাই কোনো শহর বা লোকালয়ে পৌছলে সেখানে এই দোয়া পাঠ করা দোয়া মাছুরা হিসাবে গণ্য। দোয়া করার পর তিনি স. বললেন, 'উদখুলু আ'লা বারাকাতিল্লাহ' (তোমরা আল্লাহ্র বরকতের উপর প্রবেশ করো)। এরপর তিনি স. মানযিলা নামক স্থানে পৌছলেন এবং সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানকার একটি জায়গা নামাজের জন্য নির্ধারণ করলেন। সেখানেই তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করলেন এবং ফজরের নামাজ খুব সকাল সকাল আদায় করলেন। তারপর যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। কোথাও যাত্রা করলে খুব ভোরেই যাত্রা করা ছিলো তাঁর পবিত্র স্বভাব।

মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহ্তায়ালা সেই রাত্রিতে খয়বরবাসীদের উপর নিদ্রাকে প্রবল করে দিলেন। তারা প্রথম থেকেই রসুলেপাক স. এর আগমনের খবর পেয়েছিলো। কিন্তু আগমনের মুহূর্তে তারা কিছুই জানতে পারলো না। মোহাম্মদ খয়বরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন— একথা জানার পর থেকে তারা আপন আপন বস্তিগুলো পাহারা দিয়ে চলেছিলো এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু সেই রাতে তারা অলসতার দরুন ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ভোরে তাদের মোরগগুলোও ডেকে ওঠেনি। চতুষ্পদ প্রাণীগুলো একটুও নড়াচড়া করেনি। সূর্যোদয়ের পর তারা ঘুম থেকে উঠলো এবং আপন আপন বেলচী ও কোদাল হাতে নিয়ে ক্ষেতে-খামারের দিকে অগ্রসর হলো। হঠাৎ অদূরে মুসলিম বাহিনীকে দেখতে পেয়ে সকলেই পালাতে শুরু করলো। বলতে লাগলো, আল্লাহ্র কসম! মোহাম্মদ তো তার কাসীস (পঞ্চ বাহিনী) সহকারে এসে পড়েছেন। কাসীস বা পঞ্চ বাহিনী বলা হয় বিশাল সৈন্যবাহিনীকে যা পাঁচটি উপদলে বিভক্ত থাকে। পাঁচটি দল হলো ১. মুকাদ্দামা (অগ্রবর্তী দল) ২. মায়মানা (দক্ষিণ বাহিনী) ৩. মায়সারা (বাম বাহিনী)। এ দু'টোকে আবার একত্রে বলা হয় জানাহাইন (দুইবাহু) ৪. কলব (মধ্যবর্তী দল বা মূল বাহিনী) ও ৫. সাকা (তাড়ন বাহিনী)।

রসুলেপাক স. তাদের এ অবস্থা দেখে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহু আকবার খারিবাত খাইবারু ইন্না আনযালনা বিসাখাতি ক্বাওমিন ফাসাআ সাবাহুল মুনযারীন'। সহীহ্ বোখারী শরীফে আছে, রসুলেপাক স. যখন খয়বরের দিকে ধাবিত হলেন, তখন মুসলমানগণ উচ্চ আওয়াজে তকবীর দিতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। রসুলুল্লাহ স. বললেন, হে লোক সকল! নিজেদের প্রতি বিনম্র হও। তোমরা তো গায়ের (প্রভুকে) ডাকছো না। তোমরা যাকে ডাকছো, তিনি তো তোমাদের নিকটেই এবং তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন। এই হাদিসের বর্ণনাকারী আবু মুসা আশআরী বলেন, আমি রসুলেপাক স. এর সওয়ারীর পিছনে ছিলাম। আমি 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' পাঠ করছিলাম। তিনি স. বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়স! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ্। তিনি স. বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিবো, যা বেহেশতের ধন ভাণ্ডার হবে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পিতা মাতা আপনার নামে কোরবান হোক। আপনি অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, তা হচ্ছে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।'

বান্দা মিসকীন (মাদারেজুন নবুওয়াত গ্রন্থকার) বলেন, বর্ণিত বাক্যটির বেহেশতের ভাণ্ডার হওয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ অনেক আলোচনা করেছেন। আমার মনে আছে, শায়েখ ওলী মুকতাদানা আবদুল ওয়াহ্হাব হানাফী

ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করার পর বলেছিলেন, এ সকল কথাকে এভাবেই রেখে দাও। এর হাকীকী অর্থ কী, তা ইনশাআল্লাহ্ পরে জানা যাবে। মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, উক্ত কলেমা বার বার পাঠ করলে এবং তার উপর কায়েম থাকলে নেক আমল করার তৌফিক হয়।

এবার মূল আলোচনায় আসা যাক। মুসলিম বাহিনী দেখার পর খয়বরের যোদ্ধারা দুর্গমধ্যে আশ্রয় নিলো। তাদের অন্যতম নেতা সালাম ইবনে মাশকামের নিকট এ বিষয়ে সংবাদ পৌছানো হলো। সে তার অনুবর্তীদেরকে যুদ্ধ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলো। তাদের নেতা ও শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তিরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে উৎসাহিত হলো। তারা তাদের পরিবার-পরিজনকে কাবীসা দুর্গের অভ্যন্তরে রাখলো। লায়েস নামক দুর্গে জমা করলো পানীয় ও আহার সামগ্রী। সাহসী যোদ্ধারা বাতাত নামক দুর্গে একত্রিত হলো। সালাম ইবনে মাশকাম ছিলো তখন খুবই রোগাক্রান্ত। তা সত্ত্বেও সে দুর্গে এসে উপস্থিত হলো। অল্পক্ষণ পরেই মৃত্যু হলো তার।

রসুলে আকরম স. সাহাবীগণকে যুদ্ধের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করলেন। আখেরাতের কল্যাণ, উচ্চ মর্যাদা লাভের সুযোগ এবং সীমাহীন সওয়াব পাওয়ার বিষয়ে উৎসাহ দিলেন। আরও বললেন, বিজয় তোমাদেরই হবে, যদি তোমরা সমরপ্রান্তরে সুদৃঢ় থাকো। এরপর তিনি স. সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। যুদ্ধবিদ্যা ও তীরন্দাজীতে অভিজ্ঞ হজরত খাব্বাব আল মুনযিবের পরামর্শক্রমে রাজী নামক স্থানকে নির্ধারণ করা হলো সৈন্য সমাবেশের স্থান। বাতাত দুর্গ থেকে শত্রুরা আক্রমণ শুরু করলো। দুর্গের উপর থেকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। রাত হয়ে গেলো। মুসলমানগণ রাজী নামক স্থান থেকে শিবিরে ফিরে এলেন। পরের দিন হজরত ওছমান ইবনে আফ্ফানকে মনজিলের স্থলাভিষিক্ত করে তাঁকে তার দায়িত্ব অর্পণ করে রসুলেপাক স. দুর্গের পাদদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে চলে এলেন। প্রতিদিন এরকম চলতে লাগলো। এক পর্যায়ে বাতা দুর্গ মুসলমানদের দখলে এসে গেলো। এ কয়েকদিনে পঞ্চাশ জন মুসলিম যোদ্ধা আহত হলেন।

খয়বরের যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম ঘটনা হচ্ছে— যুদ্ধ চলাকালে আবহাওয়া খুব গরম ছিলো। মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার ভাই মাহমুদ ইবনে মাসলামা গরমের তীব্রতা এবং হাতিয়ার পাতির ওজনের কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ জায়গায় দুশমনদের কেউ নেই মনে করে তিনি নায়েম নামক কেল্লার ছায়ায় শুয়ে পড়েছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ওই সুযোগে এক কাপুরুষ কেনানা ইবনে আবুল হাকীক অথবা মতান্তরে এক ইহুদী দুর্গের উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করলো। মাহমুদ ইবনে মাসলামার মাথা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাহাদত বরণ করলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা— খাব্বাব আল মুনযির সাইয়্যেদে আলম স. এর নিকট আরজ করলেন, ইহুদীদের কাছে খেজুর গাছ তাদের সন্তানদের চেয়েও প্রিয়। যদি নির্দেশ দেন, তবে তাদের খেজুর বাগান কেটে সাফ করে দেই, যাতে তাদের মনোকষ্ট বৃদ্ধি পায়। এরপর কতিপয় সাহাবী একাজে লিপ্ত হয়ে গেলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের অন্তঃকরণ ছিলো খুবই কোমল। তিনি এ দৃশ্য দেখে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে খয়বর বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার অবশ্যই পূর্ণ হবে। তাহলে খেজুর বাগান কর্তন করে লাভ কী? এখন আপনি যদি হুকুম করেন, তবে বৃক্ষনিধন থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়। আশা করি এরকম করলে ভালোই হবে। রসুলেপাক স. বললেন, ঠিক আছে। ওদেরকে প্রতিহত করো। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, প্রায় চারশ' বৃক্ষ কেটে ফেলা হয়েছিলো। নাতাত কিল্লা ছাড়া আর অন্য কোথাও বৃক্ষকর্তনের ঘটনা ঘটেনি। ওই বৃক্ষ কর্তন এবং তা বন্ধ করা উভয়টিই সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদ ও রায় অনুসারে হয়েছিলো। যদিও রসুলেপাক স. এর রায় তাঁদের রায়ের অনুকূলে ছিলো। এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে কোনোরূপ বিরোধিতা এবং তিরস্কার আসেনি। বদরের কয়েদীদের মুক্তিপণের বিষয়েও এরূপ ঘটনা ঘটেছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

তৃতীয় ঘটনা— এক রাতে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব মুসলিম বাহিনীর পাহারার কাজে রত ছিলেন। রসুলেপাক স. প্রতি রাতেই মুসলিম বাহিনীর দেখাশোনা ও পাহারা দেওয়ার জন্য কোনো না কোনো সাহাবীকে নিযুক্ত করতেন। এমতাবস্থায় মুসলমানগণ এক ইহুদীকে বন্দী করে হজরত ওমরের নিকটে নিয়ে এলেন। তিনি ওই ইহুদীকে কতল করার জন্য হুকুম দিলেন। লোকটি বললো, আমাকে তোমাদের নবীর কাছে নিয়ে যাও। তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। হজরত ওমর তাকে রসুলেপাক স. এর কাছে পৌঁছে দিলেন। সে বললো, হে আবুল কাসেম! আমাকে নিরাপত্তা দিন। তাহলে আমি আপনার কাছে কিছু কথা বলবো, যা বাস্তব। রসুলেপাক স. তাঁকে নিরাপত্তা দিলেন। সে বললো, খয়বরবাসীরা মুসলিম বাহিনীর দৃঢ়তা ও শৌর্যবীর্য দেখে খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আজকের আক্রমণ দেখে তারা খুবই ভয় পেয়েছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আজ রাতে তারা শক নামক দুর্গে চলে যাবে। সমরাস্ত্রসমূহ, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য ধন সম্পদ তারা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে। আমি সে জায়গা সম্পর্কে জানি। কাল যখন দুর্গটি বিজিত হবে তখন আমি আপনার খাদেমদেরকে সেই জায়গা দেখিয়ে দিতে পারবো। রসুলেপাক স. বললেন, ইনশাআল্লাহু তায়ালা। ইহুদী বললো, আমার পরিবার পরিজন এই দুর্গে অবস্থান

করছে। তাদেরকেও ক্ষমা করে দিন। তিনি স. বললেন, ক্ষমা করে দিলাম। পরের দিন নাতাত নামক দুর্গটি দখলে এসে গেলো। ওই ইহুদী তার পরিবার পরিজনসহ মুসলমান হয়ে গেলো।

চতুর্থ ঘটনা— এক হাবশী গোলাম তার ইহুদী মনিবের বকরী রাতের বেলা পাহারা দিতো। রসুলেপাক স. তখনও দুর্গের দরজায় পৌঁছেননি। হাবশী গোলামটি দেখতে পেলো, ইহুদীরা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে। সে ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করলো, এ কী অবস্থা তোমাদের? ইহুদীরা বললো, আমরা ওই ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই, যে নবুওয়াতের দাবী করছে। একথা শোনামাত্র হাবশী গোলাম হুঁশিয়ার হয়ে গেলো। সে রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, হে মোহাম্মদ! আপনি কিসের দাওয়াত দেন? তিনি স. বললেন, ইসলামের। তুমি বলো 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'। সে বললো, আমি যদি একথা বলি তবে আমার কী হবে? তিনি স. বললেন, তোমার জান্নাত লাভ হবে, যদি এর উপর তুমি প্রতিষ্ঠিত থাকো। একথা শুনে গোলাম সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেলো। বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! এই বকরীগুলো আমানত স্বরূপ আমার কাছে আছে। আমি এগুলোকে তাদের মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে চাই। তিনি স. বললেন, এগুলোকে লশকরের বাইরে নিয়ে যাও। তারপর ওগুলোকে লক্ষ্য করে কয়েকটি ঢিল নিক্ষেপ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা তোমার পক্ষ থেকে আমানত আদায় করে দিবেন। গোলামটি এরকমই করলো। দেখা গেলো সকল বকরীই দৌড়ে মালিকের ঘরে গিয়ে পৌঁছলো। এটি ছিলো রসুলেপাক স. এর হস্তক্ষেপ এবং মোজেযা। সকল বকরী নির্দ্বিধায় স্বাভাবিকভাবে দৌড়ে দৌড়ে মালিকের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। এরপর সেই হাবশী অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলো এবং যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে শহীদ হয়ে গেলো। মুসলমানগণ তাকে সেখান থেকে বহন করে মুসলিম বাহিনীর তাঁবুতে আনলেন। সংবাদ পেয়ে রসুলেপাক স. সেখানে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'আমালান ক্বালীলাওঁ ওয়া আজরান কাছীরা'। (সে কাজ অল্প করেছে কিন্তু মজুরী পেয়েছে অধিক)। একথার অর্থ সে নামাজ পড়েনি, রোজা রাখেনি। অন্য কোনো ইবাদত বন্দেগীও করেনি। ইমান আনার পর সে কেবল একটি আমলই করেছে। আর তা হচ্ছে ইসলামের উপর জীবন বিসর্জন। তাই বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত যে, এটি কোন ধরনের আমল? এটি হচ্ছে ইমানের সমস্ত আমলের মূল আমল। কঠিনতম আমল। জেহাদের আমল। আল্লাহ্র রাস্তায় জীবনটি বিলিয়ে দেওয়ার পর আর কিই বা অবশিষ্ট থাকে? প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ। এক বর্ণনায়

পাওয়া যায়, ওই হাবশী গোলামের শহীদ হওয়ার পর রসুলেপাক স. স্বয়ং তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর এই হাবশী বান্দার উপর দয়া করেছেন এবং তিনি তাকে বেহেশতে পৌছে দিয়েছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি, দু'জন হুর তার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাশ থাকে যে, কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, ওমুক বান্দাকে নিয়ে গিয়েছেন, বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু বেহেশত এ সময়েও বিদ্যমান, কাজেই বেহেশতে প্রবেশ করানো অসম্ভব কিছু নয়। তবে প্রশ্ন হলো এখনই যদি বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাকে কি পুনরায় বেহেশত থেকে বের করে হাশরের ময়দানে নিয়ে আসা হবে? অথচ বেহেশতে প্রবেশ করানোর পর সেখান থেকে বের করে আনা বাস্তব নয়। হাদিস শরীফে নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করার ফযীলত সম্পর্কেও এরকম বর্ণনা এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, মউত ছাড়া আর কোনো কিছুই তার বেহেশতে প্রবেশের পথে অন্তরায় হতে পারে না। এ সকল হাদিসের ভাবার্থ এরকম হতে পারে যে, তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানোর প্রস্তুতি নেওয়া নয়। তবে প্রকাশ্য কথা এই যে, সবুজ পাখির পেটের ভিতর তাদের আত্মাসমূহ প্রবেশ করে। যেমন শহীদগণের ফযীলত নিয়ে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম ঘটনা— একদিন মুসলিম বাহিনী সাআব দুর্গ অবরোধ করলো। এক ইহুদী কিল্লার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমান প্রতিপক্ষকে আহবান জানালো। অগ্রসর হলেন আমের ইবনে সেনান আল আকওয়া, যাকে রসুলুল্লাহ্ স. হুদী গাওয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন। ইহুদী তাঁর উপর তলোয়ারের আঘাত করলো। আমের ঢাল দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করলেন এবং ইহুদীর তরবারী হস্তচ্যুত করে দিলেন। তারপর তিনি নিজের তরবারী দিয়ে ইহুদীর উপর আঘাত করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার সে আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নিজের বাহুতে এসে লাগলো। সেই আঘাতেই তিনি জান্নাতবাসী হয়ে গেলেন। সেদিন তাঁর মধ্যে রসুলেপাক স. এর দোয়ার প্রতিফলন ঘটেছিলো।

জীবনীলেখকগণ বলেন, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সালামা ইবনে আকওয়া ক্রন্দনরত অবস্থায় রসুলেপাক স. এর নিকটে গেলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, আমেরের আমল বাতিল হয়ে গিয়েছে। সে তার নিজের তরবারীর আঘাতেই প্রাণ দিতে চলেছে। এটা তো আত্মহত্যা। রসুলেপাক স. বললেন, তারা ভুল বলছে। নিঃসন্দেহে সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। তারপর তিনি স. তাঁর হাতের দুই আঙ্গুল একত্রিত করে বললেন, নিশ্চয়ই সে জেহাদ করেছে। অতঃপর জেহাদ করেছে।

ষষ্ঠ ঘটনা— সাআব দুর্গ অবরোধের কালে মুসলমানগণ খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেন। সৈন্যবাহিনীতে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিলো। রসুলেপাক স. আল্লাহুস্ সামাদের দরবারে কষ্ট ও দুরবস্থাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রূপান্তরিত করে দেওয়ার জন্য দোয়া করলেন। এরকমও বললেন, আল্লাহ্তায়ালা যেনো এমন কোনো দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত করে দেন, যাতে রয়েছে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী। দোয়া শেষে তিনি স. হজরত মুনযির ইবনুল খাব্বাবকে পতাকা দান করলেন। একান্তভাবে এক হামলা পরিচালনা করলেন। নিজেই সাআব দুর্গের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন। উপর্যুপরি হামলার ফলে দুর্গের কপাট উন্মুক্ত হয়ে গেলো। সেখান থেকে অগণিত ধন-সম্পদ ও খাদ্যসামগ্রী মুসলমানগণ বাইরে নিয়ে এলেন। তাছাড়া বহুল পরিমাণে শরাব সেখানে প্রবাহিত করে দেওয়া হয়েছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে হেমার নামের একজন মুসলমান কখনও কখনও শরাব পানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন। এই সুযোগ পেয়ে তিনি খয়বরবাসীদের শরাব থেকে কয়েক ঢোক পান করে নিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে নসীহত করলেন। সাহাবীগণ তাঁকে তিরস্কার করলেন। হজরত ওমরও তিরস্কারকারীদের মধ্যে ছিলেন। রসুলেপাক স. বললেন, ওমর! ওকে এভাবে অভিশাপ দিয়ো না। কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসে। এতে করে বুঝা যায়, আসল মহব্বত এবং গোনাহ কখনও কখনও এক সাথে হয়ে যেতে পারে। তবে হাঁ, পূর্ণ মহব্বত হলো তা-ই যা অনুসরণ ও অনুকরণের সাথে থাকে। কেননা 'ইন্নাল মাহিব্বা লামাঁই ইউহিব্বু মুত্বীউ' (কামেল মহব্বতকারী ওই ব্যক্তি, যে মাহবুবের অনুসরণ করে)। প্রত্যেক মুসলমানই আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের মহব্বতের সঙ্গে যুক্ত। তবে ইমান যেরকম কামেল ও নাকেস হয়ে থাকে, মহব্বতের অবস্থাও সেরকম।

সপ্তম ঘটনা— মুসলিম বাহিনী গমুস দুর্গটি অবরোধ করে রেখেছিলো। এমতাবস্থায় রসুলেপাক স. এর মাথাব্যথা শুরু হলো। সে করণে তিনি তীর নিক্ষেপ করার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছিলেন না। প্রত্যেকদিন কোনো না কোনো আনসার ও মুহাজিরকে তীর হস্তান্তর করে কাউকে পতাকা বহনের দায়িত্ব দিয়ে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়তেন। যেহেতু গমুস দুর্গটি অন্যান্য দুর্গের চেয়ে অধিক মজবুত ছিলো, তাই তা হস্তগত করা খুব সহজসাধ্য হলো না।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেন, একদিন হজরত ওমর পতাকা বহন করে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে দুর্গের কাছে গেলেন এবং সব ধরনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না। পরের দিন হজরত আবু বকর সিদ্দীক পতাকা বহন করে বীর ও সাহসী যোদ্ধাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তীব্রভাবে আক্রমণ চালালেন। কিন্তু সেদিনও উদ্দেশ্য সফল হলো না। তৃতীয় দিন পুনরায় হজরত ওমর সাহাবায়ে

কেরামের এক বিরাট দলকে সঙ্গে নিয়ে কঠিন অবরোধ সৃষ্টি করলেন এবং শক্ত আক্রমণ পরিচালনা করলেন। কিন্তু সেদিনও সফলকাম হলেন না। ব্যর্থ হয়ে সকলেই তাঁবুতে ফিরে এলেন।

খয়বরের পতন ও হজরত আলীর বীরত্ব

তকদীরে নির্ধারিত আল্লাহ্তায়ালার এরাদা এরকম ছিলো যে, খয়বর বিজয়ের মর্যাদা লাভ করবেন হজরত আলী। গমুস দুর্গটি খয়বরের অন্যান্য দুর্গের চেয়ে ছিলো অধিকতর দৃঢ়। সেজন্যই আল্লাহ্তায়ালা দুর্গটি দখল করালেন হজরত আলীকে দিয়ে। আর এই দুর্গটি দখলের মাধ্যমে অন্যান্য দুর্গ ও শহরসমূহ দখলের ভিত্তিপ্রস্তর সূচিত হলো। যদিও ইতিপূর্বে নাতাত, সাআব ইত্যাদি আরও কতিপয় কিল্লা দখল করা হয়েছিলো, তবুও খয়বরের চূড়ান্ত বিজয় নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন হজরত আলী।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, এক রাত্রে রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করবো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল যাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ্তায়ালা তার মাধ্যমে বিজয়দান করবেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি স. বললেন, এমন ব্যক্তিকে যে বারংবার আক্রমণকারী হবে এবং পলায়নকারী হবে না। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সে ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আক্রমণকারী হবে এবং সে কখনও পিছনে হটবে না। রসুলেপাক স. এর এমতো বাণী শুনে সাহাবায়ে কেরাম অপেক্ষা করতে লাগলেন। কে জানে কার ভাগ্যে রয়েছে এ অনন্য সৌভাগ্য। হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেন, আমি রসুলেপাক স. এর সামনে গিয়ে সালাম দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে গেলাম। আশা করতে লাগলাম, আমি যেনো এই দৌলত ও ফযীলতের উপযোগী হতে পারি। হজরত ওমর বলেছেন, আমি ওই দিনের নেতৃত্ব পাওয়ার আশা করা ছাড়া জীবনে আর কখনও নেতৃত্ব পাওয়া পছন্দ করিনি এবং নেতৃত্বের আকাঙ্খাও করিনি। এক বর্ণনায় আছে, কুরাইশদের একদল লোক একে অপরের সাথে বলাবলি করছিলো, এ বিষয়টি সাব্যস্তই হয়ে গিয়েছে বলে মনে করো যে, আলী ইবনে আবী তালেব এ কাজে কখনও সফলকাম হবে না। কেননা তার চোখ কঠিন কাজ সহ্য করতে পারে না। এখন সে নিজের পা-ও দেখতে পায় না।

বর্ণিত আছে, হজরত আলী রসুলেপাক স. এর কাছ থেকে এধরনের সুসংবাদ যখন শুনলেন, তখন তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পেলো। মনের মধ্যে প্রত্যয় সৃষ্টি হলো। তিনি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ লাভের আশায় দোয়া করলেন। বললেন, হে আল্লাহ! তুমি যা দান করবে, তা প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই। আর তুমি যা প্রতিহত

করবে, তা কেউ দান করতে পারবে না। হজরত আলী চোখের ব্যথার দরুন খয়বর অভিযানে যেতে পারেননি। বাধ্য হয়েছিলেন মদীনায় থেকে যেতে। তাঁর চোখে মারাত্মক অসুখ হয়েছিলো। তিনি তখন নিজে নিজে বলতেন, আমি রসুলুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জেহাদের কাজে অংশ গ্রহণ না করে ভালো করিনি। অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি সফরের প্রস্তুতি নিলেন। মদীনা থেকে একাই বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে থাকা অবস্থায় অথবা খয়বরে পৌছার পর রসুলেপাক স. তাঁর আগমন সম্পর্কে জানতে পারলেন। যখন সকাল হলো, তখন তিনি স. বললেন, আলী ইবনে আবী তালেব কোথায়? লোকেরা সকল দিক থেকেই বললো, তিনি তো এখানেই আছেন। কিন্তু তাঁর চোখে তখন এতো তীব্র ব্যথা হচ্ছিলো যে, তিনি তাঁর পা-ও দেখতে পাচ্ছিলেন না। রসুলেপাক স. বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। সালামা ইবনে আকওয়া গেলেন এবং তাঁর হাত ধরে রসুলেপাক স. এর সামনে আনলেন। রসুলেপাক স. তাঁর মাথা স্বীয় উরুদ্বয়ের উপর স্থাপন করলেন। তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন নিজের পবিত্র মুখের লালা। দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের যন্ত্রণা দূর হয়ে গেলো। তিনি পূর্ণ সুস্থতা অর্জন করলেন। এরপর থেকে জীবনে কখনো তিনি আর চোখ বা মাথাব্যথায় আক্রান্ত হননি। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. তাঁর জন্য তখন দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি এর থেকে গরম ও ঠাণ্ডা উভয় প্রকারের অসুখ দূর করে দাও। অধিকাংশ মানুষের এ দু'টি উপসর্গ থেকেই নানান রোগের সূত্রপাত হয়। বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে। আর সে সময় খয়বরের আবহাওয়া খুবই উত্তপ্ত ছিলো। কিন্তু রসুলেপাক স. ঠাণ্ডার রোগ থেকেও দূরে রাখার জন্য দোয়া করেছিলেন। ইবনে আবী লায়লা বলেছেন, হজরত আলী শক্ত গরমের সময় তুলার পোশাক ব্যবহার করতেন আর কঠিন শীতের মধ্যে চিকন ও পাতলা কাপড়ের পোশাক পরিধান করতেন। তাতে তাঁর কোনো অসুবিধা হতো না। হজরত আলী যখন ওই রোগ থেকে নিষ্কৃতি পেলেন, তখন রসুলেপাক স. তাঁর নিজের যুদ্ধবর্ম তাঁকে পরিয়ে দিলেন এবং যুলফিকার তরবারী তাঁর কোমরে বেঁধে দিয়ে বললেন, যাও এদিক সেদিক তাকাবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্তায়ালা তোমার হাতে দুর্গের পতন ঘটাবেন। হজরত আলী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি কোন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো? তিনি স. বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' এর সাক্ষ্য প্রদান না করবে। এই সাক্ষ্য প্রদান করলেই তারা আপন জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে। সত্যাসত্যের হিসাব রয়েছে কেবল আল্লাহ্তায়ালার নিকট।

এক বর্ণনায় আছে, হজরত আলী যখন আক্রমণের উদ্দেশ্যে পথে নামলেন, তখন রসুলেপাক স.কে বললেন, আমি ওই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবো, যতক্ষণ না তারা আমাদের ন্যায় হয়ে যাবে। অর্থাৎ মুসলমানী কায়দা কানুন পালন

না করবে। রসুলেপাক স. বললেন, তাড়াহুড়া কোরো না, যাও। যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছে সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ো। আল্লাহ্তায়ালার হকসমূহ যা তিনি তাঁর বান্দাদের উপর ওয়াজিব করেছেন, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ো। আল্লাহ্র কসম! তোমার উসিলায় যদি একজনকেও আল্লাহ্তায়ালা হেদায়েত দান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য হবে আল্লাহ্র রাস্তায় একহাজার লাল রঙের উট সদকা করার চেয়েও উত্তম। অর্থাৎ মানুষকে হেদায়েত করা আখেরাতে ছওয়াব প্রাপ্তিকে অপরিহার্য করে দেয়। এই মহান কাজ দুনিয়ার ওই সকল মালসম্পদের চেয়ে উত্তম, যা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা হয়। সত্যপথ প্রদর্শন করা সর্বোত্তম আমল। আর সদকা করা ফিদইয়া বা কাফফারা আদায় করার ন্যায় আমল। যেমন হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, জিকির করা আল্লাহ্র রাস্তায় স্বর্ণরৌপ্য খরচ করার চেয়ে উত্তম।

হজরত আলী পতাকা নিয়ে রওয়ানা হলেন। গমুস দুর্গের পাদদেশে থামলেন। পতাকাটি যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী একটি টিলার উপর স্থাপন করলেন। দুর্গের উপর দণ্ডায়মান এক ইহুদী ধর্মযাজক জিজ্ঞেস করলো, হে পতাকাধারী! তুমি কে? তোমার নাম কী? হজরত আলী বললেন, আমি আলী ইবনে আবী তালেব। একথা শুনে সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললো, তওরাত কিতাবের কসম! তোমরা এই ব্যক্তির নিকট পরাজিত হবে। এ লোক বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে না। লোকটি হয়তো হজরত আলীর বৈশিষ্ট্য ও বীরত্ব সম্পর্কে জানতো। কেননা তওরাত গ্রন্থে খয়বরবিজয়ীর বৈশিষ্ট্যের কথা লিপিবদ্ধ ছিলো। তাছাড়া রসুলেপাক স. এর সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলীর কথাও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে লেখা ছিলো। ওই সময় সর্বপ্রথম যে ইহুদী দুর্গের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলো, তার নাম ছিলো হারেছ। সে ছিলো মুরাহহাবের ভাই। তার সঙ্গে যে তীরসমূহ ছিলো তার ওজন ছিলো তিন মন। হারেছ ইহুদী বের হয়েই আক্রমণ শুরু করে দিলো এবং কয়েকজন মুসলমানকে শহীদ করলো। তারপর হজরত আলী তার মস্তক বরাবর পৌছে গেলেন এবং এক আঘাতে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। মুরাহহাব যখন জানতে পারলো, তার ভাই হারেছ নিহত হয়েছে, তখন সে খয়বরের বীর যোদ্ধাদের একটি দল নিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লো। মুরাহহাব ছিলো খয়বরের শ্রেষ্ঠ বীর। ছিলো দীর্ঘ বপুধারী এবং খ্যাতনামা যুদ্ধবাজ। খয়বরের বীরদের মধ্যে তার সমকক্ষ কেউ ছিলো না। সেদিন সে দু'টি বর্ম পরিধান করে, তরবারী ঝুলিয়ে দুটি নাগার পরিধান করে তার উপরে লৌহশিরোস্ত্রাণ বেঁধে এই ছন্দ গাইতে গাইতে ময়দানে অবতীর্ণ হলো—

'ক্বাদ আলিমাত খাইবারু আন্নী মারহাবু
শাকিস শালাহি বাতলুম মুরাহহাব'

অর্থঃ খয়বরবাসীরা জানে যে, আমি মুরাহহাব। অস্ত্রের শেকায়েতকারী, সাহসী ও যুদ্ধবাজ'।

কোনো মুসলমানের সাহস হচ্ছিলো না তার সামনে অগ্রসর হওয়ার। হজরত আলী সামনে অগ্রসর হলেন। অগ্রসর হওয়ার কালে তিনি এই কবিতা পাঠ করলেন— আনাল্লাজী সাম্মাতী উম্মী হাইদারা দ্বরগামু আজামিন ওয়া লাইছিন'(আমি ওই ব্যক্তি, যার মাতা তার নাম রেখেছেন হায়দার। আমি দারগাম, আজাম ও আক্রমণকারী লাইছ)। দারগাম, আজাম ও রাইছ তিনটি প্রতিশব্দ। এগুলোর অর্থ ব্যাঘ্র। যুদ্ধক্ষেত্রে রাজায (ছন্দ কবিতা) গাওয়া আরবের বীর পুরুষদের স্বভাব। আর এক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসা করা বৈধ। দুশমনদের মনে ভয়ভীতি সঞ্চার করা এবং নিজের বা নিজ গোত্রের শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য। মুরাহহাব হস্ত প্রসারিত করে চেয়েছিলো হজরত আলীর মস্তকে তরবারীর আঘাত হানতে। কিন্তু তার আগেই হজরত আলী ক্ষিপ্রগতিতে তাঁর জুলফিকারের আঘাত হানলেন এতো জোরে যে, মুরাহহাবের লৌহশিরোস্ত্রাণের জিঞ্জির কেটে তার গলা পর্যন্ত ঝুলে পড়লো। এক বর্ণনায় আছে, শিরোস্ত্রাণের শিকল পৌছেছিলো তার উরুদেশ পর্যন্ত। অন্য এক বর্ণনায় আছে, ঘোড়ার গদী পর্যন্ত। আর শিরোস্ত্রাণটি হয়ে গিয়েছিলো দু' টুকরো। তারপর মুসলমানগণ একযোগে সেনাপতি হজরত আলীকে সাহায্য করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। ইহুদীদের সাতজন বীরযোদ্ধা নিহত হলো। অবশিষ্টরা প্রাণরক্ষার্থে দুর্গাভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো। হজরত আলী তাদেরকে ধাওয়া করলেন। হঠাৎ এক ইহুদী ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের উপর আঘাত করলো। তাঁর ঢালটি হাত থেকে পড়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ আর এক ইহুদী ঢালখানা মাটি থেকে তুলে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো। হজরত আলী ক্ষিপ্ত হলেন। কুওয়াতে রব্বানী থেকে এমন রূহানী কুওয়াত তাঁর উপরে প্রবল হলো যে, তিনি খন্দক পাড়ি দিয়ে দুর্গের ফটক পর্যন্ত পৌছে গেলেন। লৌহনির্মিত ফটকের পাল্লা তুলে নিয়ে তাকে ঢাল বানিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেলেন।

সাইয়্যেদেনা ইমাম বাকের বলেছেন, হজরত আলী যখন খয়বরের ফটকের পাল্লা উঠানোর জন্য ঝাঁকি দিলেন, তখন সমগ্র দুর্গ কাঁপতে শুরু করলো। ঝাঁকুনীর চোটে সুফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব কাঁপতে কাঁপতে সিংহাসন থেকে পড়ে গেলেন। তাঁর চেহারা জখম হয়ে গেলো। সুফিয়া বিনতে হুয়াইয়ের ওই ঘটনার মধ্যে বিশেষ কোনো হেকমত নিশ্চয়ই ছিলো। পরে তিনি বন্দী হয়েছিলেন এবং সাইয়্যেদে আলম স. এর সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ওই কম্পনের উদ্দেশ্য ছিলো তাঁকে সচকিত করা এবং তাঁর অন্তর্জগতকে সবিশেষ সৌভাগ্য লাভের যোগ্য করে তোলা। এর বিশদ বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধ শেষে হজরত আলী ওই কপাটটি ছুঁড়ে মারলেন। কপাটটি গিয়ে পড়লো দু'ওয়াজাব দূরে। বলা হয়ে থাকে সাতজন শক্তিশালী লোক একত্রিত হয়ে ওই কপাটটিকে এক পার্শ্ব থেকে আরেক পার্শ্বে সরাতে পারেনি। পরে চল্লিশজন মিলে কপাটটিকে স্থানচ্যুত করতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিলো। 'রওজাতুল আহবাব', 'মাআরেজুন নবুওয়াত' ও বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে ঘটনাটির বিবরণ রয়েছে। 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ওই কপাটটির ওজন ছিলো আটশ' মন।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী যে কপাটটি উপড়িয়েছিলেন, তা সত্তর জন লোক আপ্রাণ চেষ্টা করেও এক বিন্দু নাড়াতে পারেনি। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে সাত ব্যক্তির কথা। হাকেম ও বায়হাকী লাইছ ইবনে আবী সুলায়ম থেকে, তিনি আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন থেকে, তিনি হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, আলী খয়বরের যে কপাটটি উঠিয়েছিলেন তা পরে চল্লিশ ব্যক্তিও সম্মিলিতভাবে উঠাতে সমর্থ হয়নি। বায়হাকীর এক বর্ণনায় আছে, হজরত আলী কিল্লায় পৌঁছে একটি দরজা উৎপাটন করে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। আমরা সেটিকে যথাস্থানে স্থাপন করতে চাইলাম। কিন্তু চল্লিশজন মিলেও পারলাম না। সহীহ্ বোখারী'তে হজরত আলীর খয়বরবিজয় সম্পর্কে হাদিস এসেছে। কিন্তু ফটকের কপাট উৎপাটনের বিষয়টির উল্লেখ সেখানে নেই। তবে ঘটনাটি প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে ঘটনাটির উল্লেখ আছে।

'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে একজন আলেম থেকে 'একটি অপ্রসিদ্ধ বর্ণনায় বলা হয়েছে, যখন চল্লিশজন লোক উক্ত কপাটটি উঠাতে ব্যর্থ হলো, তখন হজরত আলীর অন্তরে হর্ষভাবের উদয় হলো। হজরত জিবরাইল রসুলেপাক স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, আলীকে বলে দিন, তিনি যেনো পুনরায় কপাটটিকে যথাস্থানে স্থাপন করে দেন। রসুলুল্লাহ স. হজরত আলীকে নির্দেশ দিলেন। হজরত আলী এগিয়ে গেলেন। সর্বাত্মক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কপাটটিকে একটুও নড়াতে পারলেন না। হজরত জিবরাইল আর্বিভূত হয়ে বললেন, আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, এরকম হুকুম দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, আলী যেনো জানতে পারে, এটি তাঁর নিজস্ব কাজ ছিলো না। কাজটি করেছি আমি। একথা জানতে পেরে হজরত আলী বললেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো রূহানী শক্তিতে। শারীরিক শক্তিতে নয়। ছিলো কুদরত। স্বাভাবিক অবস্থা নয়। এটি হাকীকত। রূপক কোনো বিষয় নয়।

গমুস এবং খয়বর দুর্গের অধিবাসীরা যখন হজরত আলীর শক্তি ও সাহসিকতা পর্যবেক্ষণ করলো, তখন সকলেই 'আমান' 'আমান' (নিরাপত্তা, নিরাপত্তা') বলে চিৎকার শুরু করে দিলো। হজরত আলী রসুলেপাক স. এর

ইশারায় শর্ত সাপেক্ষে আমান দান করলেন। শর্তগুলো ছিলো— প্রত্যেক ব্যক্তি তার উটের উপর খাদ্যসামগ্রী ভরে শহর থেকে বেরিয়ে যাবে। নগদ অর্থ, মালপত্র ও অস্ত্রপাতি মুসলমানদের জন্য রেখে যেতে হবে। কোনোকিছুই লুকিয়ে রেখে যাওয়া যাবে না। গুপ্তস্থানে লুকানো সম্পদ পাওয়া গেলে তাদেরকে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের দায়ে শাস্তি দেওয়া হবে। খয়বরবিজয়ের সংবাদ যখন রসুলেপাক স. এর কাছে পৌছলো, তখন তিনি এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলেন। কারণ এটি ছিলো ইসলামের মহামর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। হজরত আলী কাফেরদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পাদন করলেন। রসুলে করীম স. এর দরবারে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনি স. তাঁকে স্বাগত জানাতে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন। কাছাকাছি হতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে চুম্বন করলেন এবং বললেন, 'বালাগানী তানাউকাল মাশকূরু ওয়াদ্বীআ'কাল মাজকূরু ক্বাদ রদ্বিইয়াল্লাহু আ'নহু ওয়া রদ্বীতু আনা আ'নকা' (আমার নিকট তোমার শানে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রশংসা এবং উল্লেখযোগ্য বাহাদুরীর কথা পৌঁছেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা তার (তোমার) প্রতি সন্তুষ্ট আমিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট)। হজরত আলী কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছো কেনো? আনন্দে না দুশ্চিন্তায়? তিনি বললেন, আনন্দে। কেনো আনন্দিত হবো না! আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি স. বললেন, আমিই একা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নই, আল্লাহ্, জিব্রাইল, মিকাইল এবং সমস্ত ফেরেশতারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, গমুস কিল্লার প্রশাসক ছিলো কেনানা ইবনে আবিল হাকীক। সেখানে পাওয়া গিয়েছিলো একশ' বর্ম, চারশ' তলোয়ার, একহাজার তীর, পাঁচশ' ধনুক এবং অনেক মাল-সরঞ্জাম।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, কেনানা ইবনে আবুল হাকীক, যে খয়বরের নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলো, তাকে রসুলেপাক স. এর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সে স্বর্ণ, অলংকারাদী, মোতির হার ও অন্যান্য মণিমুক্তা বকরীর চামড়ার ভিতর রাখতো। তার সম্পদ যখন বৃদ্ধি পেলো, তখন তা দুম্বার চামড়ার ভিতর ভরতো। তারপর আরও যখন বৃদ্ধি পেলো, তখন তা গরুর চামড়ার ভিতর ভরতো। তার মধ্যে যখন সংকুলান হচ্ছিলো না, তখন তা উটের চামড়ার ভিতর ভরে রাখতো। মক্কাবাসীরা বিয়ে-শাদী উপলক্ষে যখন পেরেশান হয়ে যেতো এবং এসবের প্রয়োজন পড়তো, তখন তারা দাদন রেখে তার কাছ থেকে অলংকারপাতি গ্রহণ করতো। রসুলেপাক স. কেনানাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবুল হাকীকের ধনভাণ্ডার কোথায়? সে বললো, হে আবুল কাসেম! সে মাল তো যুদ্ধের খরচ জোগাতে ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করা হয়েছে। এখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সে কসম করে কথাগুলো বললো। রসুলেপাক স. তাকে ধমক দিয়ে বললেন, এরপর যদি এর বিপরীত কিছু প্রকাশ পায়, তাহলে তোমার রক্ত বৈধ হয়ে যাবে

এবং তুমি আমান থেকে বেরিয়ে যাবে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক, হজরত ওমর ফারুক, হজরত আলী ও কতিপয় ইহুদীকে এ বিষয়ে সাক্ষী বানানো হলো। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিলো এই যে, যে সময় নাতাত কিল্লাটি বিজিত হয়, তখন সে ওই সকল সম্পদ কোনো এক বিজন প্রান্তরে মাটির নীচে পুঁতে রেখে আসে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবীকে এ বিষয়ের সংবাদ জানিয়ে দিলেন। রসুলেপাক স. কেনানাকে ডেকে এনে বললেন, আসমানী খবরের ভিত্তিতে তুমি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছো। রসুলেপাক স. হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়ামকে মুসলমানদের একটি জামাতের সাথে সেই জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা মাটি খনন করে সেখান থেকে সে সম্পদ বের করে আনলেন। যখন ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশিত হয়ে গেলো, তখন তাদের সাথে কৃত শর্তসমূহের ভিত্তিতে আমান দেওয়ার বিধানটিও উঠে গেলো। অতঃপর রসুলেপাক স. কেনানাকে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার কাছে হস্তান্তর করে দিলেন। সুযোগ দিলেন তিনি যেনো তাঁর আপন ভাই মাহমুদ ইবনে মাসলামার হত্যার বদলা নিতে পারেন। রসুলেপাক স. হজরত আলীকে গমুস কিল্লার দিকে প্রেরণকালে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে বলেছিলেন, তোমার জন্য একটি সুসংবাদ আছে। আগামীকাল তুমি তোমার ভাইয়ের হত্যাকারীকে হত্যা করবে।

অবশেষে খয়বরের ইহুদীদের প্রতি এহসান করা হয়। তাদেরকে হত্যা করা থেকে মাফ করে দেওয়া হয়। তাদের রমণীদেরকে বন্দী করা হয়। আর তাদের ধন-সম্পদ গনিমতে পরিণত হয়। নির্দেশ দেওয়া হয়, যত গনিমত এখান থেকে অর্জিত হয়েছে, সামানপত্র, খাদ্য-রসদ, অস্ত্রপাতি ও চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ সব কিছুই যেনো নাতাত কিল্লায় জমা করা হয়। এরপর এইমর্মে ঘোষণা দেওয়া হয়, একটি রশি বা সুইঁও যদি কেউ লুকিয়ে রাখে, তাহলে তা খেয়ানত হিসেবে গণ্য করা হবে, যা অপদস্থতা, লজ্জা ও দোজখের আগুনকে অপরিহার্য করে দিবে। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, এক হাবশী গোলাম ছিলো। রসুলেপাক স. এর সফরের আসবাবপত্র দেখাশোনা করার দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত ছিলো। তার নাম ছিলো কারকারা। খয়বরের যুদ্ধ চলাকালে তার মৃত্যু হলো। রসুলেপাক স. বললেন, সে তো জাহান্নামী হয়ে গিয়েছে। এরপর সাহাবায়ে কেরাম অনুসন্ধান করে তার কাছে একটি রেশমী চাদর পেলেন, যা বণ্টনের পূর্বেই সে হস্তগত করে নিয়েছিলো। তাছাড়া আরও একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। খয়বর যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তির মৃত্যু হলো। সাহাবায়ে কেরাম তার জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য রসুলেপাক স. এর নিকট আবেদন করলেন। তিনি স. বললেন, তোমাদের সঙ্গীর জানাযা তোমরাই পড়ে নাও। আমি পড়বো না। উপস্থিত সাহাবীগণের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি স. বললেন, তোমাদের এই সাথী গনিমতের মধ্যে খেয়ানত করেছে। অতঃপর তার মালপত্র অনুসন্ধান করে পাওয়া গেলো ইহুদীদের

কাছ থেকে পাওয়া কিছু মোহর। যার মূল্য দু'দিরহামের অধিক ছিলো না। তাছাড়া বোখারী ও মুসলিমের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর খেদমতে একটি গোলাম পাঠিয়েছিলো। তার নাম ছিলো মুদআম। সে মাথায় বোঝা উঠাচ্ছিলো। এমন সময় একটি তীর এসে তার গায়ে লাগলো। তীরটি কে নিক্ষেপ করলো তা জানা গেলো না। ওই আঘাতেই সে মারা গেলো। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, সে বেহেশতী। কেননা সে তো রসুলেপাক স. এর খেদমতগার হিসেবে শাহাদত বরণ করেছে। রসুলেপাক স. বললেন, কক্ষণও নয়। কসম ওই পবিত্র সত্তার, যার কুদরতী হাতে আমার জীবন সে খয়বর যুদ্ধের দিন বন্টনের পূর্বে গনিমতের মাল থেকে একটি চাদর নিয়েছিলো। এখন তার উপর প্রবল হয়েছে দোজখের আগুন। এ কথা শুনে একব্যক্তি একটি বালতি, একটি রশি, এবং আরেক ব্যক্তি একটি বালতি ও দু'টি রশি এনে হাজির করলো। তিনি স. বললেন, এই একটি দু'টি রশি জাহান্নামের আগুনের। এরকম সতর্কবাণীর কথা আরো রয়েছে। তবে ফেকাহ্ এর গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত হয়েছে, পানাহারের বস্তু বা ফল জাতীয় কোনো কিছু থেকে খেয়ে ফেললে তা জায়েয হবে। যদি গরু বা উট যবেহ করে খেয়ে ফেলে তবুও জায়েয হবে।

খয়বরের কিল্লাসমূহ দখল করার পর সমস্ত গনিমতের মাল একত্রিত করা হলো। পাঁচভাগে ভাগ করে এক ভাগ দেওয়া হলো পদাতিক যোদ্ধাকে। দু'ভাগ অশ্বারোহীদেরকে। বিষয়টি যেনো এরকম— যে যোদ্ধার ঘোড়া ছিলো তিনি পেলেন তিনভাগ। নাফে এই হাদিসের ব্যাখ্যা এরকমই করেছেন। ইমাম কসতলানী বলেছেন, ইমামশ্রেষ্ঠ আবু হানীফা বলেছেন, আরোহী যোদ্ধার জন্য দু'ভাগ— একভাগ তার নিজের জন্য, আর একভাগ তার ঘোড়ার জন্য। তবে নারী, যারা মুসলিম সেনাদের খেদমত করতেন, রোগী ও আঘাতপ্রাপ্তদের সেবা করতেন তাদের জন্য গনিমতের মালের সুনির্দিষ্ট কোনো অংশ ছিলো না। বরং গনিমতের মাল থেকে তাদেরকে কিছু দান হিসেবে দেওয়া হতো। তারপর বরকত লাভের উদ্দেশ্যে খয়বরের গনিমতের মালসমূহ বিক্রি করে দেওয়া হলো। রসুলেপাক স. তাতে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। ব্যবসায়ীরা ছুটে এলো এবং খুব আগ্রহের সাথে মাল খরিদ করলো। বিক্রয়কার্য সম্পন্ন হলো দু'দিন ধরে। অথচ ধারণা করা হয়েছিলো, বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এ মাল বিক্রি করে শেষ করা যাবে না। তার কারণ মালের পরিমাণ ছিলো অধিক। বর্ণিত আছে, ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা যখন প্রকাশ হয়ে গেলো, তখন রসুলেপাক স. তাদেরকে হত্যা না করে ক্ষমা করলেন। তাদেরকে খয়বরের ভূখণ্ড থেকে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। খয়বরবাসীরা আহাজারী প্রকাশ করতে লাগলো। বলতে লাগলো, মুসলমানগণ যেনো নিশ্চিন্ত থাকেন। আমরা তাঁদের দখলকৃত বাগ-বাগিচায়

কেবলমাত্র কাজ করে যাবো এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করে যাবো। আমাদিগকে পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে রেখে দেওয়া হোক। আমরা কেবল আপনাদের খেদমত করে যাবো। মুসলমানগণ এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন। রসুলেপাক স. তাদের প্রতি দয়া করলেন। তাদেরকে এ কাজে নিযুক্ত করে নির্ধারণ করে দিলেন যে, আবাদকৃত শস্য থেকে অর্ধেক বায়তুলমালে পৌঁছাতে হবে। আর অর্ধেক শস্য তাদের কাজের মজুরী হিসাবে তারা গ্রহণ করতে পারবে। এ ধরনের বর্গা ব্যবস্থাকে ফেকাহ্র পরিভাষায় মুখাবারা বলা হয়। খয়বরের বাসিন্দাদের থেকে এ ব্যবস্থা চালু হয়েছিলো বলে এর নামকরণ হয়েছে মুখাবারা। খুমুস অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ থেকে বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে কিছু অংশ দান করা হলো। হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত ওছমান ইবনে আফ্ফান ও হজরত যোবায়ের ইবনে মুতইম রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিবেদন করলেন, আমরা বনী হাশেমের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করি না এজন্য যে, আপনি এই বংশের লোক। কিন্তু আমাদের নৈকট্য ও বনী আবদুল মুত্তালিবের সাথে আপনার যে সম্পর্ক তা তো একই স্তরের। তাহলে এটি কেমন হলো যে, আপনি বনী মুত্তালিবকে অংশ দিলেন, আর আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন। তিনি স. বললেন, বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব পরস্পরে এরকম— বলে হাতের দু'আঙ্গুলকে একত্র করলেন। তারপর বললেন আমি এবং বনী মুত্তালিব— আমরা কখনও পৃথক হইনি— জাহেলী যুগেও না, ইসলামী যুগেও না। হজরত যোবায়ের বলেন, সুতরাং রসুলেপাক স. বনী আবদে শামস ও বনী নওফলকে কিছুই দিলেন না। আর একথা সুসাব্যস্ত যে, খয়বরের যুদ্ধে উপস্থিত থাকা ছাড়া অন্য কাউকে এর গনিমতের অংশ দেওয়া হয়নি। তবে দেওয়া হয়েছিলো কেবলমাত্র আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণকে। মুহাজিরগণ খয়বর বিজয়ের দিন সাগরের পাড় ধরে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন। যেমন হজরত জাফর ইবনে আবী তালেব এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়স। তাছাড়া তেপান্ন বা পঞ্চান্ন জন আশআরীও এসেছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন হজরত আবু মুসা আশআরী। সহীহ্ বোখারীতে হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রসুলেপাক স. এর বের হওয়া এবং মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সংবাদ পেয়েছিলাম। হজরত আবু মুসা আশআরী প্রাথমিক যুগে ইসলাম কবুলকারী ছিলেন। ইমান আনার সঙ্গে সঙ্গে আপন শহরে চলে গিয়েছিলেন। আর তিনি ফিরে এসেছিলেন এ সময়। তিনি বলেন, রসুলেপাক স. এর বের হওয়ার সংবাদ যখন আমি পেয়েছিলাম তখন আমি ছিলাম ইয়ামনে। অতঃপর আমি রসুলেপাক স. এর কাছে হিজরত করে চলে এলাম। আমার সঙ্গে আমার দুই ভাই ছিলেন। আমি তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। তাঁদের একজনের নাম আবু বুরদা আর অপর জনের নাম আবু রহম। তাঁরা আমার সম্প্রদায়ের একান্ন, বাহান্ন অথবা তেপ্পান্ন জন লোকসহকারে এসেছিলেন। ফেরার পথে আমরা

নৌকায় আরোহণ করলাম। ওই নৌকা আমাদেরকে নিয়ে গেলো আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে। ইতিপূর্বেই সাহাবায়ে কেরামের একটি দল সেখানে হিজরত করেছিলেন। তবে আবু মুসা আশআরীর সম্পর্কে একথা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না যে, তিনি আবিসিনিয়াব সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন, নাকি রসুলেপাক স. এর কাছে হিজরত করাই ছিলো তাঁর মূল উদ্দেশ্য। পরে ঘটনাচক্রে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের নৌকা আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলো। নৌকা আমাদেরকে নিয়ে গেলো আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে— এই বাক্যটি দ্বারা প্রকাশ পায় যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন। প্রথম সম্ভাবনাটিও সঠিক হওয়া সম্ভব। অবস্থা অবশ্য সেইরূপই বুঝায়। সাহাবীগণ যখন আবিসিনিয়ায় গেলেন, তখন তাঁদেরকে দেখে তাঁরাও তাঁদের সঙ্গে শামিল হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেও হিজরত করে থাকতে পারেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম। যাহোক, তিনি বলেন, আমরা তাদের সঙ্গে শামিল হয়ে গেলাম। সেখানে জাফর ইবনে আবী তালেবের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং তাঁদের সাথে আবিসিনিয়াতেই রয়ে গেলাম। এক সময় আমরা সেখান থেকে সহীহ্ সালামতেই চলে এলাম এবং রসুলে করীম স. এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো এমন সময়, যখন সদ্য খয়বর বিজয় সম্পন্ন হলো। যুদ্ধ চলাকালে আমাদের উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া কোনো কোনো সাহাবী, তাঁদের মধ্যে হজরত ওমর ফারুকও ছিলেন, তাঁরা বলছিলেন, তোমরা তো হিজরতে অংশ নিয়েছো। আর আমরা যুদ্ধ ও জেহাদে অংশগ্রহণ করেছি। অর্থাৎ তাঁরা জেহাদে অংশগ্রহণ করার সুবাদে নিজেদেরকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মনে করতেন।

জাফর ইবনে আবী তালেবের স্ত্রী হজরত আসমা বিনতে উমায়স একদিন উম্মুল মুমিনীন হজরত হাফসার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে এলেন। হজরত আসমা ছিলেন বুদ্ধিমতী ও রূপসী। তিনি তাঁর স্বামীর সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। পরে স্বামীর সঙ্গেই খয়বরে নবী করীম স. এর দরবারে হাজির হন। ঘটনাক্রমে হজরত ওমর ফারুক তখন হজরত হাফসার নিকট উপস্থিত হলেন। তখন হজরত আসমাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দেখে হজরত ওমর ফারুক জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে উপবিষ্ট মেয়েটি কে? হজরত হাফসা বললেন, আসমা বিনতে উমায়স। হজরত ওমর বললেন, এতো আবিসিনিয়াবাসিনী। একথার অর্থ— এই রমণী তো সাগরের পাড় ধরে আবিসিনিয়া থেকে এসেছে। হজরত হাফসা বললেন, হাঁ। হজরত ওমরের কথার জবাবে হজরত হাফসা শুধু হাঁ বলে যাচ্ছিলেন। তার মানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি কিছুই বলছিলেন না। কিন্তু হজরত আসমা ছিলেন বুদ্ধিমতি। তিনি বললেন আমরা পূর্ব থেকেই শুনে আসছি, ওমর ও আরও কতিপয় সাহাবী আমাদের প্রসঙ্গটি নিয়ে বহু কথাবার্তা বলে যাচ্ছেন। হজরত ওমর বললেন, আমরা হিজরতের দিক দিয়ে তোমাদের

চেয়ে অগ্রগামী। তার কারণ এই যে, আমরা তোমাদের তুলনায় রসুলুল্লাহ্ স. এর বেশী নিকটবর্তী। হজরত আসমা ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, কক্ষণও নয়, আল্লাহ্র শপথ! তোমরা রসুলুল্লাহ্ স. এর সঙ্গে থাকো এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে আহার করান। তোমাদের মধ্যে যারা মূর্খ, তাদেরকে নসীহত করেন। একথার অর্থ— তোমরা তো তাঁর সঙ্গে ছিলে কেবল পার্থিব সুখশান্তি ও পুরস্কারপ্রাপ্তির আশায়। আর আমরা? আমরা তো দূরদূরান্তে চলে গিয়েছি। দুশমনদের এলাকা আবিসিনিয়ায় অবস্থান করেছি। সেখানে এক নাজ্জাশী ছাড়া সকলেই তো কাফের ছিলো। আমরা কতো কঠিন অবস্থায়, মেহনত করে, দুঃখ কষ্ট স্বীকার করে সেখানে পড়ে রয়েছি। এসবকিছু তো করেছি আল্লাহ্র ওয়াস্তে। আল্লাহ্র কসম! আমি ওই সময় পর্যন্ত কোনো পানাহার স্পর্শ করবো না, যতক্ষণ না আমি বর্ণনা করবো ওই সকল কথা, যা তুমি বলেছো রসুল স. এর কাছে। আর আমি এও বলবো যে, এরা আমাদেরকে কষ্ট দেয়। ভয় প্রদর্শন করে। সুতরাং আমি তা বর্ণনা করবো এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবো। আল্লাহ্র কসম! আমি মিথ্যা বলবো না এবং আমার বক্তব্যের সঙ্গে কোনো ভুল কথাও মিশ্রিত করবো না। তোমাদের কাছ থেকে যা যা শুনেছি তার বেশী কিছুই বলবো না। এমন সময় সেখানে হাজির হলেন স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ স.। হজরত আসমা বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! ওমর তো এমন এমন সব কথা বলছেন। তিনি স. বললেন, তুমি ওমরের কাছে কী বলেছো? হজরত আসমা বললেন, আমি এমন এমন কথা বলেছি। তিনি সমস্ত কথাই উল্লেখ করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, তোমাদের উপর ওমর ও তার সাথীদের কোনো অগ্রাধিকার নেই। তারা একটি হিজরত করেছে মক্কা থেকে মদীনায়। আর হে নৌকা আরোহীরা! তোমরা তো দু'টি হিজরত করেছো। একটি হচ্ছে মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায়। অপরটি আবিসিনিয়া থেকে মদীনায়। হজরত আসমা বলেন, তারপর আমি দেখলাম, আবু মুসা ও অন্যান্য লোক, যারা নৌকাযোগে আমাদের সঙ্গে এসেছিলো, তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে প্রকৃত ঘটনা জানতে আমার কাছে আসছে। তাদের কাছে তখন দুনিয়ার কোনো কিছুই এই ঘটনার চেয়ে অধিকতর প্রিয় ছিলো না। রসুলেপাক স. যে তাদেরকে মূল্য দিয়েছেন, তাদের প্রশংসা করেছেন, তাদের বিশেষ মানমর্যাদার কথা বলেছেন, এটাই ছিলো তাদের নিকট সবচেয়ে সম্মানের বিষয়। হজরত আসমা বলেন, আমি আবু মুসাকে দেখেছি, তিনি বারংবার আমার কাছ থেকে এই হাদিসটি শোনার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করেছেন। কেননা এর মধ্যে রয়েছে এক ধরনের তৃপ্তি ও আত্মিক আস্বাদ। হজরত আবু মুসা আশআরী বলেছেন, আমরা রসুলেপাক স. এর কাছে খয়বরবিজয়ের পর হাজির হয়েছিলাম। তারপরও রসুলেপাক স. আমাদের মধ্যে গনিমতের মাল বণ্টন করেছিলেন। আমাদেরকে ছাড়া এমন কাউকে গনিমতের মাল দেননি যারা খয়বর

বিজয়ের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলো না। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে কোনো কোনো মাগাযীর কিতাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহকেও কিছু মাল দেওয়া হয়েছিলো, যদিও তিনি খয়বর যুদ্ধে হাজির ছিলেন না। তবে তাঁকে দেওয়া হয়েছিলো এ কারণে যে, তিনি হুদায়বিয়ায় হাজির ছিলেন। রসুলেপাক স. তো হাকিম মুখতার। যাঁকে ইচ্ছা তাঁকেই তিনি দান করতে পারেন। হজরত জাবেরকে হুদায়বিয়ায় হাজির থাকার কারণে খয়বরের গনিমত থেকে অংশ দেওয়া হয়েছিলো বলে যে কারণ দর্শানো হয়েছে, তা আসলে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা হুদায়বিয়ায় তো আরো অনেকে হাজির ছিলেন। তাহলে হজরত জাবেরকে বিশেষভাবে গনিমত দেওয়ার কারণ কী হতে পারে? এর উত্তর সম্ভবত তাই, যা ইতিপূর্বে বলা হলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম। খয়বর যুদ্ধে পনের জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। আর ইহুদী মারা গিয়েছিলো তিরানব্বই জন।

খয়বরবিজয়ের পরবর্তী ঘটনাবলী

খয়বর যুদ্ধের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনাবলী যতদূর সম্ভব বর্ণনা করা হয়েছে। এখন এ যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাবলী ও বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, রসুলেপাক স. এর সঙ্গে সাইয়্যেদা সাফিয়া রা. এর বিবাহ। সাইয়্যেদা সাফিয়া ছিলেন হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা, যার বর্ণনা পূর্বেই করা হয়েছে। এ যুদ্ধে হুয়াই ইবনে আখতাবের মৃত্যু হয়েছিলো। হজরত সাফিয়ার পূর্ব বিবাহ হয়েছিলো কেনানা ইবনে আবুল হাকীকের সঙ্গে। খয়বরের যুদ্ধে তারও মৃত্যু হয়েছিলো। আর হজরত সাফিয়া হয়েছিলেন বন্দী। তিনি ছিলেন নবপরিণীতা সতের বৎসর বয়স্কা। লোকেরা তাঁর রূপসৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করতো। রসুলেপাক স. তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করে নিয়েছিলেন। তিনি স. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাল থেকে কিছু কিছু নিজের জন্য পছন্দ করতেন। যেমন তলোয়ার, ঘোড়া ও পশু। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. ইহুদীদের শিশু ও নারী বন্দীদের বিষয়ে হুকুম দিলেন। হজরত সাফিয়াও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। বণ্টনের সময় তিনি হজরত দাহিয়াতুল কালবীর ভাগে পড়েন। মানুষ বলাবলি করতে লাগলো, সাফিয়া সুন্দরী ও সদ্‌বংশজাত ইহুদীদের নেতৃবর্গের একজনের কন্যা। নবী হারুনের বংশদ্ভুতা। তাঁকে রসুলুল্লাহর সঙ্গেই মানায়। সাহাবীগণের মধ্যে দাহিয়ার মতো অনেকেই আছেন, কিন্তু গনিমতের মধ্যে সাফিয়ার মতো কেউ নেই। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. তখন হজরত দাহিয়াতুল কালবীকে বললেন, তুমি অন্যান্য

বন্দিনীর মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে নিয়ে নাও। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, পরে হজরত দাহিয়ার ভাগে দেওয়া হয়েছিলো সাইয়্যেদা সাফিয়ার চাচাতো বোনকে। এক বিবরণে এসেছে, রসুলেপাক স. হজরত দাহিয়ার কাছ থেকে সাতজন বাঁদীর বিনিময়ে হজরত সাফিয়াকে ক্রয় করে নিয়েছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন রকম মন্তব্য শুরু হলো। হজরত সাফিয়াকে তিনি স. স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবেন, না তাঁকে বাঁদী হিসেবে ব্যবহার করবেন এই নিয়ে শুরু হলো জল্পনা-কল্পনা। কেউ কেউ বলেছেন, যদি রসুলেপাক স. সাফিয়া এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে পর্দা আরোপ না করেন, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি তাঁকে বাঁদী হিসেবে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, তিনি স. তাঁকে প্রথমে বাঁদী হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁকে মুক্তি দেন এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে নেন। তাঁর মুক্তিকেই তাঁর মহর নির্ধারণ করেন। রসুলেপাক স. যখন খয়বর থেকে ফেরার পথে সাহবা নামক স্থানে পৌছেন, তখন তিনি ঋতুবতী অবস্থা থেকে পবিত্র হন এবং বাসর যাপন করেন। হজরত সফিয়ার বিয়েতে ওলীমা হিসেবে হায়স তৈরী করা হয়। রসুলেপাক স. হজরত আনাসকে বলেন, যাকেই পাও, তাকেই সাফিয়ার বিয়ের ওলীমার দাওয়াতে ডেকে নিয়ে এসো।

জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে হজরত সাফিয়াকে উটের উপর নিজের পিছনে বসালেন এবং তাঁর গায়ের পবিত্র আবা দিয়ে পর্দা করে দিলেন, যা তিনি সফরের সময় উটের উপর বিছাতেন। তার উপর তিনি স. নিজের পবিত্র জানু স্থাপন করতেন। ওই সময় সাইয়্যেদা সাফিয়া রসুলেপাক স. এর জানুর উপর পা রেখে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর বিশেষ মর্যাদা ও অন্যান্য বিষয়ে 'আযওয়াজে মুতাহ্হারত' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্। বর্ণিত আছে, সাইয়্যেদা সাফিয়া খয়বর বিজয়ের পূর্বে স্বপ্নে দেখেছিলেন পূর্ণিমার চন্দ্র তাঁর কোলে এসেছে। স্বপ্নের কথা তিনি প্রথমে বলেছিলেন তাঁর পূর্বতন স্বামী কেনানার কাছে। কেনানা বলেছিলো, সম্ভবতঃ তুমি ওই রাজার স্ত্রী হওয়ার আকাংখা করেছো, যে এখন রয়েছে আমাদেরই এই ময়দানে। এ কথা বলেই সে সাফিয়ার গালে চপেটাঘাত করেছিলো। ফলে তাঁর দু'চোখ নীল হয়ে গিয়েছিলো। বাসর রাতে ওই দাগ দেখতে পেয়ে রসুলেপাক স. এ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করছিলেন। তখনই তিনি সবকথা খুলে বলেন।

আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবার সাথে বিবাহ

খয়বর যুদ্ধের পরবর্তী দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ইবনে উমাইয়ার কন্যা সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবার সঙ্গে রসুলেপাক স. এর বিবাহ বন্ধন। তাঁর মাতা সাফিয়া বিনতে আবুল আস ইবনে উমাইয়া হজরত ওছমান ইবনে

আফ্ফানের চাচী ছিলেন। সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা প্রথমে উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ, যিনি সাইয়্যেদা যয়নব বিনতে জাহাশের ভাই— তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি তাঁর স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরতও করেছিলেন। সেখান থেকে দ্বিতীয়বার হিজরত করলেন মদীনায়। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের উরস থেকে হাবীবা নামের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। আর সেই কন্যার নামানুসারেই তাঁর কুনিয়াতী নামকরণ হয় উম্মে হাবীবা। তাঁর আসল নাম ছিলো রামলা। কেউ কেউ বলেছেন, হিন্দা। তবে প্রথমোক্তটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। পরে তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ মুরতাদ হয়ে গেলো এবং সে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলো। হাবশাতেই তার মৃত্যু হয়। সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা ইসলাম ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত রইলেন। যখন হজরত আমর ইবনে উমাইয়া যুমায়রী রসুলেপাক স. এর দূত হয়ে হাবশায় গেলেন এবং উম্মে হাবীবার সঙ্গে দেখা করলেন, তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ যেনো তাকে 'হে উম্মে হাবীবা! হে উম্মুল মুমিনীন' বলে ডাকাডাকি করছে। তিনি ঘুম থেকে জাগলেন। নিজে নিজেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন। স্বগোতোক্তি করলেন, আমি রসুলূল্লাহ্র সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবো। আমর ইবনে উমাইয়া যুমাইরী নাজ্জাশীর কাছে রসুলেপাক স. এর চিঠি পৌছালেন। আরও একটি চিঠি দিলেন তাকে, যাতে লেখা ছিলো, হাবশায় হিজরতকারীদের সঙ্গে আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবা রয়েছেন। তাঁর কাছে যেনো রসুলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিবাহের পয়গাম পাঠানো হয় এবং তাঁকে যেনো মদীনায় প্রেরণের সুবন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য মুহাজিরদেরকেও যেনো তাঁর সাথে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নির্দেশানুসারে নাজ্জাশী উম্মে হাবীবার কাছে রসুলেপাক স. এর বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। তিনিও তা কবুল করলেন। নাজ্জশী সকল মুহাজিরকে দু'টি নৌকায় উঠিয়ে দিয়ে আমর ইবনে উমাইয়া যুমায়রীর সাথে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনাবলীতে ইতোপূর্বেই এ ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

বর্ণিত আছে, নাজ্জাশী তাঁর এক বাঁদী আবরাহাকে উম্মে হাবীবার কাছে বিবাহের উকিল নির্ধারণপূর্বক শুভবিবাহ সম্পন্ন করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। হজরত উম্মে হাবীবা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁর হাত-পায়ের ও আঙ্গুলের সকল অলংকারাদী খুলে আবরাহাকে দিয়ে দিলেন। বিয়েতে হজরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আসকে তাঁর নিজের পক্ষের উকিল নির্ধারণ করলেন। নাজ্জাশী বর্ণাঢ্য বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব এবং হাবশায় অবস্থানকারী সকল মুসলমানের জন্য পানাহারের আয়োজন করলেন। মোহর নির্ধারিত হলো চারশ' মেছকাল স্বর্ণ, অথবা চার হাজার দেরহাম। হজরত উম্মে হাবীবা মোহরানা গ্রহণ করলেন। ওই সম্পদ থেকে পঞ্চাশ মেছকাল স্বর্ণ দিলেন আবরাহাকে। বললেন, সে দিন তুমি যে সুসংবাদ

আমাকে দিয়েছিলে তার যথাযথ পুরস্কার তখন তোমাকে দিতে পারিনি। নাজ্জাশী ওই সকল অলংকার ও অর্থ আবরাহার মাধ্যমে ফেরত পাঠিয়ে বললেন, এগুলো আপনার অধিকারে থাকাই সমীচীন। কেননা আপনি আপনার স্বামীর কাছে যাচ্ছেন। এখন আমি আপনার কাছে একটি আবেদন পেশ করতে চাই। অনুগ্রহ করে বারেগাহে রেসালতে আমার সালাম পৌছে দিবেন। তাঁকে বলবেন, আমি তাঁর সাহাবীগণের দ্বীনের উপরই আছি। সর্বদাই আমি দরুদ ও সালাম পাঠাচ্ছি। নাজ্জাশীর স্ত্রীগণ হজরত উম্মে হাবীবাকে আতর-খুশবু উপহার দিলেন। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আকদ অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার সংবাদ যখন রসুলেপাক স. জানতে পারলেন তখন তিনি স. হজরত শারহীল ইবনে হাসানাকে পাঠালেন উম্মে হাবীবাকে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য। মদীনায় এলে রসুলেপাক স. তাঁর সঙ্গে বাসর যাপন করলেন। হজরত উম্মে হাবীবা যখন রসুলেপাক স. এর কাছে নাজ্জাশীর সালাম পেশ করলেন, তখন তিনি স. বললেন, 'ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু'। ওই সময় সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবার বয়স ছিলো তিরিশ বৎসরের কিছু বেশী। আর তাঁর ইনতিকাল হয়েছিলো হিজরতের চুয়াল্লিশ বৎসরে। তাঁর জীবনের অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাতে'র বর্ণনায় আসবে ইনশাআল্লাহ্।

জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আবু সুফিয়ান একবার মদীনায় এলেন। কন্যা উম্মে হাবীবার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তাঁর বিছানায় বসতে উদ্যত হলেন। হজরত উম্মে হাবীবা বাঁধা দিলেন। বললেন, এটা রসুলুল্লাহ্র পবিত্র বিছানা। আপনি এতে বসতে পারেন না। আপনি এখনও কুফুরী ও শিরিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব ও আশআরীগণের আগমন ওই সময়েই হয়েছিলো। বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. তখন হজরত জাফরকে দেখে মন্তব্য করলেন, আমি জানি না জাফরের আগমন আর খয়বর বিজয় এ দু'টি খুশির সংবাদের মধ্যে কোনটির জন্য আমি বেশী খুশি হয়েছি। অর্থাৎ উভয়টিই ছিলো তাঁর কাছে সমান খুশির কারণ। তারপর তিনি স. তাঁকে এবং আশআরীগণকে খয়বরের গনিমত থেকে অংশ দান করলেন। যদিও তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না।

রসুলুল্লাহ্ স.কে বিষ প্রয়োগ

খয়বরের ঘটনাবলীর মধ্যে এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহুদীরা রসুলেপাক স.কে বিষ খাইয়েছিলো। বিষপ্রয়োগকারিণী ছিলো যয়নব বিনতে হারেছ। সে ছিলো মুরাহ্হারের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং সালাম ইবনে মুশকানের স্ত্রী। সে

প্রথমে লোকদের কাছে জেনে নিয়েছিলো, মোহাম্মদ বকরীর রানের এবং বাজুর অংশ খেতে বেশী পছন্দ করেন। সে একটি বকরীর বাচ্চার গোশত রান্না করে তাতে এমন বিষ মিশালো, যা ভক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিষ ছিলো অত্যধিক পরিমাণে। রসুলেপাক স.কে দাওয়াত দিয়ে ডেকে এনে সে খেতে দিলো ওই বিষমিশ্রিত গোশত। রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলেন হজরত বিশর ইবনে বারা। তিনি স. উক্ত গোশতের একটি টুকরা উঠিয়ে নিয়ে টুকরাটির কিছু অংশ দাঁতদ্বারা কামড়ে নিলেন। হজরত বিশর ইবনে বারাকে দিলেন অপর অংশটি। মুহূর্তকাল পরেই তিনি স. বললেন, বিশর মুখ থেকে গোশত ফেলে দাও। এতে বিষ আছে। হজরত বিশর ইবনে বারা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! মুখে দিতেই আমি বুঝেছি। কেমন যেনো বিস্বাদ। আপনার আহারে অরুচি যদি হয়, এই ভেবে মুখ থেকে ফেলে দেইনি। আর কথা বলতে পারলেন না। উঠতেও পারলেন না। তাঁর শরীর নীল হয়ে গেলো। তিনি মুহূর্তেই ইনতিকাল করলেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে থাকেন। তারপর তাঁর ইনতিকাল হয়। রসুলেপাক স. হুকুম দিলেন, ইহুদীদের সকল সরদারকে এখানে উপস্থিত হতে হবে। যয়নব বিনতে হারেছকেও। সকলেই যখন হাযির হলো, তখন তিনি স. বললেন, তোমার কাছ থেকে একটি কথা জানতে চাই। তুমি কি সত্য বলবে? সে বললো, হাঁ, হে আবুল কাসেম! তিনি স. বললেন, তোমার পিতা কে? এর অর্থ এই যে, তোমার কবীলার পূর্বপুরুষের নাম কী এবং তুমি কার সন্তান? সে বললো, ওমুক আমার পিতা। তিনি স. বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তোমার পিতা তো ওমুক ব্যক্তি। সে বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন। রসুলেপাক স. এর এ ধরনের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিলো যে, সত্যবাদিতার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া এবং তার প্রকৃত অবস্থা জেনে নেয়া। বিষ মেশানোর বিষয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করায় তাকে বাধ্য করা। সহীহ্ বোখারীতে আরেকটি প্রশ্নের কথা এসেছে। যেমন— তখন তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, যদি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করা হয়, তাহলে কি তুমি সত্য কথা বলবে? সে বললো, হাঁ, হে আবুল কাসেম! আমি যদি মিথ্যা বলি, তাহলে তো ধরা পড়ে যাবো। যেমন আমার পূর্বপুরুষদের বিষয়ে মিথ্যাচার আপনার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, বলো জাহান্নামী কে? তার মানে স্থায়ীভাবে দোজখে থাকবে কে? উপস্থিত ইহুদীরা বললো, আমরা দোজখে অল্পদিন অবস্থান করবো। 'লান তামাস্সানান নারু ইল্লা আয়্যামাম মা'দূদা' (অল্প কয়েক দিন ব্যতীত দোযখের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না)। তারপর দোজখে আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে তোমরা এবং পরে সব সময়ই তোমরা দোজখে থাকবে। তারা সকল মুসলমানকে সম্বোধন করে একথা বললো। রসুলেপাক স. বললেন, 'ইখসাউ ফীহা' (দূর হয়ে যাও, জাহান্নামে চলে যাও) অর্থাৎ আমরা দোজখে কক্ষণও

তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। তারপর বললেন, আমি যদি তোমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন করি, তাহলে কি তোমরা সত্যতার আশ্রয় নিবে? তারা বললো, হাঁ। তিনি স. বললেন, তোমরা কি ওই বকরীটির গোশতে বিষ মিশিয়েছিলে? তারা বললো, হাঁ। আপনি কীভাবে এ তথ্য জানতে পারলেন? তিনি স. বললেন, আমাকে তো রানের গোশতের ওই টুকরাটিই বলে দিয়েছিলো, যা তখন ছিলো আমার হাতে। এবার বলো, বিষ মিশাতে তোমাদেরকে কে উৎসাহিত করেছিলো?

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. সেই মহিলাকে প্রশ্ন করলেন, এতে তোমার উদ্দেশ্য কী ছিলো? তখন ইহুদীরা অথবা সেই মহিলা বললো, পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম— আপনি সত্য নবী কিনা। মিথ্যা নবী হলে আমরা আপনার কাছ থেকে মুক্তি পাবো। শান্তিতে থাকতে পারবো। আর যদি সত্য নবী হন, তাহলে আমাদের বিষ প্রয়োগে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।

উলামায়ে কেরাম এ বিষয়টি নিয়ে মতভেদ করেছেন যে, রসুলেপাক স. ওই মহিলাকে শাস্তি দিয়েছিলেন কি না। নাকি কোনো কিছু না বলে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। বায়হাকী হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. ওই মহিলাকে কিছুই বলেননি। হজরত জাবের থেকে আবু নসরও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, ওই মহিলাকে হত্যা করা হয়। বায়হাকী বলেছেন, এমন হতে পারে যে, প্রথমে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো এবং রসুলেপাক স. হয়তো তাকে হত্যা করতে চাননি। কিন্তু হজরত বিশরের মৃত্যুর কথা ভেবে কেসাসের বিধানানুসারে তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে আছে, কোনো কোনো শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমামের মত হচ্ছে, কেউ যদি খাদ্যে বিষ মিশিয়ে কাউকে খেতে দেয় এবং তাতে সে যদি মারা যায় তাহলে এক্ষেত্রে কেসাস কায়েম করা ওয়াজিব। তবে হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এবং সমস্ত শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমামগণের নিকট এমতাবস্থায় কেসাস প্রয়োগ জায়েয নয়। কতলের বিবৃতিটি বিশুদ্ধ হলে অবশ্য কেসাসই ওয়াজিব হয়ে যায়। ফেকাহ শাস্ত্রবিধি একথাই বলে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

যুহরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, ওই মহিলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। তাই রসুলেপাক স. তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, যয়নব বিনতে হারেছ বলেছিলো, আপনি যদি মিথ্যা নবী হন, তাহলে আমি মানুষকে আপনার খপ্পর থেকে পরিত্রাণ দিতে পারবো। তবে এখন আমার কাছে এটা সুস্পষ্ট যে, আপনি সত্য নবী। আমি আপনাকে এবং উপস্থিত জনতাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনার দ্বীন গ্রহণ করলাম। সাক্ষ্য দিলাম 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'।

এই বিবরণটি ওই মহিলার ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়ে যুহরীর বিবরণের অনুরূপ। পরে যখন হজরত বিশরের ইনতিকাল হয়ে গেলো, তখন তাকে কতল করা হলো। কেননা তখন তার উপরে কেসাস ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিলো।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, যেহেতু ইসলাম পূর্ববর্তী সকল গোনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়; তা হককুল্লাহ্ হোক অথবা হককুন্নাস। তাহলে ইসলাম গ্রহণ করার পরও তার উপর কেসাস গ্রহণ করা হলো কেনো? সুতরাং 'তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন' বিবরণটি গ্রহণ করাই শ্রেয়।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বিষ মিশানো কিছু গোশত মুখে দিয়েছিলেন। তার ক্ষতি দূর করার জন্য তাঁর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন এবং সাহাবীগণের মধ্য থেকে যাঁরা তা মুখে দিয়ে চিবিয়েছিলেন এবং মুখ থেকে বের করে ফেলে দিয়েছিলেন তাঁদের সকলকে হুকুম দিয়েছিলেন যেনো তাঁরা মাথায় শিঙ্গা লাগিয়ে দূষিত রক্ত বের করে দেন।

বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর ওফাতের ব্যাধির কালে প্রায়শঃ বলতেন, হে আয়েশা ! আমি ওই গোশতের যন্ত্রণা সব সময়ই টের পাই, যা খয়বরে আমাকে খাওয়ানো হয়েছিলো। এখন ওই বিষ আমার আবহার রগকে কেটে দিচ্ছে। আবহার রগ হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে মিলিত থাকে। রগটি ছিঁড়ে গেলে মৃত্যু ঘটে। বিষের যে যন্ত্রণা তিনি স. সবসময়ই অনুভব করতেন, সেই যন্ত্রণাই মহাতিরোধানকালে তাঁর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

হজরত আলীর আসরের নামাজের জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে আনা

খয়বর যুদ্ধের ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম ঘটনা হচ্ছে হজরত আলীর আসরের নামাজ আদায়ের জন্য সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর তা আবার আসমানে ফিরিয়ে আনা। রসুলেপাক স. সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছার পর হজরত সাফিয়ার সাথে বাসর যাপন করলেন। ওই স্থানেই আসরের নামাজ আদায় করলেন। তারপর হজরত আলীর রানের উপর মাথা রাখলেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার আলামত পরিলক্ষিত হলো। হজরত আলী তখনও আসরের নামাজ আদায় করেননি। ওহী নাযিলের সময় এতো দীর্ঘায়িত হলো যে, সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলো। ওহী শেষে হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, আসরের নামাজ পড়েছো? তিনি বললেন, না। হে আল্লাহ্র রসুল! আমি এখনও আসরের নামাজ পড়িনি। তিনি স. আল্লাহ্পাকের কাছে বললেন, হে আমার প্রভুপালক! আলী যদি তোমার এবং তোমার রাসুলের আনুগত্য করে থাকে, তাহলে সূর্যকে হুকুম দাও, সে যেনো ফিরে আসে। আলী যেনো নামাজ আদায় করতে পারে।

সূর্য একেবারেই ডুবে গিয়েছিলো। পুনরায় উদিত হলো। সূর্যের আলো নিকটস্থ পাহাড় ও টিলাসমূহে পতিত হলো। এ অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করলো সকলেই। হজরত আলী অজু করলেন। তারপর নামাজ আদায় করলেন।

সূর্যকে আটক রাখার ঘটনা

সূর্যকে আটকিয়ে দেওয়া এবং তাকে ফিরিয়ে'আনার ঘটনা তিনবার সংঘটিত হয়েছিলো। প্রথম শবে মেরাজের পর রসুলেপাক স. যখন খবর দিলেন যে, এ রাত্রে মেরাজ থেকে ফেরার পথে রাস্তার মধ্যে তিনি স. কুরাইশদের একটি কাফেলাকে দেখেছেন। তিনি স. তার আলামতও বর্ণনা করলেন। বললেন, তাদের একটি উট পালিয়ে গিয়েছিলো এবং কাফেলার কিছু লোক মরিয়া হয়ে উটটিকে খুঁজতে বেরিয়েছিলো। একথা শুনে কুরাইশরা বললো, তাহলে বলো দেখি, কাফেলাটি কবে নাগাদ এখানে এসে পৌঁছতে পারবে? তিনি স. বললেন, বুধবার। বুধবার এলো। কুরাইশরা কাফেলার আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলো। দিন প্রায় শেষ হতে চললো। কিন্তু কাফেলা পৌঁছুল না। তিনি স. আল্লাহ্পাকের কাছে দোয়া করলেন। আর আল্লাহ্তায়ালা সেদিন সূর্যকে একঘণ্টা পরে অস্তমিত হতে দিলেন। কাফেলা যখন পৌঁছলো, তখন সূর্য অস্তমিত হলো। এই হাদিসটি ইউনুস ইবনে বকর ইবনে ইসহাকের 'মাগাযী' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

সূর্যকে আটকে রাখার আর একটি ঘটনা ঘটেছিলো খন্দকের যুদ্ধের সময়। ঘটনাটির বিবরণ ইতোপূর্বেও পেশ করা হয়েছে। তখন রসুলেপাক স. এর আসরের নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিলো। তিনি স. দোয়া করেছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনায় একথা এসেছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ বর্ণনাটি এরকম— রসুলেপাক স. সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আসরের নামাজ কাজা পড়েছিলেন।

বর্ণিত হাদিসগুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ উচ্চ-বাচ্য করে বলেছেন, এ সকল হাদিস ওই হাদিসের বিপরীত, যা বর্ণিত হয়েছে হজরত ইউশা ইবনে নুনের ব্যাপারে। ওই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, সূর্যকে আটক রাখার বিষয়টি ছিলো কেবল হজরত ইউশা ইবনে নুনের জন্য বিশিষ্ট। হজরত আবু হুরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, বোখারী ও মুসলিম, যা উদ্ধৃত হয়েছে মেশকাত শরীফে। তিনি বলেছেন, রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্য হতে একজন নবী জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। আর তিনি হচ্ছেন, ইউশা ইবনে নুন। তিনি যখন আসরের নামাজের সময় লোকালয়ের নিকটবর্তী হলেন, তখন সূর্য অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি। তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদিষ্ট। আমিও আদিষ্ট। তিনি প্রার্থনা জানালেন, 'হে আমার আল্লাহ্! সূর্যকে থেমে যেতে বলুন। সে আমাদের জন্য থেমে থাকুক।

এই থেমে যাওয়ার অর্থ ধরা হতে পারে তিনটি ১. সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পুনরায় আকাশে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা ২. আকাশে ফিরিয়ে আনা ব্যতিরেকেই সূর্যকে থামিয়ে রাখা ৩. তার গতিকে শ্লথ করে দেওয়া। সুতরাং যে ধরনটিই হোক না কেনো, সূর্যকে তখন থামিয়েই দেওয়া হয়েছিলো। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নবীকে ওই যুদ্ধে বিজয়ও দান করেছিলেন। যদিও এই বর্ণনায় এমন বলা হয়েনি যে, সূর্যকে প্রতিহত করার বিষয়টি কেবল নবী ইউশার জন্য খাস্। তবে অন্য এক বিবৃতিতে আছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, 'লাম ইউহ্‌বাসিশ্ শামসু আ'লা আহাদিন ইল্লা ইউশা' বিন নূন' (ইউশা বিন নুন ব্যতীত অন্য করো জন্য সূর্যকে আটকে রাখা হয়নি)।

'মাওযাহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে উল্লেখিত হয়েছে, হজরত ইউশা জুমার দিন জালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। সূর্য যখন অস্ত যাওয়ার উপক্রম হলো, তখন তিনি আশংকা করলেন যুদ্ধ জয়ের পূর্বেই যদি সূর্য ডুবে যায় তবে তো শনিবার এসে পড়বে। সে দিনতো যুদ্ধ করা আমাদের জন্য হালাল নয়। তখন তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা সূর্যকে ফিরিয়ে দিলেন। সেই সুবাদে হজরত ইউশা যুদ্ধ থেকে পৃথকও হতে পারলেন। কোনো কোনো আলেম বর্ণিত হাদিসসমূহ এবং ইউশা ইবনে নুনের হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করতে গিয়ে বলেছেন, সম্ভবত রসুলেপাক স. এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিলো এমন যে, পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে ইউশা ইবনে নুন ছাড়া আর কারও বেলায় সূর্যকে প্রতিহত করার ঘটনা ঘটেনি। অথবা সূর্যকে প্রতিহত করার ঘটনা আমাকে ছাড়া আর কারও বেলায়ই ঘটেনি। ব্যতিক্রম কেবল ইউশা ইবনে নুন। অবশ্য উভয় প্রকার সম্ভাব্য ব্যাখ্যার ফলাফল বা মূল অর্থ একই। আর একটি কথাও এখানে বলা যেতে পারে— তা হচ্ছে, রসুল স. ইউশা ইবনে নুন সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ছিলো তাঁর নিজের সূর্যকে প্রতিহত করার ঘটনার পূর্বের। ওয়াল্লাহু আ'লাম। সুতরাং জানা গেলো যে, সূর্যকে প্রতিহত করার বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের আলোচনা কেবল হজরত আলীর হাদিসের বিষয়েই নয়। বরং বর্ণিত তিনটি ঘটনা প্রসঙ্গেই রয়েছে তাঁদের এমতো আলোচনা-পর্যালোচনা।

এখন আসা যাক হজরত আলী রা. এর রদ্দে শাম এর আলোচনা প্রসঙ্গে। এ বিষয়ে আলেমগণ যা যা বলেছেন, কোনো রকম হেরফের না করে তা-ই এখানে উদ্ধৃত করা হলো। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। সঠিক বিষয়টি পৌঁছে দেওয়াই তো আমাদের দায়িত্ব। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে আছে হানাফী মতাবলম্বী বিশিষ্ট আলেম ইমাম তাহাভী যিনি মূলতঃ ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের কিন্তু পরবর্তীতে তিনি হানাফী মাযহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তিনি 'শরহে মিস্‌কাতুল আছার' পুস্তকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। কাযী আয়ায মালেকী হাদিসটির বর্ণনাকারী। ইমাম তাহাভী বলেছেন, আহমদ ইবনে সালেহ

মুহাদ্দিছগণের মধ্যে একজন নির্ভরযোগ্য বুযুর্গ আলেম ছিলেন। তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের শানে বলেছেন, কোনো আলেমের জন্যই সাইয়্যেদা আসমা বিনতে উমায়েরের হাদিস সংরক্ষণের বিষয়ে মতানৈক্য করা সমীচীন নয়। কেননা তাঁর বর্ণিত হাদিসের মধ্যে রয়েছে নবুওয়াতের নিদর্শনারাজি। কোনো কোনো আলেম বলেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়। ইবনে জাওযী তো হাদিসটিকে 'মওযু'ই মনে করেছেন। তাঁর মতে এই হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আহমদ ইবনে দাউদ মাতরুকুল হাদিস (যার হাদিস পরিত্যাজ্য) এবং মিথ্যাবাদী। দারাকুতনীও এরকম বলেছেন। ইবনে হেব্বানও তাই বলেছেন। আরো বলেছেন, তিনি হাদিস প্রস্তুতকারী। ইবনে জাওযী এও বলেছেন, ইবনে শাহীন এই হাদিস বর্ণনা করার পর বলে দিয়েছেন, হাদিসটি বাতিল। এই হাদিস প্রস্তুতকারীর অমনোযোগিতাও সুস্পষ্ট। কেননা তিনি এর ফযীলতের বাহ্যিক দিকটি দেখেছেন। কিন্তু এই হাদিস বর্ণনা করার মধ্যে যে কোনো ফায়দা নেই, সে বিষয়টি চিন্তা করেননি। আর তিনি এটাও জানেন না যে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসরের নামাজ কাজা হয়ে যায়। সূর্য পুনরায় ফিরে এলেও সে নামাজ আর আদায়কৃত নামাজ বলে গণ্য হবে না।

ইবনে তায়মিয়া রাফেযীদেরকে প্রত্যাখ্যান করণার্থে একটি স্বতন্ত্র বই লিখেছিলেন। সেই বইটিতে এই হাদিসটি উল্লেখ করে তার সূত্র ও বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে বলেছেন, এরা হাদিস প্রস্তুতকারী। আরও বলেছেন, বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, কাযী আয়ায হাদিস শাস্ত্রের একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ও উচ্চ মর্যাদাশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ে কেমন করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন এবং হাদিসটি বিশুদ্ধ কি না সে সম্পর্কে সন্দেহকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এ সম্পর্কে প্রমাণ সাপেক্ষ কোনো বর্ণনা দেননি। এই গ্রন্থের রচয়িতা শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দেছে দেহলভী বলেন, সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলেই আসরের নামাজ কাযা হয়ে যায় এবং সূর্যকে ফিরিয়ে আনলেও সে নামাজ আর আদায়কৃত নামাজ বলে গণ্য হবে না। এই মন্তব্য দু'টির বিষয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। কেননা কাযা তো হবে ওই অবস্থায়, যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে সে অবস্থার উপর স্থায়ী থাকবে এবং সময়টি পুরোপুরি গত হয়ে যাবে। কিন্তু বিগত সময় যদি ফিরে আসে, তবে নামাজ আদায় হবে না কেনো? ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করলেই তো সেই নামাজকে আদায়কৃত বলা হয়। যদিও সময়টি ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে হয়, তবুও। তাছাড়া কাযী আয়াযের শান ও উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়ার পর তাঁর মতকে গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধা করার সুযোগও তো থাকে না। তাই তাঁর মতটিকে বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত মনে করা অনুচিত। কেননা ইমাম তাহাভী ও আহমদ ইবনে সালেহের মতো বিদ্যানগণের কাছ থেকেও ওই বর্ণনার বিশুদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। ফল কথা যে, ইবনে জাওযী হাদিস সম্পর্কে 'মওযু' বলে মন্তব্য করার ব্যাপারে ছিলেন

ত্বরাপ্রবণ। তাই এই বিষয়ে তাঁর মন্তব্যটি নির্ভরযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী 'সুদ্দুকুল্লা বাবিন ইল্লা বাবা আলী' (মসজিদে নববীর সকল দরজা বন্ধ করে দাও, আলীর দরজা ব্যতীত) এই হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ইবনে জাওযী এই হাদিসকে মওযু সাব্যস্ত করেছেন এবং একে মওযু সাব্যস্ত করতে গিয়ে এর বিপরীতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন 'সুদ্দুকুল্লা খাওখাতিন ইল্লা খাওখাতা আবী বকর' (আবু বকরের দরজা ব্যতীত অন্য সকল দরজা বন্ধ করে দাও)। এই হাদিসের বিষয়ে আমি 'তারিখে মদীনা' গ্রন্থে আলোচনা করেছি। শায়েখ মোহাম্মদ সাখাভী 'মাকাসেদে হাসানা' পুস্তকে বলেছেন, ইমাম আহমদ বলেছেন, তাঁর এই হাদিসের মৌলিকতা নেই। ইবনে জাওযী তার অনুসরণ করতে গিয়ে তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। অথচ ইমাম তাহাভী ও কাযী আয়ায এ হাদিসকে সহীহ্ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে মিন্দা ও ইবনে শাহীন আসমা বিনতে উমায়সের হাদিস এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত আবু হুরায়রার এই হাদিস উদ্ধৃত করেছেন।

তাছাড়া 'মাওয়াহেবে' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তিবরানী এই হাদিস তাঁর 'মু'জামুল কবীর' পুস্তকে উত্তম সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন। যেমন হাদিসটি শায়েখুল ইসলাম ইবনে ইরাকী 'শরহে তাফসীর' পুস্তকে আসমা বিনতে উমায়স থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেছেন, নবী ইউশার হাদিস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় না যে, সূর্যকে প্রতিহত করা শুধুমাত্র তাঁর জন্যই খাস ছিলো। আর সে কারণে হজরত আলী সম্পর্কে সূর্যকে প্রতিহত করার বিষয়ে বর্ণিত হাদিসটি দুর্বল। এমন চিন্তা করার কোনো যুক্তিই নেই। বরং এই হাদিসটি যে সহীহ্, সে সম্পর্কে আহমদ ইবনে সালেহ মিসরী বর্ণনা করেছেন। তবে হাদিসটি সহীহ্ ও হাসান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়নি। অন্বেষণ করার পর জানা যায় যে, হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট এবং একক বর্ণিত। কেননা এটি বর্ণনা করেছেন, আহলে বায়তের একজন অখ্যাত মহিলা। যার বিস্তারিত পরিচয় অজ্ঞাত।

উপরে বলা হয়েছে, এই হাদিসটি সহীহ্ গ্রন্থসমূহে নেই এবং এটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট এবং একক বর্ণিত। একথাগুলোর মধ্যে চিন্তা-ভাবনার কিছু অবকাশ রয়েছে। হাদিসটিকে যখন ইমাম তাহাভী, আহমদ ইবনে আবু সালেহ, তিবরানী এবং কাযী আয়ায প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ সহীহ্ ও হাসান হওয়ার যোগ্য বলেছেন এবং তারা এটি তাঁদের কিতাবসমূহে বর্ণনাও করেছেন। সুতরাং সহীহ্ ও হাসান গ্রন্থসমূহে বর্ণনা করা হয়নি— এরকম বলা ঠিক নয়। সকল সহীহ্ ও হাসান গ্রন্থে উল্লেখ হওয়া অপরিহার্যও নয়। তাছাড়া 'আহলে বায়তের মধ্য থেকে একজন অখ্যাত অজ্ঞাত মহিলা' হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, এ জাতীয় কথা সাইয়্যেদা আসমা বিনতে উমায়সের ব্যাপারে বলা নিষিদ্ধ। কেননা তিনি একজন সুশ্রী, মর্যাদাসম্পন্না, বুদ্ধিমতী ও প্রজ্ঞাবতী রমণী ছিলেন। তাঁর অবস্থা সুখ্যাত। তিনি

হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর উদর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর জন্মগ্রহণ করেছেন। তারপর তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তার থেকে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি হজরত আলীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তার ঘর থেকে জন্মগ্রহণ করেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে আলী মুর্তজা।

কোনো কোনো লোক বলেন, হজরত আলী নামাজ না পড়ে রসুলেপাক স. এর খেদমতে রত ছিলেন। এরকম হওয়া সুদূর পরাহত। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, এরকম হওয়া সুদূর পরাহত নয়। এরকম ঘটনা ঘটা ও এরকম প্রয়োজন উপস্থিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, যা নামাজের কালে উপস্থিত হতে পারে। বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. হজরত আলীকে যোহরের নামাজের পর খয়বরের যুদ্ধসংক্রান্ত কোনো জরুরী কাজে পাঠিয়েছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর রসুলেপাক স. আসরের নামাজ আদায় করে নিয়েছিলেন। তাঁর ওই নামাজে হজরত আলী মুর্তজা শরীক হতে পারেননি (সেখান থেকে ফিরে আসার পর হজরত আলী রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিয়োজিত হয়েছিলেন)। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

লায়লাতুত্ তা'রীস এর ঘটনা

খয়বর যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে লাইলাতুত্ তা'রীস এর ঘটনা। তা'রীস বলা হয় শেষ রাত্রে মুসাফিরদের ঘুমানোর জন্য যাত্রা বিরতি করা এবং বাহন থেকে অবতরণ করাকে। হজরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, খয়বর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে এক রাতে রসুলেপাক স. এর খুব প্রবল নিদ্রা পেলো। তখন তিনি শেষ রাত্রে আরাম করা ও সামান্য ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্য পথিমধ্যে যাত্রা বিরতি করলেন। হজরত বেলালকে বললেন, আমরা ঘুমাবো। তুমি জেগে থাকবে এবং পাহারা দিবে। সকাল হয়ে যায় কিনা সেদিকে খেয়াল রাখবে। নামাজের সময় আমাদেরকে জাগিয়ে দিবে। ফজরের নামাজ যেনো কাযা না হয়ে যায়। তবে তিনি স. নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে নিয়ে ছিলেন। তারপর নিদ্রা এমন প্রবল হলো যে, নামাজ আদায় করার সুযোগ আর পেলেন না। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, দুর্বলতা, নিদ্রা অথবা অসুস্থতার কারণে রাত্রি জাগরণ সম্ভব না হলে তিনি রাতের বাদ পড়ে যাওয়া ইবাদতের কাযা করতেন এবং পরদিন সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বেই তার কাযা আদায় করে নিতেন। কিন্তু এখানে সংঘটিত হলো ফজরের নামাজ বাদ পড়ার ঘটনা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ রহস্য। দুর্বল উম্মতেরা যাতে সান্ত্বনা ও উপকার পেতে পারে, সেই জন্যই হয়তো আল্লাহ্তায়ালা এই ঘটনা ঘাটিয়েছেন। যাহোক, হজরত বেলাল জেগে থাকা ও পাহারা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত হলেন। তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে

গেলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে যতোটুকু তওফীক দিলেন, ততোটুকু নামাজ তিনি আদায় করলেন। রসুলেপাক স. এবং তাঁর সাহাবীগণ যাঁর মধ্যে হজরত আবু বকর সিদ্দীকও ছিলেন— সকলেই ঘুমিয়ে পড়লেন। বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীকও হজরত বেলালকে জোর দিয়ে বলেছিলেন, হে বেলাল! তোমার চক্ষুকে নিদ্রা থেকে হুঁশিয়ার রেখো। দায়িত্বটি ছিলো সুকঠিন। ভোরের সময় ঘনিয়ে এলো। হজরত বেলাল উটের পিঠের হাওদায় হেলান দিলেন। ফজর উদিত হওয়ার দিকে মনযোগ দিলেন। নিবিষ্ট মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। অথচ তিনি তখনও ছিলেন হেলান দেওয়া অবস্থায়ই। এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর পাগড়ি খুলে বগলদাবা করে নিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. এবং তাঁর কোনো সাহাবীই জাগ্রত হতে পারেননি। সূর্য উদিত হয়ে গেলো। সর্বপ্রথম জাগ্রত হলেন রসুলুল্লাহ স. স্বয়ং। পরপর জাগ্রত হলেন সাহাবীগণ। নামাজ ফওত হওয়ার কারণে রসুলেপাক স. আল্লাহ্‌তায়ালার গযবের ভয় করলেন। হজরত বেলালকে ডেকে বললেন, হে বেলাল! একি হলো? তুমি ঘুমিয়ে পড়লে কেনো? হজরত বেলাল নিবেদন করলেন, আমি কী বলবো! আমাকে তো ওই জিনিসই ঘিরে নিয়েছিলো, যা ঘিরে নিয়েছিলো আপনাকে। আপনি তো সদাজাগ্রত। তৎসত্ত্বেও এমন হলো। অপর এক হাদিসে আছে, রসুলেপাক স. হজরত আবু বকর সিদ্দীককে বললেন, বেলাল যখন নামাজে দাঁড়িয়েছিলো, তখন তার কাছে শয়তান এসেছিলো। শয়তান এসে বেলালের বক্ষের উপর হাত মেরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলো। শিশুদেরকে যেমন হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়। তারপর তিনি স. হজরত বেলালকে ডেকে তাঁর ঘুমিয়ে পড়ার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ওই রকমই বললেন, যেরকম রসুলেপাক স. হজরত আবু বকর সিদ্দীককে বলেছিলেন। তখন হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, আশহাদু আন্নাকা রসুলুল্লাহ্ ওয়াল হাক্কুক্কা। এ হচ্ছে ইমান সংস্কারের বিশ্বাস ও রেসালতের সাক্ষ্য প্রদানের মাকাম। যাতে কোনো প্রকারের শয়তানী ওয়াস্‌ওয়াসা প্রবেশ করতে না পারে। রসুলেপাক স. সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, উটগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে চলো। সাহাবায়ে কেরাম উটগুলো উপবিষ্ট অবস্থা থেকে ওঠালেন। হাঁকিয়ে দিলেন সামনের দিকে। এভাবে সেখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ কেনো দেওয়া হয়েছিলো, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, যেহেতু নিষিদ্ধ ও মাকরুহ ওয়াক্তে কাযা নামাজ পড়া জায়েয নয়, যেমন হানাফী মাযহাবের মত, সে জন্যই তিনি স. ওই স্থান থেকে যাত্রা করার হুকুম দিয়েছিলেন, যাতে সূর্য উপরে উঠে যায় এবং নিষিদ্ধ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কোনো কোনো বিদ্বান মনে করেন, মাকরুহ সময়ে নামাজ পড়ার নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য কেবল নফল নামাজের বেলায়। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ

বলেন, রসুলেপাক স. ওই উপত্যকা থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন একারণে যে, স্থানটি ছিলো শয়তানের প্রভাবযুক্ত। বিবরণটির মধ্যে এ কথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, অজু করা, আজান দেওয়া ও একামত বলা ও দাঁড়াতেই সে মাকরুহ ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যেতো এবং সূর্য উপরে উঠে যেতো। সেজন্য স্থান পরিত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

অন্যস্থানে চলে যাওয়ার পর রসুলেপাক স. অজু করলেন। হজরত বেলালকে আজান দিতে বললেন। তারপর একামতের সাথে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে আসরের নামাজ সম্পন্ন করলেন। এক হাদিসে পাওয়া যায়, কাযা নামাজের জন্য আজান দিতে হয় না। শাফেয়ী মাযহাবের একটি মতও এরকম। অপর মতটি হচ্ছে, কাযা নামাজের জন্য আজান ও একামত কোনটিই দিতে হবে না। 'হেদায়া' কিতাবে বলা হয়েছে, নবী করীম স. লায়লাতুত্ তা'রীস এর ফজরের নামাজ কাযা পড়েছিলেন আজান ও একামত সহযোগে। শায়েখ ইবনুল হেকাম এই মাসআলা প্রসঙ্গে অনেক সহীহ্ হাদিসও বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আজান হচ্ছে, ওয়াক্ত হওয়ার বিষয়ে মুসলমানদেরকে খবর দেওয়ার একটি শরীয়ত নির্দেশিত বিধান। সে স্থানে তো সকলেই উপস্থিত ছিলেন (সুতরাং আজানের প্রয়োজন পড়লো কেনো)। এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়— আজান শুধুমাত্র খবর দেওয়ার জন্যই নয়। বরং আজানের বাক্যসমূহ উচ্চারণের মাধ্যমে সওয়াব হাসিল করাও একটি উদ্দেশ্য। নামাজের পরিপূর্ণতাও এর উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। সুতরাং এক ব্যক্তি আজান ও একামত বলবে এটাই উত্তম। যেমন একবার রসুলেপাক স. ছাগলের এক রাখালকে আজান ও একামত দিয়ে নামাজ পড়তে দেখে বললেন, আলাল ফিতরাতি (সে স্বভাব ধর্মের উপরে আছে)। ইমাম শাফেয়ীর অপর মতটি বড়ই বিস্ময়কর। আর তাহলো— আজান দিতে হবে না। একামতও নিষ্প্রয়োজন।

নামাজ কাযা হয়ে যাওয়ার কারণে রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে পেরেশান দেখতে পেলেন। তখন তাঁদেরকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে বললেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্তায়ালা তো আমাদের রূহসমূহ কবয করে নিয়েছিলেন। তিনি যদি চাইতেন তবে আমাদেরকে অন্য সময়েও জাগ্রত করতে পারতেন (নামাজ আদায় করার ওয়াক্তেই আমাদেরকে জাগ্রত করতে পারতেন) তিনি স. আরও বললেন, তোমরা যদি কখনো নামাজের কথা ভুলে যাও, তবে যখন মনে পড়বে তখনই নামাজ আদায় করে নিয়ো। অন্য হাদিসে ঘুমিয়ে পড়ার কথাও উল্লেখ আছে। অপর এক হাদিসে এসেছে, নিদ্রা ভুলে যাওয়ার মধ্যেই গণ্য।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে এরকম— এক হাদিসে এসেছে, 'তানামু আইনাইয়া ওয়ালা ইয়ানামু ক্বালবী' (আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার কলব নিদ্রা যায় না)। একথার অর্থ— আমার জাগ্রত থাকা ও নিদ্রা যাওয়ার মধ্যে ব্যবধান কেবল চক্ষু মুদিত হওয়া। কিন্তু আমার হৃদয় সদা

সচেতন। তিনি আবার অন্যত্র বলেছেন, আমি নিদ্রিতাবস্থায়ও তোমাদের কথা শুনতে পাই। তাই তাঁর নিদ্রা তাঁর অজু ভঙ্গ করে না। নিদ্রা গেলেও পূর্বের অজু বিদ্যমান থাকে। আলেমগণ এটাকে তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সকল নবীর অবস্থা এরকমই ছিলো। নবীগণের স্বপ্নও ওহী। আর ওহী ধারণ করতে পারে কেবল সদাজাগ্রত কলব। এখন প্রশ্ন হলো— অন্তর যদি সদা জাগ্রতই থাকে, তাহলে রসুলেপাক স. নামাজের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার কথা জানতে পারলেন না কেনো?

এই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্বানগণ বলেন, সুবেহ সাদেক হওয়া, সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়া অনুভব করা চোখের কাজ। চক্ষু বন্ধ থাকলে সূর্য উদয়াস্তের বিষয়ে জানা যায় না। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি এমন একটি ঘরে জাগ্রত অবস্থায় বসে থাকে যেখানে স্তরে স্তরে পর্দা লাগানো আছে। এমতাবস্থায় সূর্য উদয় বা অস্ত যাওয়ার বিষয়ে সে জানতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে অন্তর জাগ্রত থাকাই যথেষ্ট নয়। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়— ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে তিনি স. তা জানতে পারলেন না কেনো? যেমন কোনো একজন অভিজ্ঞ জ্যোর্তিবিদ স্তরে স্তরে পর্দায় আচ্ছাদিত ঘরে বসে থাকলেও তিনি ঘড়ির মাধ্যমে অথবা তার জ্যোর্তিবিদ্যার মাধ্যমে একথা জেনে নিতে পারেন যে, সুবেহ সাদেক হয়ে গিয়েছে। এর উত্তরে বলতে হয়, তখন হেকমতে এলাহীর সিদ্ধান্তই ছিলো এরকম। বিষয়টি রসুল স. এর কাছে অস্পষ্ট থাকুক এবং এ বিষয়ে কোনো ওহী নাজিল না হোক এটাই ছিলো তখন আল্লাহপাকের অভিপ্রায়। উম্মতের পরবর্তীকালের সমস্যার সমাধান এভাবে হোক— তাই তিনিই এই ঘটনাটিকে ঘটতে দিয়েছেন।

বান্দা মিসকীন (শায়েখ আব্দুল হক মুহদ্দেছে দেহলভী) বলেন, নিঃসন্দেহে তাঁর অন্তর জাগ্রতই ছিলো। নিদ্রা-স্বপ্ন তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। তবে এমনতো হতেই পারে যে, রসুলেপাক স. তখন তাঁর রবের মুশাহাদা (আত্মিক দর্শন) এ মশগুল ছিলেন। তিনি তাতে এতই বিভোর ছিলেন যে, মুশাহাদা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি তাঁর কোনো লক্ষ্যই ছিলো না। যেমন বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে ওহী নাজিলের কালে তাঁর এরকম অবস্থা হতো। সুবেহ সাদেক সম্পর্কে অবহিত হতে না পারার কারণ টের না পাওয়া, ভুলে যাওয়া, উদাসীন থাকা বা নিদ্রাচ্ছন্নতা কোনোটাই নয়। বরং তার কারণ হচ্ছে, নবী করীম স. এর কলবে এক মহান হালত পয়দা হওয়া, যার সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না।

কোনো কোনো সুফি বলেছেন, রসুলেপাক স. এর নিদ্রায় ভারাক্রান্ত থাকাটা আল্লাহ্তায়ালার পরীক্ষা ছিলো। আর ওই পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার কারণ ছিলো তিনি জাগতিক ব্যবস্থাপনার আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং জাগ্রত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্তায়ালার উপর ন্যাস্ত করেননি। এই কারণেই তাঁকে এহেন পরীক্ষার

সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। কেননা তিনি হজরত বেলালকে রাতের বাকী অংশের পাহারাদারি করার জন্য নিয়োজিত করে জাগতিক তদবীরের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুফিয়ানে কেরামের নিকট এটি একটি বুনিয়াদী নিয়ম। যাকে এসকাতে তদবীর এবং তরকে এখতিয়ার বলা হয়। তাঁদের একথাটিও ঠিক। তবে রসুলেপাক স. এর শানে এরূপ বলা আমার নিকট সমীচীন মনে হয় না। কারণ সাইয়্যেদুল মুরসালীন স. এর মহামর্যাদার প্রতি এটা এক ধরনের অনুযোগ। আসবাব (উপকরণ) গ্রহণ করা এবং তার দিকে গুরুত্ব দেয়া তাহকীক (সঠিকতা) এর শেষস্তর। এটা তাওয়াককুলের (আল্লাহ্‌নির্ভরতার) পরিপন্থী নয়। তদবীর (জাগতিক ব্যবস্থাপনা) গ্রহণ করা ওই সকল ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ, যে সকল ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করা হয় নফসের আকাঙ্খার কারণে। শরীয়তের অনুমোদন যেখানে আছে, সেখানে তা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এক্ষেত্রে তো পরিপ্রেক্ষিতের দাবিই ছিলো এরকম যে, একজন পাহারাদার নিযুক্ত করতে হবে।

মোটকথা সাইয়্যেদে কায়েনাত স. এর হালের বিষয়ে জ্ঞানগত কিয়াস করা বরং স্বনির্ভর মারেফতের আলোকে কালাম করা শোভন আদবের বৃত্তবহির্ভূত বিষয়। 'মুতাশাবেহাত' এর বিধান যেরকম, এ বিষয়টির বিধানও সেরকমই।

গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম হওয়ার বিধান

খয়বরের ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম ঘটনা হচ্ছে, গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম হওয়ার বিধান আরোপিত হওয়া। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, খয়বর বিজয় সম্পন্ন হলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। মুসলমানরা অনেক আগুন জ্বালালেন। রসুলেপাক স. জিজ্ঞেস করলেন, এতো আগুন কেনো? কী পাকানো হচ্ছে? সাহাবীগণ বললেন, গোশত। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গোশত? তাঁরা বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। তিনি স. বললেন, এগুলো মাটিতে ঢেলে দাও এবং পাতিলগুলো ভেঙে ফেলো। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, পাতিলগুলোও ভেঙে ফেলবো? নাকি ধৌত করে নিবো? তিনি স. বললেন, ধৌত করে নাও। কোনো কোনো আলেম বলেন, এখানে গৃহপালিত গাধা বলে বন্য গাধাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা বন্য গাধার গোশত হালাল। গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়াও হালাল ছিলো। তবে পরবর্তীতে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আউফা বলেছেন, খয়বর যুদ্ধের সময় একদিন আমাদের খুব ক্ষুধা পেলো। তখন আমরা গাধার গোশত পাকানোর জন্য ডেকসমূহ চুলার উপর রাখলাম। কিছু কিছু পাতিলের

গোশত পাকানো হয়ে গিয়েছিলো। আর কিছু কিছু পাতিলের গোশত তখনও ছিলো কাঁচা। এমন সময় গোশতগুলো ফেলে দেওয়ার নির্দেশ জারী করা হলো। বলা হলো, পাতিলগুলোও ভেঙে দিতে হবে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আউফা উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো সাহাবী বলেছেন, উক্ত গোশত হারাম হওয়ার কারণ এই ছিলো যে, ওগুলো থেকে পঞ্চমাংশ বের করা হয়নি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বোঝা বহনের কাজে ব্যবহৃত হয় বলেই গৃহপালিত গাধা খাওয়া হারাম করে দেওয়া হয়েছে। কেননা সে সময় গাধার প্রয়োজন ছিলো খুব বেশী। একথার সমর্থন হজরত আনাস ইবনে মালেকের হাদিস থেকেও পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর খেদমতে এসে বললো, গাধার গোশত খেয়ে ফেলা হচ্ছে। তখন তিনি স. চুপ রইলেন। আরেক ব্যক্তি এসে একই কথা জানালো। এবারেও তিনি স. চুপ করে রইলেন। তৃতীয় ব্যক্তি এসে যখন বললো, গাধাসমূহ তো শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। এবার তিনি স. বললেন, ঘোষণা করে দাও, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল গাধার গোশত খেতে নিষেধ করে দিচ্ছেন। আর এ বিষয়ে সত্য কথা এই যে, নাপাক হওয়াই এর নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, আমরা সকাল বেলা খয়বরে প্রবেশ করলাম। তখন খয়বরবাসীরা কৃষিসরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে ক্ষেত-খামারের দিকে যাচ্ছিলো। সামনে রসুলেপাক স.কে দেখে তারা বলতে শুরু করলো 'ওয়াল্লাহি মুহাম্মদ ওয়াল খামীস' (আল্লাহ্‌র কসম! মোহাম্মদ পঞ্চবাহিনী (বিলাল বাহিনী) নিয়ে এসে গিয়েছেন)। রসুলেপাক স. বললেন, 'আল্লাহু আকবার খারিবাত খাইবারু ইন্না ইযা আনযালনা বিসাহাতি ক্বাওমিন ফাসাআ সাবাহুল মুনযারীন'। তারপর আমরা গাধার গোশত খেলাম। তিনি স. ঘোষণা করে দিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল গাধার গোশত খেতে মানা করেছেন। কেননা গাধা নাপাক ও অপরিচ্ছন্ন। হাদিসটি হজরত আনাসের হাদিসের পরিপন্থী নয়। গাধার গোশত হারাম হওয়ার কারণ নির্ণয়ার্থে পঞ্চমাংশ বের না করা অথবা বোঝা বহনের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হওয়ার আশংকা। এ সকল ব্যাখ্যা তাঁরাই করে থাকেন, যাঁদের মত গাধার গোশত হালাল হওয়ার পক্ষে। যেমন ইমাম মালেকের বর্ণনা। জমহুর উলামার মাযহাব হচ্ছে, সাধারণভাবেই গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম। অপর এক হাদিসে এসেছে, গাধার গোশত হারাম করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে সহজসাধ্য বিধানও প্রদান করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এক বিবরণে আছে, খয়বর যুদ্ধের দিন ঘোড়ার গোশতের ব্যাপারেও বিধান দেওয়া হয়েছিলো।

ঘোড়ার গোশতের বিধান

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' রচয়িতা বলেছেন, ঘোড়ার গোশতের ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহুর ও শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মাযহাব হচ্ছে, ঘোড়ার গোশত মোবাহ। এতে কোনো মাকরুহ নেই। এ মত হচ্ছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের ইবনে মালেক ও আসমা বিনতে আবু বকর প্রমুখ হজরতগণের। ইমাম মুসলিম সাইয়্যেদা আসমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা রসুলুল্লাহ্র স. এর জামানায় ঘোড়া যবেহ করে তার গোশত খেতাম। আমরা তখন মদীনায় বসবাস করতাম। দারা কুতনীর এক বর্ণনায় আছে, হজরত আসমা বলেছেন, আমরা নবী করীম স. এর গৃহবাসীগণ তা আহার করতাম। 'ফতহুলবারী' পুস্তকে আছে, সাইয়্যেদা আসমা বলেছেন, 'আমরা তখন মদীনায় বসবাস করতাম' তার এই কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঘটনাটি জেহাদ ফরজ হওয়ার পরেই ঘটেছিলো। সুতরাং বলা যেতে পারে, তখন জেহাদের জরুরী বাহন হওয়ার কারণেই ঘোড়ার গোশত নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। কথাটি ঠিক নয়। হজরত আসমা বলেছেন, নবীজীর পরিবারের লোকজনও তা আহার করতেন, এর দ্বারা ওই সকল লোকের কথাও খণ্ডিত হয়ে যায়, যারা বলেন, হজরত আসমার হাদিস দ্বারা একথা মনে হয় না যে, রসুলেপাক স. বিষয়টি অবগত ছিলেন। তাঁর কাছে যা অবিদিত, তা হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পরিবারে রয়েছে— এরকম ধারণাই করা যায় না। কেননা ওই পবিত্র পরিবারটি ছিলো রসুলেপাক স. এর সঙ্গে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ। রসুলেপাক স. এর কাছে যে কোনো বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে অন্যান্যদের চেয়ে তাঁরাই ছিলেন অধিকতর অগ্রগামী। সুতরাং এই বিষয়টি প্রাধান্য প্রাপ্তির যোগ্য যে, কোনো সাহাবী যখন বলেন, আমরা রসুলুল্লাহর জামানায় এরকম করতাম, তখন বুঝতে হবে অবশ্যই বিষয়টি রসুলেপাক স. এর অবহিতিভূত এবং অতিঅবশ্যই তাঁর অনুমোদনপ্রাপ্ত। এই বিধানটি যখন সাধারণভাবে সকল সাহাবীর বেলায় প্রযোজ্য হয়, তখন হজরত আবু বকরের পরিবারের বেলায় তা প্রযোজ্য হবে না কেনো? কেনোই বা এরকম অপভাবনাকে প্রশ্রয় দিতে হবে যে, রসুলেপাক স. যা জানতেন না, তাঁরা তা প্রচার করবেন?

ইমাম তাহাভী বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা ঘোড়ার গোশত খাওয়া মাকরুহ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ) এবং সাহেবাইন ছাড়াও অন্যান্যগণ এর বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা ঘোড়ার গোশত খাওয়া হালাল হওয়ার পক্ষে মুতাওয়াতির (সুপ্রসিদ্ধ) হাদিসসমূহের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন। তাবেয়ীগণ সাধারণতঃ এর হালাল হওয়ার বিষয়ে সকল সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইবনে আবী শায়বা শায়েখাইন

(ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম) এর শর্ত অনুসারে হজরত আতা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সলফগণ সর্বদাই এর গোশত ভক্ষণ করতেন। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, সলফ বলতে আপনি কাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন? আপনি কি সলফ বলতে সাহাবীগণকে বুঝাতে চেয়েছেন? হজরত আতা তখন বলেছিলেন, হাঁ। তবে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ঘোড়ার গোশত খাওয়া 'মাকরুহ' হওয়ার যে বিবরণ এসেছে তা ইবনে আবী শায়বা এবং আব্দুর রাজ্জাক উভয়েই শিথিলসূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার উক্তি 'জামে সগীরে' উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ঘোড়ার গোশত খাওয়াকে আমি মাকরুহ মনে করি। আবু বকর রাযী এ কাজকে মাকরুহ তানযিহী হিসেবে গণ্য করেছেন। বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা একে মাকরুহ তাহরিমী বলেননি। তাঁর মতে ঘোড়া গৃহপালিত গাধার ন্যায় নয়। 'মুহীত', 'হেদায়া' ও 'যখীরা' রচয়িতাগণ মাকরুহ তাহরিমীই সাব্যস্ত করেছেন। আর এটাই হচ্ছে অধিকাংশ হানাফী মতাবলম্বীদের মত। ইমাম কুরতুবী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, ইমাম মালেকের মাযহাব মাকরুহর দিকে। ফাকেহানী বলেছেন, মালেকী মাযহাব অনুসরণকারীদের নিকট বিখ্যাত মত হচ্ছে, ঘোড়ার গোশত খাওয়া মাকরুহ। আর তাঁদের মধ্যে যারা মুহাককেক, তাঁদের নিকট সহীহ্ মত হচ্ছে, ঘোড়ার গোশত খাওয়া হারাম। ইবনে আবী হামযা বলেছেন, শর্ত বিহীনভাবে একাজ জায়েয হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। তবে ইমাম মালেকের নিকট তা মাকরুহ হওয়ার কারণ হচ্ছে, ঘোড়া যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং মাকরুহ হওয়াটা বহিরাগত কারণে। প্রাণীগত কারণে নয়। ঘোড়ার গোশত খাওয়া বৈধ হওয়ার বিষয়ে বোখারী ও মুসলিমের বিবৃতি রয়েছে। যবেহ করার কালে যদি এমন কিছুর আবির্ভাব হয়, যার কারণে পশুটি খাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার দ্বারা সাধারণভাবে পশু হারাম হওয়া অবধারিত হয় না।

তাবেয়ীগণ বলেছেন, ঘোড়ার গোশত খাওয়া যদি হালাল হতো, তাহলে তার দ্বারা কোরবানী সিদ্ধ হতো। তাঁদের একথা ওয়াশানী হায়ওয়ানাত (যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, কিন্তু তা দ্বারা কোরবানী করা যায় না) এর মাধ্যমে খণ্ডিত হয়ে যায়। সেগুলো দ্বারা কোরবানী করা যায় না, কিন্তু সেগুলোর গোশত খাওয়া হালাল। তবে আবু দাউদ ও নাসায়ীতে এ সম্পর্কে হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে এভাবে— রসুলেপাক স. ঘোড়া ও গাধার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। হাদিসটি শিথিলসূত্রসম্বলিত। হাদিসটি হজরত জাবেরের ওই হাদিসের সঙ্গেও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না, যাতে রয়েছে ঘোড়ার গোশতের বৈধতার প্রমাণ। এই হাদিস ও হজরত আসমার হাদিসের বক্তব্যও

এরকম। আর হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের হাদিসটিকে ইমাম আহমদ, বোখারী, দারাকুতনী, খাত্তাবী, ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল হক ও অন্যান্য বড় বড় আলেম ও হাদিসবেত্তাগণ দুর্বল বলে সাব্যস্ত করেছেন। কোনো কোনো হাদিসবেত্তা মনে করেছেন, হজরত জাবেরের হাদিস বিষয়টিকে হারাম প্রমাণ করে। কেননা তিনি বলেছেন, 'রুখখিসা ফিল খাইলি' (ঘোড়ার গোশতের ব্যাপারে রুখসত প্রদান করা হয়েছে)। আর 'রুখসত' মানেই হলো নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মোবাহর বিধান দান অসম্ভব। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে যদি রুখসত প্রদান করা হয়, আর সে বিষয়ে নিষিদ্ধতার বিবরণও পাওয়া যায়, তবে ওই রুখসত দ্বারা বিষয়টিকে মোবাহ মনে করা যাবে না। সুতরাং রুখসত প্রযোজ্য হবে বিশেষ কোনো বিষয়ে। অধিকাংশ বিবরণে 'আযিনা' শব্দ এসেছে— যার অর্থ অনুমতি দিয়েছেন। মুসলিম শরীফেও এরূপ বর্ণনা আছে। এজাতীয় একটি বিবরণ এরকম— আমরা খয়বর যুদ্ধের সময় গোড়ার গোশত এবং বন্য গাধার গোশত ভক্ষণ করতাম। কিন্তু রসুলেপাক স. গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে মানা করতেন। দারাকুতনী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন; রসুলেপাক স. গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে হুকুম দিয়েছে। এই সকল হাদিস প্রমাণ করে যে, 'রাখখাসা' অর্থ আযিনা (অনুমতি দিয়েছে)। 'রুখসত' যদি বিশেষ কিছুর ভিত্তিতেই হতো, তাহলে তার জন্য গৃহপালিত গাধার উপরেই নিষেধাজ্ঞা অধিকতর উপযোগী হতো, ঘোড়ার গোশতের উপরে নয়। কেননা গাধার সংখ্যা এমন কম নয় যে, তাতে বাহনসংকট সৃষ্টি হবে। আবার ঘোড়াও কোনো নিকৃষ্ট প্রাণী নয়। বরং সে সময় তার যথেষ্ট কদর ও ইজ্জত ছিলো। সুতরাং এ সকল আলোচনা দৃষ্টে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি সাধারণ ভাবেই দেওয়া হয়েছিলো। বিশেষ কোনো কারণে নয়। এ সকল কথাই 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে আছে। 'ফতওয়ায়ে সিরাজিয়া'তে আছে, ইমাম আবু হানীফার নিকট ঘোড়ার গোশত মাকরুহ। এতে সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ীর মতানৈক্য আছে। তাঁদের নিকট ঘোড়ার গোশত মাকরুহ নয়। কাযী সদরুল ইসলাম বলেছেন, মাকরুহ অর্থ এখানে মাকরুহে তাহরিমী বা হারাম। তাঁর ভাই ফখরুল ইসলাম শায়েখ ইমাম আলী বযদভী বলেছেন, মাকরুহ অর্থ মাকরুহে তানযিহী। শায়খুল ইসলাম সারাখসী বলেছেন, এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার উক্তিটি অধিক সাবধানতামূলক। আর সাহেবাইনের মন্তব্য মানুষের জন্য প্রশস্ততাপ্রদায়ক। 'খোলাসা' কিতাবে বলা হয়েছে, ঘোড়ার গোশত মাকরুহ। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে— মাকরুহ তাহরিমী। 'কাফী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, মাকরুহ তানযিহী এবং এটাই সহীহ্ কথা। ফখরুল ইসলাম এবং আবু নাঈম প্রমুখ লেখকদ্বয় আপন আপন গ্রন্থ

'জামে'তে এ মতের দিকেই গিয়েছেন। ইমাম ইসপাহানীও এ মতকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম সারাখসী বলেছেন, এ বিধানটি জাহেরের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জন্য অধিকতর কোমল। এতে লোকেরা কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া ঘোড়ার গোশত বিক্রি করতে পারবে। 'কেফায়াতুল মুনতাহা' কিতাবে বলা হয়েছে, ইমাম আযম আবু হানীফা ঘোড়ার গোশত হারাম বলা থেকে মত ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁর ইনতিকালের তিন দিন পূর্বে। এর উপরই ফতওয়া হয়েছে। ঘোড়ার গোশত যে মোবাহ এ মতের উপর মাওয়ারাউন্নাহারের আলেমগণ একমত। হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য ঘোড়ার গোশত খাওয়ার বিষয়ে এতোটুকুই যথেষ্ট। হানাফী মতাবলম্বীদের কোনো কোনো সাবধানী ব্যক্তির ব্যাপারে এরকম শোনা গেছে যে, তাঁরা নিজেরা ঘোড়ার গোশত ভক্ষণ করতেন না। কিন্তু তা দিয়ে মেহমানদারী করতেন। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

রসুন ও পিঁয়াজ খাওয়ার বিধান

খয়বর যুদ্ধের ঘটনাবলীর মধ্যে রসুন খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটিও অন্যতম। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে— রসুন ও পিঁয়াজ খাওয়া হারাম নয়। তবে এ সব খাওয়ার পর মসজিদে এবং পাকপবিত্র কোনো মজলিশে যাওয়া মাকরুহ। কেননা পিঁয়াজ-রসুনের গন্ধে অন্য লোকের কষ্ট হয়। এ সময় নখরবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত হারাম হওয়ার বিধান জারী করা হয়েছিলো। বণ্টনের পূর্বে গনিমতের মাল বিক্রি করার বিষয়েও হারামের বিধান আরোপিত হয়েছিলো। হামেলা বাঁদীর বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে তার সঙ্গে সহবাস করা এবং মোতা বিবাহ হারামের বিধানও জারী হয় এই খয়বর যুদ্ধের সময়েই।

মোতা হারাম হওয়া

খয়বর যুদ্ধের ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম ঘটনা হচ্ছে, মোতা বিবাহ হারাম হওয়া। ইসলামের প্রারম্ভ কাল থেকে খয়বরের যুদ্ধের সময় পর্যন্ত মোতা বিবাহ হালাল ছিলো। এরপর মোতা হারাম হয়ে যায়। এই যুদ্ধের পর মক্কাবিজয় পর্যন্ত অর্থাৎ আউতাস যুদ্ধ পর্যন্ত মোতাকে মোবাহ (বৈধ) সাব্যস্ত করা হয়। আউতাস দিবস মক্কাবিজয়ের পর সংঘটিত হয়েছিলো। মক্কাবিজয়ের সাথে আউতাসকে মিলিয়ে ফেলা হয় একারণে যে, ওই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিলো মক্কাবিজয়ের পরক্ষণে। ওই ঘটনার তিন দিন পর মোতা বিবাহ চিরদিনের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়। এই হারামের বিধানের বিষয়ে রাফেযী সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কারও কোনোরূপ মতানৈক্য নেই।

এক ব্যক্তির আত্মহত্যার ঘটনা

খয়বর যুদ্ধের ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম আর একটি ঘটনা হচ্ছে, এমন এক ব্যক্তির আত্মহত্যা, যে যুদ্ধের ময়দানে অনন্য দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর রেখেছিলো। তার সামনের কোনো শত্রুকেই সে ছাড়েনি। হয় তাকে জীবনে শেষ করে দিয়েছে, না হয় কঠিনভাবে জখম করে দিয়েছে। তার এহেন তৎপরতা দেখে মুসলমানগণ বলাবলি করতেন, যুদ্ধের ময়দানে এমন বীরত্বপূর্ণ অবদান আমাদের মধ্যে কেউই রাখতে পারেনি। লোকেরা রসুলেপাক স. এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! অমুক ব্যক্তিতো সমরপ্রান্তরে অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে চলেছে। তিনি স. বললেন, তোমরা সাবধান হয়ে যাও। জেনে রেখো, ওই লোকটি নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। একথা শুনে তাঁরা বিস্মিত ও চিন্তিত হলেন, ভাবতে লাগলেন, লোকটি তো অসাধারণ বীর। শত্রুসৈন্যকে সে তছনছ করে দিয়েছে। আর তার সম্পর্কে আল্লাহ্র রসুল এ কী কথা বলছেন! দেখা যাক প্রকৃত অবস্থা কী দাঁড়ায়। ঘটনা বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন বলেন, তখন আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, আজ আমি সব সময় ওই লোকটির সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। তাকে পর্যবেক্ষণ করবো। অপর এক বর্ণনাকারী বলেন, তখন থেকে আমি তার পিছনে লেগে রইলাম। সে যেখানে যায়, আমিও সেখানে যাই। সে যেখানে থামে, আমিও সেখানে থেমে যাই। সে যেখানে দ্রুত চলতো আমিও সেখানে দ্রুত চলতাম। সে অসম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে চললো। এক সময় সে সাংঘাতিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো। জখম ছিলো অত্যন্ত কঠিন। তার জীবন সংকীর্ণ হয়ে গেলো। এক পর্যায়ে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সে তার তরবারীর বাটটি মাটিতে রাখলো। তরবারীর অগ্রভাগ উপরের দিকে খাড়া করে তার বুকের মাঝখানে স্থাপন করলো এবং তার উপর নিজের দেহটি ছেড়ে দিলো। এভাবে সে তার নিজের জীবন নিজেই সংহার করলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে রসুলেপাক স. এর কাছে গেলাম। বললাম, আশহাদু আন্নাকা রসূলুল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রসুল)। তিনি স. বললেন, কী ব্যাপার! নতুন করে শাহাদতের কলেমা পাঠ করছো কেনো? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি বলেছিলেন, লোকটি জাহান্নামী। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য, এতক্ষণ তার পিছনে লেগে ছিলাম। এক পর্যায়ে দেখলাম যে, সে খুব মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। অতঃপর সে নিজ হাতে তার জীবন শেষ করে দিলো। আত্মহত্যাকারী জাহান্নামীই হয়। রসুলেপাক স. বললেন, মানুষ বাহ্যিকভাবে জান্নাতের আমল করে অথচ সে হয়ে থাকে জাহান্নামের অধিবাসী। কাজেই নিজের আমলের প্রতি অহংকারী হওয়া উচিত নয়। আবার কোনো ব্যক্তি এমন হয়— বাহ্যিকভাবে জাহান্নামের আমল করে অথচ সে হয়ে যায় জান্নাতী।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এ বিষয়টি অবশ্য অপরিহার্য হয় না যে, প্রত্যেক আত্মহত্যাকারীই জাহান্নামী। তবে হাঁ, কেউ যদি এহেন জঘন্য কর্মটিকে হালাল মনে করে তবে সে জাহান্নামী হবে। অথবা এর অর্থ হবে এরকম— সে হয়ে যায় জাহান্নামী, আল্লাহ্তায়ালা যদি তাকে ক্ষমা না করেন। কাসতলানী এমনই বলেছেন। একথাও বলেছেন যে, সম্ভবতঃ সে মুনাফিকদের মধ্যে গণ্য হবে। আত্মহত্যাকে হালাল মনে করার কারণে সে হবে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)। রসুলেপাক স. এর ওই সংবাদের অনুসরণে অপর এক হাদিসে এসেছে, তিনি স. বলেছেন, তোমরা ঘোষণা করে দাও, মুমিন ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর আল্লাহ্তায়ালা ফাসেক ব্যক্তির দ্বারাও তাঁর দ্বীনের সহায়তা দান করতে পারেন।

ফাদাক বিজয়

ওই সময় আরও কতিপয় ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু সেগুলো মূলতঃ খয়বর যুদ্ধের ঘটনার অন্তর্ভূত নয়। তথাপিও ঘটনাগুলো ওই যুদ্ধের খুব কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়েছিলো। তার মধ্যে ফাদাকের যুদ্ধ অন্যতম। খয়বরের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম ফাদাক। জীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. খয়বরের আশপাশের এলাকায় প্রবেশ করে হুয়ায়সা ইবনে মাসউদ হারেছীর ভাই মাহীসা ইবনে মাসউদ হারেছী রা.কে ফাদাক নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। নির্দেশ দিলেন, সেখানকার অধিবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। সংবাদ জানাও, আল্লাহ্র নবী তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন (যদি ইসলাম গ্রহণ না করো) যেমন করেছেন খয়বরবাসীদের সঙ্গে। ফাদাকের লোকেরা বললো, খয়বরবাসীদের দশ হাজার যোদ্ধা আছে। আমরা মনে করিনা মোহাম্মদ তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবেন। মাহীসা বুঝতে পারলেন, তারা সন্ধির পথে আসবে না। তিনি ফিরে এলেন। রসুলেপাক স. এর কাছে সবকিছু খুলে বললেন। কিছুক্ষণ পর ফাদাকের সরদারদের একটি দল সেখানকার কতিপয় ইহুদীকে নিয়ে রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হলো। সন্ধির বিষয়টি পাকা পোক্ত করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। আলাপ-আলোচনার পর একথা সাব্যস্ত হলো যে, ফাদাক এলাকার অর্ধেক যমীন রসুলেপাক স.কে দিয়ে দেওয়া হবে। আর অর্ধেক যমীন তারা রাখবে তাদের নিজের অধিকারে। সন্ধির এই ধারা হজরত ওমর ফারুকের খেলাফত পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। পরে হজরত ওমর ফারুক ফাদাকবাসীদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে শাম দেশের দিকে পাঠিয়ে দেন। অর্ধেক যমীন যা সেখানকার বাসিন্দাদের দখলে ছিলো তা বায়তুল মাল থেকে পঞ্চাশ হাজার দেরহাম দিয়ে ক্রয় করে নেন। ফাদাক ও তার মালের বিষয়ে আলোচনা যথাস্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

এভাবে খয়বরবাসীদেরকে খয়বর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিলো। তারা বলেছিলো, হে ওমর! আবুল কাসেম যা নির্দ্ধারণ করে গেছেন, আপনি তার বিরুদ্ধাচরণ করছেন কেনো? তিনি বললেন, আমি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। আর আল্লাহ্র নবী তোমাদেরকে এমন কথাও বলেননি যে, যতোদিন তোমাদের মর্জি হবে, ততোদিন তোমরা এখানে বসবাস করতে পারবে। এখন আমরা চাই না যে, তোমরা এখানে বসবাস করো। বোখারী শরীফে হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর ফারুক দণ্ডায়মান হলেন। ঘোষণা করলেন, তিনি ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করবেনই। বনী হাকীক নামক এক ব্যক্তি বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাদেরকে বের করে দিচ্ছেন। অথচ আবুল কাসেম আমাদেরকে এখানে বসবাসের অধিকার দিয়ে গিয়েছেন। হজরত ওমর বললেন, তোমাদের কি মনে হয় যে, আমি রসুলুল্লাহর ওই কথা ভুলে যাবো, যা তিনি তোমাদের সম্পর্কে বলেছিলেন। তা হলো, তাদের অবস্থা কী হবে, যখন তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর তারা রাতকে রাত উট দৌড়াতে থাকবে? তারা বললো, একথা তো তিনি বলেছিলেন, খোশমেজাজে। দৃঢ়তার সাথে তো বলেননি। হজরত ওমর বললেন, আল্লাহ্র দুশমন! তুমি মিথ্যা কথা বলছো। তারপর তিনি তাদেরকে সেখান থেকে দেশান্তরিত করলেন এবং তাদের মালের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। তাদের মালসামান, উট, এমনকি উটের রশি ও পালানের কাঠের মূল্যও পরিশোধ করে দিলেন।

(প্রসঙ্গক্রমে হজরত ওমরের ওই বিশেষ তৎপরতার বর্ণনা এখানে পেশ করা হলো। এবার মূল আলোচনায় ফিরে আসা যাক)। রসুলেপাক স. খয়বর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ওয়াদিউল কোরার দিকে মনোনিবেশ করলেন। প্রত্যাবর্তনকালে সাহবা নামক স্থানে অবস্থান করলেন। এখানেই সাইয়্যেদা সাফিয়ার সঙ্গে তাঁর বাসর যাপিত হয়। আর এই স্থানেই হজরত আলীর জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে আনার ঘটনা ঘটে।

ওয়াদিউল কোরা অভিযান

রসুলেপাক স. ওয়াদিউল কোরায় পৌঁছে সেখানকার অধিবাসীদেরকে অবরোধ করলেন। এভাবে চার দিন অতিবাহিত হলো। তারা যুদ্ধ করতে মনস্থ করলো। দুর্গ থেকে বেরিয়েও এলো। রসুলেপাক স.ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। সাহাবায়ে কেরামকে কাতারবন্দী করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। জনৈক সাহাবীকে পতাকা বহনের দায়িত্ব দিলেন। তারপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং বললেন, তোমরা যদি মুসলমান হয়ে যাও তাহলে তোমরা নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়ে যাবে। তবে তোমাদের হিসাব কিতাব আল্লাহ্তায়ালার কাছে। তারা

রসুলেপাক স. এর উপদেশ গ্রহণ করলো না। যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ী হলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চললো। ইহুদীদের মধ্যে দশজন নিহত হলো। বিজয় অর্জিত হলো পরদিন সকালে। বহু অস্ত্রশস্ত্র ও অসংখ্য মালসামান মুসলমানদের হস্তগত হলো। রসুলেপাক স. ওয়াদিউল কোরার ইহুদীদের উপর অনুগ্রহ করলেন। তাদের জমাজমি ও বাগবাগিচা তাদের কাছেই রেখে দিলেন। নির্দেশ দিলেন তারা মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করে যাবে। ওয়াদিউল কোরার ইহুদীদের পরিণতির সংবাদ যখন তায়মার ইহুদীদের কাছে পৌঁছলো তখন তারা দৌড়ে এসে সন্ধি করে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়ে গেলো। এভাবে অনেক ছোটো ছোটো দল বেরিয়ে পড়লো। সারিয়া আবু বকর সিদ্দীক, সারিয়া ওমর ইবনুল খাত্তাব, সারিয়া বিশর ইবনে সাআদ আনসারী, সারিয়া গালেব ইবনে আবদুল্লাহ্ লাইছী প্রভৃতি ছোটো ছোটো দল এ বৎসর অভিযানে তৎপর ছিলো।

ওমরাতুল কাযা

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে ছিলো, মুসলমানগণ পরের বছর ওমরা পালন করতে পারবেন। সেই ওমরা এবার কাযা করা হলো। সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে এই ওমরা পালন করা হয়। তাই একে ওমরাতুল কাযা নাম দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে শাফেয়ী মাযহাব অনুসারীরা বলেন, কাযা মানে সন্ধি। অর্থাৎ ওই ওমরা যা হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় নির্ধারণ করা হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো, মুসলমানগণ আগামী বৎসর আসবেন এবং ওমরা পালন করবেন। এ কারণে এর নামকরণ হয়েছে ওমরাতুস সুলেহ, ওমরাতুল কাযা বা ওমরাতুল কাযিয়া। হানাফী মতাবলম্বীদের মতে এর নামকরণের দৃষ্টিকোণ হচ্ছে, এটি কাযা ওমরা, যা বাধা দেওয়ার কারণে এবং রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে হুদায়বিয়া থেকে ফওত হয়ে গিয়েছিলো। এ মতভেদের ভিত্তি হচ্ছে— কেউ কেউ মনে করেন, রসুলেপাক স. ওমরার এহরাম বেঁধেছিলেন। তারপর বায়তুল্লাহ্ থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। বায়তুল্লাহ্য় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তাই তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব হচ্ছে, এক্ষেত্রে দম দেওয়া ওয়াজিব। ওমরা করা এক্ষেত্রে ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মাযহাব এর বিপরীত। অর্থাৎ ওমরা কাযা করা ওয়াজিব— দম দেওয়া ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ীর দলিল এই আয়াত 'ফাইন উহসিরতুম ফামাস্‌তাইসারা মিনাল হাদ্ই' (তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করিও)। ইমাম আবু হানীফার দলিল হচ্ছে, শুরু করার কারণে ওমরা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। অতঃপর যখন বাধা প্রদান করা হলো, তখন সে ওমরা তো আর আদায় করা হলো না। সুতরাং প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পর তা কাযা করা অপরিহার্য।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, হুদায়বিয়ার ওমরা ফাসেদ হয়নি বরং পুরা হয়ে গিয়েছিলো। এ পরিপ্রেক্ষিতে রসুলেপাক স. এর ওমরার সংখ্যা চার বলা হয়ে থাকে। সুতরাং বুঝা যায়, হুদায়বিয়ার ওমরাও তার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। তবে এটা প্রকাশ্য কথা যে, আসলে ওমরার কোনো অনুষ্ঠান হয়নি— তওয়াফ ও সায়ীও অনুষ্ঠিত হয়নি।

মোটকথা হচ্ছে, রসুলেপাক স. খয়বর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর এবং তার যাবতীয় কার্যাবলী পূর্ণতা দান করার পর, মদীনার চতুর্দিকে বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দল প্রেরণের পর হিজরী ৭ম বৎসরের যিলকদ মাসের প্রথম দিকে ওমরাতুল কাযার প্রস্তুতি নিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, যারা হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলো তারা যেনো এই সফরে তাঁর সঙ্গী হয়। কেউ যেনো বাদ না পড়ে। তবে অন্য কেউ যদি যেতে চায়, তাহলে যেতে পারবে। এ ঘোষণা শুনে সাহাবীগণের মধ্যে সাজ সাজ রব শুরু হলো। সকলে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। রসুলেপাক স. এর দরবারে বার বার উপস্থিত হতে লাগলেন। যাঁরা বায়াতে রেদওয়ানের সময় উপস্থিত ছিলেন না, তাঁরাও তাঁর সঙ্গী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। রসুলেপাক স. হজরত আবু যর গিফারীকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। দু'হাজার সাহাবী, একশ ঘোড়া, ষাটটি কোরবানীর পশু, অপর এক বর্ণনানুসারে আশিটি কোরবানীর পশু, কিছু যুদ্ধাস্ত্র, লৌহশিরোস্ত্রান, বর্ম ও তীর-ধনুক ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। যখন যুলহুলায়ফায় পৌঁছলেন তখন ঘোড়াগুলো মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার দায়িত্বে অর্পণ করলেন। হাতিয়ারসমূহ দিলেন হজরত বশর ইবনে সাআদের তত্ত্বাবধানে। তারপর এহরাম বেঁধে তালবীয়া পাঠ করলেন। সঙ্গী সাহাবীগণও এহরাম বেঁধে তালবীয়া পাঠ করলেন। ঘোড়া ও হাতিয়ারসমূহ আগে পাঠিয়ে দিলেন। মক্কা থেকে এক মনজিল দূরে মাররুয্ যাহরান নামক স্থানে কুরাইশদের একটি দলের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার কাছে তারা রসুলেপাক স. এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো। বললো, এখন তিনি কোথায়? তিনি বললেন, আগামীকাল নাগাদ তিনি এসে পড়বেন এবং এই মনজিলেই অবস্থান করবেন ইনশাআল্লাহ্। রসুলেপাক স. পরদিন বাতনে মাহেজ নামক স্থানের কাছে অবতরণ করলেন। কুরাইশরা রসুলেপাক স. এর আগমনের সংবাদ শুনলো। হাতিয়ার ও ঘোড়ার বহর দেখে বলতে লাগলো, কী ব্যাপার! তিনি কি যুদ্ধ করতে এসেছেন? তবে কি তিনি সন্ধি ভঙ্গ করে ফেললেন? তাঁরা বললেন, সন্ধি যথাস্থানেই আছে। তবে সাবধানতাবশতঃ এসব সঙ্গে আনা হয়েছে। একথা শুনে তারা স্বস্তি ফিরে পেলো। রসুলেপাক স. বাতনে মাহেজ থেকে আউস ইবনে খাওলী আনসারীকে দু'শ সাহাবীর সঙ্গে ছেড়ে দিলেন। তারা মক্কার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি স. তাঁর বাহন কাসওয়ার উপর আরোহণ করলেন। মুসলমানগণ আপন আপন তরবারী কোষবদ্ধ

করে বহন করে চললেন। সকলের মুখে মুহুর্মুহু উচ্চারিত হতে লাগলো তালবীয়া। কুরাইশরা খবর জানার জন্য পাহাড়ের উপর আরোহণ করলো। আবার কেউ কেউ এসে রসুলেপাক স. এর আশে পাশে হেঁটে হেঁটে পথ চলতে লাগলো। তিনি স. কোরবানীর পশুসমূহ সঙ্গে নিয়ে যূ তাওয়া নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ছিলেন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি উটের রশি ধরে আগে আগে চলতে লাগলেন এবং সাথে সাথে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

খাল্লু বানীল কুফ্ফারি আ'ন সাবীলিহ্
আল ইয়াওমা নাদ্বরিবুকুম আ'লা তানযীলিহী
দ্বারবান ইয়াযীলু ইলহামা আ'ন মুক্বীলিহী
ওয়া হাযা হালা আল খালীলু আ'ন খালীলিহী

অর্থঃ হে অবিশ্বাসীদের সন্তান! তোমরা আল্লাহ্‌র রসুলের পথ ছেড়ে দাও। এক পাশে সরে দাঁড়াও। আজ আমরা তোমাদেরকে আঘাত করবো তাঁর প্রতি অবতারিত বাণীর মধ্যেমে। এমন আঘাত করবো, যাতে তোমাদের মাথার চুল পর্যন্ত পড়ে যাবে। আমরা আজ ভুলে যাবো বন্ধুর বন্ধুত্ব। কোনো কোনো বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে এই কথাটুকু—

ক্বাদ আনযালার রহমানু ফী তানযীলিহী
ফী সুহুফিন তুতলা আ'লা রসূলিহী
বিআন্না খাইরাল ক্বাতলি ফী সাবীলিহী

অর্থঃ আল্লাহ্‌র কোরআনে এবং সহীফায় যা তাঁর রসুলগণ তিলাওয়াত করতেন তাতে ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করা সর্বোত্তম আমল।

হজরত ওমর বললেন, হে ইবনে রাওয়াহা! রসুলুল্লাহ্‌র সামনে কবিতা পাঠ করছো? তিনি স. বললেন, হে ওমর! ওকে কিছু বলো না। আবৃত্তিতে বাধা দিয়ো না। নিশ্চয়ই তার কবিতা অতি দ্রুত গাতিতে কাফেরদের অন্তরে তীরের ন্যায় বিদ্ধ হচ্ছে।

রসুলেপাক স. তালবীয়া পড়তে পড়তে কাবা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। হাজারে আসওয়াদ এস্তেলাম (হাজারে আসওয়াদে হাত লাগিয়ে তারপর হাত চুম্বন) করলেন। তিনি স. এস্তেলাম করেছিলেন তার যষ্টি দ্বারা। যার মাথা ছিলো বক্র। অধিকাংশ সময় ওই যষ্টি তাঁর হাতে থাকতো। এধরনের লাঠিকে বলা হয় মেহজান। আর তিনি স. তখন সওয়ারীতে আরোহণ করে তওয়াফ করেছিলেন। তিনি স. যখন এস্তেবা করা অবস্থায় ছিলেন, অর্থাৎ এহরামের চাদর ডান বগলের নিচে দিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে তওয়াফ করেছিলেন, তখন সাহাবীগণও তাঁর অনুকরণে এহরাম পরেছিলেন। এরূপ অবস্থা দেখে মুশরিকরা বলতে শুরু করলো

ইয়াছরিবের জ্বর মোহাম্মদের সাথীদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, শক্তি ও শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করো। মুশরিকরা দেখুক। প্রথম তিন চক্করে রমল (অল্প দৌড়) করতে হবে। আর শেষ চার চক্কর স্বাভাবিক অবস্থায় করবে। অর্থাৎ এমনভাবে তওয়াফ করবে যা ঠিক দৌড় নয়, তবে বীরত্বব্যঞ্জক। সকল চক্করে অর্থাৎ পুরা সাত চক্করে রমলের নির্দেশ তিনি স. দেননি। এটা ছিলো সাহাবীগণের প্রতি তাঁর স্নেহ-বাৎসল্যের বহিঃপ্রকাশ। তিনি স. আরো বললেন, প্রথম তিন চক্করে এবং রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে ধীরগতিতে চলবে। এখানে ধীরগতিতে চলার কথা বললেন এই কারণে যে, এখানে বিধর্মীরা সাহাবায়ে কেরামকে দেখতে পাবে না। কেননা তারা তখন কাইকেআন পাহাড়ে অবস্থান করছিলো, যা ছিলো রুকনে শামী ও রুকনে ইরাকীর বরাবর। এক বিবরণে এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ইতোপূর্বে উল্লেখিত রাজায (বীর গাঁথা) পাঠ করছিলেন রসুলেপাক স. এর তওয়াফের সময়। তিনি স. তখন বলেছিলেন, এই জিকিরও সাথে সাথে পাঠ করো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু নাসারা আ'বদাহু ওয়া আ'য্যা জুনদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই যিনি তাঁর বান্দাকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁর বাহিনীকে মর্যাদা দান করেছেন এবং একাই সকল মিথ্যাচারী গোত্রকে পরাস্ত করেছেন)। হজরত ইবনে রাওয়াহা বর্ণিত জিকির শুরু করে দিলেন। সকল সাহাবী তাঁর সাথে সাথে উচ্চকণ্ঠে তা পড়তে লাগলেন। তওয়াফ শেষে তিনি স. মসজিদের বাইরে এলেন এবং সওয়ারীতে আরোহণ করা অবস্থায়ই সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করলেন। তারপর হুকুম করলেন, কোরবানীর পশুপালকে মারওয়া পাহাড়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হোক। স্থানটি ছিলো মক্কা নগরীর সকল মহল্লার কোরবানীর জায়গা। এখানে উটকে নহর করা ও কোরবানী করা জায়েয।

রসুলেপাক স. মারওয়ার কাছে কোরবানী করলেন। মস্তক মুণ্ডন করলেন। সাহাবীগণও তার অনুসরণ করলেন। এরপর সাহাবীগণের এক দলকে হাতিয়ারসমূহের হেফাজতের জন্য বতনে মাহেজে প্রেরণ করলেন। বলে দিলেন, তাঁরা যেনো সেখানেই থাকেন এবং যাঁরা সেখানে রয়েছেন তাঁরা যেনো এসে তাদের নুসুক (ওমরার অনুষ্ঠানাদি) আদায় করেন। রসুলেপাক স. ওই সময় কাবাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন বলে এক বর্ণনায় পাওয়া যায়। বর্ণনাটি এরকম— তিনি স. জোহরের নামাজ আদায় করলেন কাবা গৃহের অভ্যন্তরে। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি স. ওমরাতুল কাযার সময় কাবা গৃহের ভিতরে প্রবেশ করেননি। কুরাইশরা ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলো। কেননা সন্ধির মধ্যে বিষয়টির উল্লেখ ছিলো না। আল্লামা ওয়াকেদী এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এরপর তিনি স. কাবাগৃহের উপরে উঠে আজান দেওয়ার নির্দেশ

দিলেন। আদেশটি ছিলো একবারের জন্য। তারপর হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবকে হুকুম দিলেন, মায়মুনা বিনতে হারেছের কাছে আমার বিবাহের পয়গাম নিয়ে যাও। মায়মুনা বিষয়টির ভার দিলেন হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের উপর। কেননা তাঁর বোন উম্মুল ফজল হজরত আব্বাসের বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। হজরত মায়মুনার সম্মতি পেয়ে হজরত আব্বাস রসুলেপাক স. এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ পড়িয়ে দিলেন। তিনি স. তখনও ছিলেন এহরাম অবস্থায়। কেউ কেউ বলেন, তিনি তখন এহরাম মুক্ত হয়েছিলেন। বিষয়টি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। উসুলে ফেকাহর মধ্যে এর সবিস্তার আলোচনা আছে। আজওয়াজে মুতাহ্হারাতের আলোচনাকালে যদি সুযোগ আসে, তবে এ সম্পর্কে আরো বিবরণ দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহতায়ালা।

রসুলে আকরম স. তিনদিন মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করলেন। চতুর্থ দিন তারা তাদের একজনকে হজরত আলীর কাছে পাঠালো এ কথা জানিয়ে দিতে যে, তিনি যেনো রসুলেপাক স.কে মক্কার বাইরে চলে যেতে বলেন। হজরত আলী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কুরাইশরা তো এরকম বলছে। তিনি স. বললেন, হাঁ। এরকমই করবো। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. তখন কোনো একজন সাহাবীকে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, তাদেরকে বলো, তারা যেনো আমাকে এখানেই মায়মুনার বিয়ের ওলীমা সম্পন্ন করার সুযোগ দেয়। তাদের জন্যও যেনো আহারের আয়োজন করতে পারি। তারা বললো, আহারের প্রয়োজন নেই। তোমরা চলে যাও।

হায় আক্ষেপ! যমীনের মালিক তো আল্লাহ্, এর প্রতিনিধি যদি কেউ থাকে, তাহলে তিনি তো আল্লাহ্র রসুল। ভবিষ্যৎ তো সেকথাই বলবে। হজরত সাআদ ইবনে উবাদা তখন ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কাফেরদের রূঢ়তা ও বেআদবী যখন সীমাতিক্রম করলো, তখন তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, যতক্ষণ আমাদের ইচ্ছা না হবে, ততক্ষণ আমরা এখান থেকে যাবো না। একথা শুনে রসুলেপাক স. মৃদু হাসলেন। হজরত সাআদ কে সান্ত্বনা দিলেন। হুকুম দিলেন, কেউ যেনো মক্কায় রাত্রি যাপন না করে। তাঁর গোলাম আবু রাফেকে বললেন, মায়মুনাকে যেনো আমি চলে যাওয়ার পরে নিয়ে আসা হয়। এবং তিনি যেনো একা একাই মক্কার বাইরে চলে আসেন। যে সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিলো, ধৈর্যের সাথে তার উপরেই স্থির থাকার, চেষ্টা করলেন তিনি স.। বিন্দুমাত্র বরখেলাফ করলেন না।

জীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকরম স. মক্কা মুকাররমা থেকে যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর চাচা হজরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা আম্মারা (তার দিকেই সম্বন্ধ করে হজরত হামযাকে আবু আম্মারা বলা হতো) তার মাতা সালমা বিনতে ওমায়য়ের এর সঙ্গে মক্কায় অবস্থান করছিলেন।

তিনি তখন রসুলেপাক স. এর পিছনে পিছনে ইয়া আম্ম ইয়া আম্ম (হে চাচা, হে চাচা) বলে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলেন। আম্মারা তাঁকে চাচা বলে সম্বোধন করেছিলেন আরবের রেওয়াজ অনুসারে। অথবা তার কারণ এ-ও হতে পারে যে, হজরত হামযা রসুলেপাক স. এর দুধভাইও ছিলেন। হজরত আলী আম্মারাকে নিয়ে এলেন। নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ্! আপন চাচাতো বোনকে মুশরিকদের মধ্যে পিতৃহীন অবস্থায় রেখে যাচ্ছেন? আমি একে আমার সাথে নিয়ে যাবো। অতঃপর হজরত আলী সাইয়্যেদা ফাতেমাকে বললেন, তোমার চাচার কন্যাকে বলো, সে যেনো হাওদার মধ্যে চলে আসে। মদীনায় আসার পর হজরত আলী, হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব এবং হজরত যায়েদ ইবনে হারেছার মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হলো। হজরত আলী বললেন, আম্মারা আমার চাচাতো বোন। আমি তাকে এনেছি। হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব বললেন, সে আমার চাচাতো বোন। তার খালা আসমা বিনতে উমায়স আমার বিবাহ বন্ধনে আছে। হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা বললেন, এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। তিনি এমন বললেন এ কারণে যে, হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা ও হজরত হামযা ছিলেন মুওয়াখাত (ভ্রাতৃত্ববন্ধনাচ্ছন্ন)। রসুলেপাক স. আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে এরকম ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ স্থাপন করে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁদের দু'জনের মধ্যে দুগ্ধসম্পর্কও ছিলো। এজন্য হজরত আম্মারাকে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী বলেছিলেন। রসুলেপাক স. হজরত জাফরের পক্ষে রায় দিয়ে বললেন, 'আল খালাতু বিমানযিলাতিল আম্মি' (খালা মায়েরই স্থলাভিষিক্ত)। হাদিসের প্রকাশ্য দিক থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বাকবিতণ্ডাটি হয়েছিলো মক্কায়। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত। ঘটনাটি প্রসঙ্গে এরকম বিবরণও এসেছে— হজরত আলী তখন বললেন, আমিই তাকে এনেছি। মক্কা থেকে এখানে আনার ওসিলা হচ্ছি আমি। আর রসুলুল্লাহ্র কন্যা আমার গৃহে, কাজেই তাকে প্রতিপালন করার বেশী হকদার আমিই। তখনই রসুলেপাক স. খালার বিষয়ে হুকুম করলেন। রসুল করীম স. এর এমতো হুকুম শুনে হজরত আলী শান্ত হলেন। তিনি স. হজরত আলীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আংতা মিন্নী ওয়া আনা মিনকা' (তুমি তো আমা থেকে আর আমি তোমা থেকে)। হজরত জাফরকে বললেন, আশবাহ্তা ওয়া খুলক্বী (তুমি আমার চরিত্র সদৃশ)। হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে বললেন, আংতা মাওলানা ওয়া আখূনা (তুমি আমার বন্ধু ও ভাই)। হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

উল্লেখিত হাদিস থেকে জানা যায়, খালা মায়ের মতো। বিশেষ করে প্রতিপালনের হক খালার বেশী। এই হাদিসের আলোকে কেউ কেউ বলে থাকেন, খালা ফুফুর উপরও অগ্রাধিকার রাখে। কেননা সে সময় সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব বিদ্যমান ছিলেন। তাছাড়া তারা এ মাসআলাও বের করে থাকেন যে,

প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পিতার নিকটজনদের থেকে মাতার নিকটজন অগ্রাধিকার পায়। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত আছে, পরে রসুলেপাক স. আম্মারার বিবাহ দিয়েছিলেন সালামা ইবনে আবু সালামার সঙ্গে, যিনি ছিলেন রসুলেপাক স. এর রাবীব। সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কোনো নারী কারও কাছে বিবাহ বসলে, সে সন্তানকে উক্ত পুরুষের বেলায় রাবীব বলা হয়। সাহাবায়ে কেরাম রসুলেপাক স. এর কাছে নিবেদন করেন তাঁকে আপনি নিজে বিবাহ করলেন না কেনো? তিনি তো আপনার চাচাতো বোন। তখন তিনি স. বলেন, সে আমার দুধ ভাই হামযার কন্যা।

উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সেটি হচ্ছে— কুরাইশরা হজরত আম্মারাকে যেতে দিলো অথচ সন্ধিনামায় লিপিবদ্ধ ছিলো, কেউ যদি আমাদের কাছ থেকে আপনার কাছে চলে যায়, তবে আপনি তাকে আমাদের কাছে ফিরেয়ে দিবেন। তাহলে সন্ধির শর্তানুসারে হজরত আম্মারাকে কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হলো না কেনো? 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে একথার জবাব দেওয়া হয়েছে এভাবে— কাফেররা তখন তাঁকে ফেরত চায়নি। শর্তটি যেনো এরকম ছিলো— তারা যদি কাউকে চায়, তবে মুসলমানগণ তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। এরকমও বলা যায় যে, আম্মারা তখন ছিলেন নিতান্ত বালিকা, অপ্রাপ্তবয়স্কা। সুতরাং তাঁর উপরে দেশত্যাগের হুকুম বর্তায় না। আরো বলা যায়, এ শর্ত প্রযোজ্য ছিলো কেবল পুরুষদের বেলায়। মেয়েদের বেলায় নয়। যদি মেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য থেকেও থাকে তাহলে পরবর্তীতে এই আয়াতের মাধ্যমে সেই শর্তটি রহিত হয়ে গিয়েছে— 'ইয়া আয়্যুহাল লাযীনা আমানূ ইযা জ্বাআকুমুল মু'মিনাতু মুহাজ্বিরাতিন ফামতাহিনু হুন্না আল্লাহু আ'লামু বিঈমানিহিন্না ফাইন আ'লিমতুমূহুন্না মু'মিনাতিন ফালা তারজ্বিউ'হুন্না ইলাল কুফ্ফার' (হে মুমিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করিয়া আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও; আল্লাহ্ তাহাদের ইমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন তবে তাহাদিগকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাইও না)(৬০:১০)।

ওমরাতুল কাযার ঘটনার সঙ্গে 'রওজাতুল আহবাব' ও 'মাআরেজুন নবুওয়াত' কিতাবদ্বয়ে আরও দু'টি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও ঘটনা দু'টি বাদশাহ্দের নিকট পত্র ও দূত প্রেরণ অধ্যায়ে ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনার সাথে উল্লেখ করাটা বেশী উপযোগী ছিলো। কিন্তু তাঁরা এ দু'টি ঘটনা সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলীর সাথে উল্লেখ করেছেন। প্রথম ঘটনা হচ্ছে— জাবালা ইবনে আয়হাম গাসসানীর নিকট পত্র প্রেরণ। সে হারেছ ইবনে আবু শামর গাসসানীর পর গাসসানের বাদশাহ্ হয়েছিলো। জীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেন, রসুলেপাক স.

এর চিঠি ও ইসলামের দাওয়াত জাবালা ইবনে আয়হামের নিকট পৌঁছলো। সে মুসলমান হয়ে গেলো। বিভিন্ন হাদিয়া, তোহফা রসুলেপাক স. এর নিকট প্রেরণ করলো। তারপর সে ইসলাম ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। পরে সে হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালে হজব্রত পালন করতে আসে। তওয়াফরত থাকা অবস্থায় হঠাৎ করে এক লম্বা ব্যক্তির পা তার লুঙ্গির উপর পড়ে গেলো। ফলে তার লুঙ্গি খুলে গেলো। রাগান্বিত হয়ে সে ওই লোকটির মুখে চপেটাঘাত করে বসলো। লোকটির নাক ফেটে গেলো। লোকটি হজরত ওমরের কাছে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করলো। হজরত ওমর জাবালাকে হুকুম দিলেন, কেসাস পালন করো, অথবা ফরিয়াদীর কাছ থেকে দায়মুক্তি গ্রহণ করো। জাবালা বললো, আপনি আমাকে কেসাস আদায় করার জন্য হুকুম দিচ্ছেন; অথচ আমি একজন বাদশাহ্। আর এ হচ্ছে, একজন সাধারণ লোক। হজরত ওমর বললেন, ইসলাম তো তোমার ও এর মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। আল্লাহ্ভীতি ব্যতীত এর উপর তোমার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। জাবালা বললো, তাহলে আমি এ ধর্ম পরিত্যাগ করবো। নাসারা হবো। হজরত ওমর বললেন, তুমি যদি এমনই করো তাহলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। জাবালা বললো, আজকের রাতটি আমাকে অবকাশ দিন। ভেবে-চিন্তে যেনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি। যখন রাত হলো, তখন সে পলায়ন করে রোম দেশে চলে গেলো। সেখানে গিয়ে সে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলো। তার পরবর্তী জীবন ছিলো মুর্তাদের জীবন। নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক।

কোনো কোনো জীবনীলেখক বর্ণনা করেছেন, জাবালা পরে ইসলাম ধর্মে ফিরে এসেছিলো এবং ইসলামের উপর থাকা অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়েছিলো। পূর্ববর্তী কৃতকর্মের জন্য সে অনুতপ্ত হয়েছিলো। তার কাছ থেকে কয়েকটি পদ্য পাওয়া যায়, যার অর্থ এরকম— সে বলে, ইসলাম ধর্মের পর আমি পুনরায় নাসারা হয়েছিলোম, ওই চপেটাঘাতের লজ্জার কারণে, যার কেসাস আদায় করার হুকুম দেওয়া হয়েছিলো, অথচ আদায় করার মধ্যে কোনো ক্ষতি ছিলো না। আফসোস; আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন। আক্ষেপ! আমি যদি রবিআ এবং মোদার গোত্রের কাছে বন্দী হয়ে যেতাম। আমি যদি শাম দেশের কোনো সাধারণ লোক হতাম, যে অন্ধ ও বধির হয়ে কওমের মধ্যেই বসে থাকে। আমি যদি মাঠে উট চরাতাম এবং ওমর যে হুকুম দিয়েছিলেন, তা যদি অস্বীকার না করতাম। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে— ফেরওয়া ইবনে আমর হাযামীর ইসলাম গ্রহণ। তিনি রোমের বাদশাহর পক্ষ থেকে বালকা অঞ্চলের আম্মানের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সঙ্গে হাদিয়া

পাঠিয়েছিলেন একটি শাদা উট, যার নাম ছিলো ফেদ্দা। একটি ঘোড়া, একটি গাধা, কিছু রেশমী কাপড়, জরীর কাবা এবং স্বর্ণ। পত্রে তিনি লিখেছিলেন, আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি। হকতায়ালার একত্ববাদ ও আপনার রেসালতের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছি। আমি জানি, আপনিই সেই সম্মানিত রসুল, যাঁর সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন মরিয়মতনয় ঈসা। রসুলেপাক স. তাঁর দূত মাসউদ ইবনে সাআদকে সমাদর করলেন। হজরত বেলালকে হুকুম দিলেন, তাকে ঘরে নিয়ে মেহমানদারী করো। তিনি স. সাগ্রহে তার হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করলেন। রেশমী কাপড়গুলো তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। শাদা উটটি দিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীককে। কাবা দান করলেন হজরত মাখযামা ইবনে নওফেলকে। ঘোড়া ও গাধাগুলো দেখাশোনার ভার দিলেন উসায়দ সায়েদীর উপর। চিঠির উত্তরও দিলেন, যার মর্মার্থ ছিলো এরকম— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র পক্ষ থেকে ফেরওয়া ইবনে আমরের নিকট। অতঃপর সমাচার এই যে, তোমার দূত আমার নিকট পৌঁছেছে। আর তুমি যে উপঢৌকনসমূহ পাঠিয়েছো, তা আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তুমি তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছো। এখন তুমি যদি সৎকর্ম করো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো, নামাজ পড়ো আর যাকাত আদায় করো, তাহলে হকতায়ালা তোমাকে সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। তারপর হজরত বেলালকে হুকুম দিলেন, দূত মাসউদ ইবনে সাআদকে পাঁচশত দিরহাম দাও এবং তাকে এগিয়ে দিয়ে এসো।

কথিত আছে, রোমের বাদশাহর কাছে যখন ফেরওয়ার ইসলাম গ্রহণের কথা পৌঁছলো, তখন বাদশাহ্ তাকে ডেকে আনলো। বললো, তুমি তো আপন ধর্ম থেকে চলে গিয়েছো, এ জন্য যাতে তোমার রাজ্য ঠিক থাকে। তুমি আপন ধর্মে ফিরে এসো, তবেই তোমার রাজ্য তোমার হাতে থাকবে। সে বললো, আমি কেমন করে প্রত্যাবর্তন করবো? আমি যখন জানতে পেলাম যে, ইনিই সত্য নবী, যাঁর আগমনের সংবাদ নবী ঈসা দিয়ে গিয়েছেন। বিষয়টি তো তোমার খুব ভালো করেই জানা আছে। তবে তুমি তোমার রাজত্বের কারণে গর্বিত।

রোমের বাদশাহ্ তাকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখলো। তারপর কয়েদখানা থেকে বের করে শূলীতে উঠিয়ে তাকে হত্যা করলো। এই রোমের বাদশাহ্ যদি সেই হেরাকলই হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য আফসোস। তাহলে মনে করা হবে যে, সেই হেরাকল নাসারা ধর্মের উপরেই কায়েম ছিলো। যেমন হাদিস শরীফে তার বর্ণনা এসেছে। তাহলে এই হেরাকলের ব্যাপারে মতভেদ করা এবং তার ইমান ছিলো এরূপ মনে করার কোনো অবকাশ আর থাকে না। নাউযুবিল্লাহ মিন শাররিদ দুনইয়া ওয়া শাররিল ফিতানি ওয়া শাররিশ শাইত্বানির রজীম' (মহান আল্লাহ্তায়ালার কাছে দুনিয়ার অকল্যাণ, ফেতনা-ফাসাদের অকল্যাণ

এবং শয়তানের অকল্যাণ থেকে পানাহ্ চাই)। ঘটনাটি 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, ওয়াকেদীর ভাষ্য থেকে জানা যায়, জাবালা ও ফেরওয়ার নিকট রসুলেপাক স. এর পত্রপ্রেরণের তারিখ অজ্ঞাত। যেহেতু বড় বড় জীবনীবিশারদগণ এ ঘটনাদ্বয় সপ্তম হিজরীর বলে উল্লেখ করেছেন। তাই আমিও এই কিতাবের সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলীর সঙ্গে ঘটনা দু'টিকে উপস্থাপন করেছি। তবে এই ধারণাও প্রবল হয় যে, এ দু'টি ঘটনা অষ্টম হিজরী বা তারও পরে সংঘটিত হয়ে থাকবে। কেননা বলা হয়ে থাকে, ওই বাদশাহর বাদশাহী হারেছ ইবনে আবু শামর গাসসানীর পরে ছিলো। আর হারেছ ইবনে আবু শামর গাসসানী সপ্তম বৎসরে মৃত্যুবরণ করেছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হিজরী অষ্টম সালের ঘটনাবলী

মশহুর জীবনীবিশেষজ্ঞগণের মতে অষ্টম হিজরী সফর মাসের প্রারম্ভে খালেদ ইবনে ওলীদ, ইবনে মুগীরা কুরাশী মাখযুমী, আমর ইবনুল আস, ইবনে ওয়ায়েল কুরাশী সাহমী এবং কাবাগৃহের চাবির রক্ষক ওছমান ইবনে তালহা আবদারী জামহী মুসলমান হয়েছিলেন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে তাঁরা সপ্তম হিজরীর শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ আবার পঞ্চম সালের কথাও বলেছেন। খালেদ ইবনে ওলীদ, সারা জীবন কুরাইশদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং বেপরওয়ারীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৌলিক সত্তার মধ্যে এমন এক গুণ ছিলো, যার কারণে ইমান ও ইসলামের প্রতি তাঁর এক ধরনের আকর্ষণও হয়তো ছিলো। সুতরাং নফসানী পর্দাসমূহ ছিন্ন করে তা থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর জন্য সময়ের ব্যাপার ছিলো মাত্র। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ নিজে বর্ণনা করেন, চিরন্তনের অভিপ্রায় যখন সন্নিবেশিত হলো, তখন ইসলামের প্রতি মহব্বত আমার অন্তরে ঢেলে দেওয়া হলো। তিনি বলেন, আমাদের এবং মোহাম্মদের সঙ্গে যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হলো, তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, কুরাইশদের শৌর্য-বীর্য, শক্তি-সামর্থ্য কোনো কিছুই তো আর বাকী রইলো না, আর আমি নাজ্জাশীর কাছেও যেতে পারব না। কেননা সে মোহাম্মদের অনুগত হয়ে গিয়েছে। আমি মনে মনে স্থির করলাম, বাদশাহ হেরাকলের নিকট গিয়ে নাসারা ধর্ম গ্রহণ করবো। তারপর মনের সাথে কথা বললাম, না। আমি আমার শহরেই থাকবো এবং অপেক্ষা করবো। দেখবো অদৃশ্যের পর্দা থেকে কী প্রকাশিত হয়। এমনি অবস্থার মধ্যে রসুলেপাক স. যখন ওমরাতুল কাযা পালনার্থে মক্কায় তশরীফ আনলেন, তখন আমি বাইরে গিয়েছিলাম। আমার ভাই ওলীদ ইবনে ওলীদ রসুলেপাক স. এর সঙ্গী হয়ে মক্কায় এসেছিলেন। তিনি

আমাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু কোথাও পেলেন না। তখন তিনি আমার নিকট একটি পত্র লিখলেন, যার বিষয়বস্তু ছিলো এরকম— আল্লাহ্‌র রসুল তোমাকে স্মরণ করেছেন। বলেছেন, খালেদ তাদের মধ্যে নেই, যাদের কাছে ইসলামের হাকীকত এখনও আচ্ছাদিত। সে যদি মুসলমান হয়ে যায় এবং তার বীরত্ব ধর্মের শক্তি সঞ্চারে ব্যয় করে তাহলে খুবই ভালো হবে। আমি তাকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দেবো। আমার ভাই চিঠিতে আরও লিখলেন, তুমি এই দৌলত প্রাপ্ত হয়ে ধন্য হও, যা তোমার থেকে পৃথক হয়েছে। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ বলেন, আমি যখন ওই চিঠিখানি পাঠ করলাম, তখন আমার মধ্যে ইসলামের প্রতি আগ্রহ ও মহব্বত প্রবল হয়ে গেলো। আমি মদীনায় উপস্থিত হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে ফেললাম। গেলাম সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছে। তাকে বললাম, হে আবু ওয়াহাব! তুমি কি দেখনি, আমি এক লোকমার অধিক কিছু রেখে যাইনি। দৌলতে মোহাম্মদীর শান-শওকত সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ রয়েছে এর মধ্যেই। চলো আমরা অতি দ্রুত রসুলুল্লাহ'র খেদমতে উপস্থিত হই। তাঁর মহিমা দেখে ধন্য হয়ে যাই। খালেদ ইবনে ওলীদ বলেন, সফওয়ান আমার বুকের উপর হাত মেরে কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করলো। বললো, কুরাইশদের মধ্য থেকে আমি ছাড়া যদি আর কোনো লোক বাকী না থাকে তবুও আমি মোহাম্মদের আনুগত্য করবো না। তারপর আমি ইকরামা ইবনে আবু জাহেলের নিকট গেলাম। তাকেও সিরাতুল মুস্তাকীমের দাওয়াত দিলাম। তিনি অস্বীকারের ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। আমি মনে মনে বললাম, মদীনায় উপস্থিত হওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। কেননা মক্কাবিজয় সম্পন্ন হলে সকলেই অক্ষম হয়ে যাবে। কোথাও পালানোর জায়গা থাকবে না। সকলেই মুসলমান হয়ে যাবে। যাহোক আমি যাদের কাছে গেলাম, একে একে তাদের সকলের কাছ থেকেই নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। তখন ওছমান ইবনে আবু তালহাকে দেখলাম। সে আমার বন্ধু ছিলো। সে আমার কথা মেনে নিলো। আমরা দুই বন্ধু মিলে মদীনাভিমুখে যাত্রা করলাম। বাদাহ নামক স্থানে আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন আমর ইবনে আসকে দেখতে পেলাম। তিনি হাবশা থেকে এসে মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন। মুসলমান হওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। তারপর আমরা সকলে মিলিত হয়ে মদীনায় পৌঁছলাম। রসুলেপাক স. যখন আমাদের আগমনের সংবাদ পেলেন তখন বললেন, এখন আল্লাহ্‌তায়ালা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রসুলেপাক স. একথা দ্বারা তাঁদের জামাতটির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। কেননা তাঁরা ছিলেন কুরাইশদের নেতৃস্থানীয়। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ বলেন, আমি যখন মদীনায় পৌঁছলাম, তখন উত্তম পোশাক পরিধান করলাম এবং রসুলেপাক স. এর দরবারে উপস্থিতির মাধ্যমে ধন্য হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম।

পথিমধ্যে আমার ভাই ওলীদের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, জলদি চলো। রসুলেপাক স. এর কাছে তোমাদের আগমনের খবর পৌঁছে গিয়েছে। তিনি তোমাদের আগমনের অপেক্ষায় আছেন। পবিত্র মজলিশে আমি যখন হাজির হলাম, তখন দূর থেকে রসুলেপাক স. আমাকে দেখতে পেয়ে মৃদু হাসলেন। নিবেদন করলাম, আসসালামু আলাইকুম ইয়া রসুলাল্লাহ। হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার সালামের জবাব দিলেন তিনি। আমি বললাম, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা রসুলুল্লাহ। তিনি বললেন, আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী হাদাকাল ইসলাম। তিনি আরও বললেন, হে খালেদ! আমি জানি তুমি বুদ্ধিমান। আর আমার আশা ছিলো, তুমি কল্যাণের পথ পাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো দেখেছেন কল্যাণের বিরুদ্ধে আমি কতোইনা শত্রুতা করেছি। এখন দোয়া করবেন হকতায়ালা যেনো এই পাপীষ্ঠকে ক্ষমা করে দেন। তিনি স. বললেন, ইসলাম সব কিছুকে মিটিয়ে দেয়। নিশ্চিহ্ন করে দেয় সকল পাপ। তারপর থেকে হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ রসুলেপাক স. এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ওফাতের পরও সর্বদাই দ্বীনের সাহায্যে সর্বোত্তম অবদান রাখেন। মুসায়লামা কাযযাব ও অন্যান্য মুর্তাদদের মূলোৎপাটন করেন। তিনি মূর্খতার যুগেও কুরাইশদের নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মাতা লুবাবা বিনতে হারেছ, যিনি রসুলুল্লাহর স্ত্রী সাইয়্যেদা মায়মুনা বিনতে হারেছার ভগ্নি ছিলেন, তিনি ফারুকে আযমের খেলাফতকালে একুশ অথবা মতান্তরে বাইশ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

হজরত আমর ইবনুল আসের ঘটনা তাঁর মুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে এভাবে— আমি আহযাবের যুদ্ধ থেকে ফিরে আমার সাথীদেরকে বললাম, আমার ধারণা হচ্ছে, মোহাম্মদ উন্নতির দিকে আছেন এবং দিনদিন ক্রমোন্নতির দিকেই চলেছেন। এটাই উপযুক্ত মনে করলাম যে, আমি নাজ্জাশীর কাছে চলে যাবো। মোহাম্মদ যদি আমাদের কাওমের উপর বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে আমি নাজ্জাশীর রাজ্যেই থেকে যাবো। আর যদি আমাদের কাওম বিজয়ী হয়, তাহলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবো। আমার সমস্ত সাথী-সঙ্গীরা আমার মতের সাথে একাত্ম হলো এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আমার সাথে সফরের সঙ্গীও হয়ে গেলো। আমি সফরের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। অবশেষে নাজ্জাশীর জন্য কিছু উপঢৌকন নিয়ে হাবশায় পৌঁছে গেলাম। সেখানেই বাস করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমর ইবনে উমাইয়া যুমায়রী রসুলেপাক স. এর দূত হয়ে নাজ্জাশীর কাছে এলেন। আমর ইবনুল আস বলেন, আমি নাজ্জাশীর কাছে গেলাম এবং তাঁর কাছ থেকে আমর ইবনে উমাইয়া যুমায়রীকে চাইলাম। উদ্দেশ্য তাকে হত্যা করে আমি কুরাইশদের কাছ থেকে বাহবা অর্জন করবো। নাজ্জাশী এ কথা শুনে নিজের

গালে চপেটাঘাত করে তওবার ভঙ্গিতে বললেন, আমি কেমন করে এমন একজন সম্মানিত ও পবিত্র ব্যক্তির দূতকে তোমার হাতে সোপর্দ করবো? যাঁর কাছে নামূসে আকবর জিবরাইল অবতরণ করেন। তিনি আল্লাহ্র সত্য রসুল। হে আমর! আমার কথা মনযোগ দিয়ে শোনো। রসুলুল্লাহ্র আনুগত্য গ্রহণ করো। একথাও জেনে রেখো, তিনি তাঁর সকল প্রতিপক্ষীয়দের উপর প্রবল হয়ে যাবেন, যেমন হজরত মুসা প্রবল হয়েছিলেন ফেরাউনের উপর। আমি নাজ্জাশীর হাতে হাত রেখে মুসলমান হয়ে গেলাম। তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসার সময় আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমার অন্যান্য সাথী-সঙ্গীদের কাছে গোপন রাখলাম। তারপর মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে খালেদ ইবনে ওলীদের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, সিরাতুলমুস্তাকীম প্রকাশ পেয়ে গেছে। মোহাম্মদ সত্য নবী। আমি মুসলমান হওয়ার জন্য যাচ্ছি। আমি বললাম, আমিও এই উদ্দেশ্যেই সেদিকে যাচ্ছি। তারপর আমরা উভয়ে মদীনায় পৌঁছে গেলাম এবং রসুলেপাক স. এর নিরাপদ আশ্রয়ে উপস্থিত হলাম। সর্বপ্রথম খালেদ কলেমা তওহীদ পাঠ করলেন। তারপর আমি। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার পবিত্র হাতখানা বাড়িয়ে দিন। আমি বায়াত হবো। তিনি স. হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, হে আমর! ব্যাপার কী? হাত গুটিয়ে নিলে কেনো? বললাম, আমি একটি শর্ত করে নিতে চাই। তিনি বললেন, কী শর্ত? বললাম, আমার গোনাহসমূহ যেনো মাফ হয়। তিনি স. বললেন, হে আমর? তোমার কি জানা নেই যে, ইমান পূর্ববর্তী সকল গোনাহকে মিটিয়ে দেয়? দারুল কুফুর থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসা ও হজ্ব করা এসব আমলও অতীতের সমস্ত পাপকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

ওছমান ইবনে তালহার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে তেমন কিছু বর্ণিত হয়নি। শুধু এতোটুকু বর্ণনা পাওয়া যায় যে, মক্কাবিজয়ের দিন রসুলেপাক স. তাঁর কাছ থেকে কাবাগৃহের চাবি নিয়েছিলেন। অতঃপর যখন এরশাদ হলো, 'ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তুআদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে) (৪:৫৮) তখন ওই চাবি তাঁর কাছেই ফিরিয়ে দেন। বলেন, ইবনে তালহা! নাও, এখন থেকে এই কুঞ্জিকা তোমার কাছেই থাকবে। যুলুম অত্যাচার ছাড়া এ কুঞ্জিকা কারো হস্তগত হবে না। ওছমান ইবনে তালহা রসুলেপাক স. এর ওফাত পর্যন্ত মদীনায় ছিলেন। পরে তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। ৪৩ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়।

কাদীদ অঞ্চলের দিকে গালেব লাইছীর অভিযান

এ বৎসর গালেব ইবনে আবদুল্লাহ্ লাইছীকে কবীলা বনী মুলাওবেহের দিকে পাঠানো হয়। যখন রাত্রির আগমন ঘটলো তখন মুসলিমবাহিনী তাঁদের উটগুলোকে ঘিরে নিয়ে চললেন। হঠাৎ করে তাঁদের পিছনে দেখা গেলো একটি দল। তারা খুব নিকটে এসে পড়েছে। মাঝখানে রয়েছে কেবল একটি নালা। তাদের মোকাবিলা করার অবস্থাও তখন নেই। এমন সময় আল্লাহ্তায়ালা পানির একটি স্রোত প্রবাহিত করলেন। নালাটি কানায় কানায় ভরে গেলো। তারা নালা পার হওয়ার সাহস করলো না। অথচ ইতিপূর্বে সেখানে কোনো বৃষ্টি বা পানির স্রোত ছিলো না। তাঁরা সহীহ্ সালামতে মদীনায় ফিরে এলেন।

ফাদাক অভিযান

এ বৎসরই গালেব ইবনে আবদুল্লাহ্ লাইছীকে ফাদাক অঞ্চলের দিকে প্রেরণ করা হলো। সেখানকার কাফেরদের মূলোৎপাটন করাই ছিলো তাঁর এই অভিযানের উদ্দেশ্য। বর্ণিত আছে, এই বাহিনীর একজন যোদ্ধা ছিলেন উমামা ইবনে যায়েদ। তিনি নুহায়ক নামক এক কাফেরকে ধাওয়া করেলেন। তার পিছনে ঘোড়া চালিয়ে গেলেন। জীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেন, ওসামা যখন তার কাছে গেলেন এবং তাকে হত্যা করার জন্য তলোয়ার উত্তোলন করলেন, তখন সে বলে উঠলো, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'। হজরত উসামা তার ইমান আনার বিষয়টিকে আত্মরক্ষার কৌশল মনে করে তার কথার গুরুত্ব দিলেন না এবং তাকে তিনি হত্যা করে ফেললেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর সব শুনে রসুলেপাক স. হজরত উসামাকে খুব তিরস্কার করলেন। বললেন 'হাললা শাক্কাক্বতা কালবাহু' (তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে)? কাশ্শাফ রচয়িতা বলেছেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নাজিল হয়েছিলো আয়াতখানি— 'ইয়া আয়্যুহাল লাযীনা আমানূ ইযা দ্বারাবতুম ফী সাবীল্লিহি ফাতাবায়্যানূ' (হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে যাত্রা করিবে তখন পরীক্ষা করিয়া লইবে)(৪ঃ৯৪)। 'বায়যাবী'র কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এরকম ঘটনা হজরত মেকদাদ থেকেও সংঘটিত হয়েছিলো। ঘটনাটি এরকম— হজরত মেকদাদ এক ব্যক্তির কাছে পৌছলেন, যে বকরী চরাচ্ছিলো। তিনি তাকে কতল করার জন্য উদ্যত হলেন। সে বলে উঠলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' তৎসত্ত্বেও হজরত মেকদাদ তাকে হত্যা করে ফেললেন। বললেন, সে তার জান ও মাল রক্ষা করার জন্য কলেমা পাঠ করেছে। কোনো কোনো জীবনীবিশারদ গালেব ইবনে আবদুল্লাহ লাইছীর এই ঘটনা সপ্তম হিজরীতে

বাতনে নাখলার নিকটবর্তী স্থান মানফাআতে সংঘটিত হয়েছিলো বলে বর্ণনা করেছেন। এ বৎসর আরও অনেক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিলো, যার ধারাবাহিকতা মুতার যুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো।

মুতার অভিযান

মুতা একটি জায়গার নাম। স্থানটি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে দুই মঞ্জিল দূরে বালকার নিকটে অবস্থিত। মুতার অভিযান খুবই বিখ্যাত। কেননা এই অভিযানে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিলো। এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ এরকম— রসুলেপাক স. বসরার বাদশাহ্র নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করলেন। পত্রটি বাদশাহ্র নিকট পৌছানোর দায়িত্ব দিলেন হারেছ ইবনে ওমায়র এ্যদীকে। হজরত হারেছ রওয়ানা হলেন। মুতা নামক স্থানে পৌছে কায়সারের আমীর-ওমরাদের অন্যতম ব্যক্তি শারজীল ইবনে ওমরের সামনে পড়লেন। সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় যাচ্ছো? তিনি বললেন, শামদেশে। শারজীল বললো, মনে হচ্ছে তুমি মোহাম্মদী দূত। তিনি বললেন, হাঁ। আমি রসুলুল্লাহ্র দূত। শারজীল হজরত হারেছকে শহীদ করে দিলো। এঘটনার পূর্বে রসুলেপাক স. এর কোনো দূতকেই কেউ হত্যা করেনি। দূত হত্যা করার বিধানও নেই। দূতগণের নিরাপত্তা ছিলো স্বীকৃত। একবার মুসায়লামা কায্যাবের দূত রসুলেপাক স. এর দরবারে এসেছিলো। সে পবিত্র দরবারে এসে বড়ই গোস্তাখীমূলক এবং কুফুরী কথাবার্তা বলেছিলো। কিন্তু রসুলেপাক স. তাকে হত্যা করেননি। বলেছিলেন, তুমি যদি দূত না হতে, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলতাম।

হজরত হারেছের শাহাদতের সংবাদ শুনে রসুলেপাক স. খুব ব্যথিত হলেন। সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, দুশমনদেরকে মূলোৎপাটিত করতে হবে। প্রস্তুত হও। যাত্রা শুরু করো। জারাফ নামক স্থানে প্রায় তিন হাজার সাহাবী একত্রিত হলেন। রসুলেপাক স. সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি যায়েদ ইবনে হারেছাকে তোমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলাম। সে যদি শহীদ হয়ে যায়, তাহলে জাফর ইবনে আবু তালেব সেনাপতি হবে। জাফরও যদি শাহাদত বরণ করে তবে সেনাপতি হবে আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা। সে শহীদ হলে মুসলমানরা যাকে চায়, তাকে সেনাপতি বানিয়ে নিবে। সেনাপতি বানানোর এই যে ক্রমধারা বর্ণনা করা হলো, তা ওহী বা এলহামের মাধ্যমে হয়েছিলো। অথবা আল্লাহ্তায়ালা আপন যবানে হককে রসুলুল্লাহর যবানে জারী করে দিয়েছিলেন। বাস্তবে সেইরূপই হয়েছিলো। হজরত ইয়াকুব যেমন আপন পুত্রদের বলেছিলেন, 'ওয়া আখাফু আইঁ ইয়া'কুলাহুয যীবু' (আমি আশংকা করি তাহাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিবে) (১২:১৩)। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, এক ইহুদী রসুলেপাক স. এর পবিত্র

মজলিশে উপস্থিত ছিলো। সে বললো, হে আবুল কাসেম! নবুওয়াতের দাবীতে আপনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে যে সকল সেনাপতির নাম আপনি নিয়েছেন, তাঁরা সকলেই নিহত হবেন। কেননা বনী ইসরাইলের নবীগণ যখন কোনো লশকরকে দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করতেন, আর সে যুদ্ধে একশ' ব্যক্তিকেও যদি এভাবে সেনাপতি নিযুক্ত করা হতো, তাহলে তারা সকলেই যুদ্ধে নিহত হয়ে যেতেন। তারপর সেই ইহুদী হজরত যায়েদের কাছে গেলো। বললো, হে যায়েদ! আমি তোমার কাছে শর্ত করছি, মোহাম্মদ যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে তুমি এই সফর থেকে ফিরতে পারবে না। হজরত যায়েদ বললেন, আমিও তোমাকে বলছি যে, তিনি সত্যবাদী ও হক নবী। এ কথা বিলকুল সুস্পষ্ট যে, তিনি স. এরূপ নির্দেশনা ইসলামী বাহিনীর মধ্যে শৃংখলা রক্ষা করার জন্যই দিয়েছেন। আর তাঁর 'যদি' শব্দটি সাবধানতা। অকাট্যতা না বুঝানোর জন্যই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর ইহুদীর কথাগুলো ছিলো নিছক বাচালতা। অন্তরের অপরিচ্ছন্নতা এবং দুষ্টমতিত্বের এবং বাতেনী আদাওয়াতের ভিত্তিতেই সে ওই কথাগুলো বলেছিলো। ইহুদীদের সাধারণ স্বভাব এরকমই। এভাবে কথা বলার মাধ্যমে হজরত যায়েদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করা ও মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেওয়াই ছিলো তার উদ্দেশ্যে। জীবনীপ্রণেতাগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. যখন হজরত যায়েদকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন, তখন হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা আশা করিনি যে, আপনি সেনাপতি নির্ধারণে আমার উপর যায়েদকে প্রাধান্য দিবেন। তিনি স. বললেন, হে জাফর! যাও এবং আল্লাহ্র রসুলের হুকুমের আনুগত্য করো। তুমি জানো না, তোমার কল্যাণ কিসে নিহিত। এ ঘটনাটি ওই ঘটনার মতো, যা দ্বিতীয় বৎসরে হজরত উসামা ইবনে যায়েদের বেলায় ঘটেছিলো। তখন তার পিতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। হজরত উসামা ইবনে যায়েদকে যুদ্ধের সেনাপতি বানিয়ে পাঠানো হয়েছিলো, যাতে তিনি তাঁর পিতার শাহাদতের প্রতিশোধ নিতে পারেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুককে তাঁর সঙ্গী করে পাঠানো হয়েছিলো। লোকেরা এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করে বলতে লাগলো, এর মধ্যে কোনো হেকমত নিহিত আছে নিশ্চয়ই। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বড় বড় ব্যক্তিকে হজরত উসামার অধীন করে দেওয়া হয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালার সত্তা চিরন্তন। উসামা সেনাপতি হওয়ার যোগ্য। তার পিতাও এ কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলো। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাকেই নিযুক্ত করা হয়েছে। উসামা ইবনে যায়েদের প্রতি রসুলুল্লাহ্র এহেন গুরুত্ব দেওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে— তাঁর পিতা হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা রসুলেপাক স. এর পালিত পুত্র ছিলেন। লোকেরা তাঁকে মোহাম্মদের পুত্র বলে ডাকতো। তাই

কোরআন পাকে নাযিল হলো, 'উদউ'হুম লিআবাইহিম' (তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহাদের পিতৃ-পরিচয়ে)। রসুলেপাক স. হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তিনি প্রথম সারির অগ্রবর্তী মুহাজির ছিলেন। আর হজরত উসামা ইবনে যায়েদ সম্পর্কে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সাহাবীগণ তাঁকে 'হিববে রসুল' বলে অভিহিত করতেন। হিব্ব শব্দের অর্থ প্রেমাস্পদ। অর্থাৎ তিনি ছিলেন রসুল স. এর মাহবুব বা প্রিয়পাত্র। কেননা রসুলেপাক স. হজরত উসামা ও হজরত হাসান ইবনে আলীকে নিজের কোলে বসিয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমি এদের দু'জনকে মহব্বত করি, তুমিও এদেরকে তোমার মাহবুব বানাও। তিনি স. আরও বলেছেন, 'মান আহাব্বাল্লাহা ওয়া রসূলিহী ফালইউহিব উসামাতা' (যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ভালবাসা পেতে চায়, সে যেন উসামাকে ভালবাসে)। হজরত ওমর যখন হজরত উসামার নিজের পুত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের চেয়ে হজরত উসামার ভাতা বৃদ্ধি করেছিলেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর পিতাকে বলেছিলেন, আপনি এমন করলেন কেনো? আমার চেয়ে তাকে যে বেশী মর্যাদা দিলেন। অথচ এমন কোনো উপস্থিতির স্থান নেই, যেখানে আমার চেয়ে তার উপস্থিতি ছিলো বেশী। হজরত ওমর ফারুক বললেন, সে রসুলুল্লাহর কাছে তোমার চেয়ে বেশী প্রিয় ছিলো। একথার অর্থ— রসুলের প্রিয়জনকে নিজের প্রিয়জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছি। রসুলুল্লাহ্ স. এর মহব্বত ও গুরুত্ব হজরত যায়েদ ও হজরত উসামার উপর এমন ছিলো যে, তিনি স. হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব, হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত ওমরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণকে তাঁদের অধীনে যুদ্ধে প্রেরণ করতেন। মাটি থেকে কুড়িয়ে উর্ধ্বে উত্তোলন করার মতোই ছিলো তাঁদের অবস্থা। যেমন ছিলো হজরত আদমের বুযুর্গী, যে বুযুর্গীর কারণে তাঁকে ফেরেশতাদের সেজদার পাত্র বানানো হয়েছিলো। হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের উপরে হজরত উসামার এমতো শ্রেষ্ঠত্বদান যদি ওহীর মাধ্যমে হয়ে থাকে, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আর যদি ইজতেহাদের ভিত্তিতে এরকম করা হয়ে থাকে, তবুও তা ছিলো যথার্থ। অবশ্যই এর মধ্যে ছিলো কোনো মহৎ উদ্দেশ্য। পীর-মুর্শিদগণ মুরিদের আখলাক সুন্দর ও সুসজ্জিত করার জন্য এবং নফসানিয়াত দূর করার জন্য এই নীতিই প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন রসুলেপাক স. হজরত জাফরকে আপন এরশাদের মাধ্যমে ইশারা করেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি আল্লাহ্র রসুলের হুকুমের আনুগত্য করো, তুমি তো জানো না তোমার কল্যাণ কিসে নিহিত। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'ছুম্মা লা ইয়াযিদূ ফী আনফুসিহিম হারাজ্বাম মিম্মা ক্বাদ্বায়তা ওয়া ইউসাল্লিমূ তাসলীমা' (অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে উহা মানিয়া লয়)(৪ঃ৬৫)। কোনো মূর্খ ও সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন

ব্যক্তি যেনো এরকম ধারণা না করে বসে যে, রসুলেপাক স. এর এমতো সিদ্ধান্ত মানবীয় স্বভাব অনুসারে হয়েছিলো। অবশ্য তাঁর মূল সত্তার মধ্যে মানবীয় স্বভাবের কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকতেও পারে। কিন্তু তা সাধারণ মানুষের অধিকার দলন প্রবৃত্তির মতো নয়। নিশ্চয়ই নয়।

রসুলেপাক স. শাদা পতাকা প্রস্তুত করিয়ে হজরত যায়েদ ইবনে হারেছার হাতে দিলেন এবং তাঁকে ছানিয়াতুল বেদা নামক স্থান পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন, যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হারেছ ইবনে আমর ও সেখানকার সকল লোককে ইসলামের দাওয়াত দিয়ো। তারা যদি দাওয়াত কবুল করে নেয় তাহলে তো ভালোই। আর যদি কবুল না করে, তা হলে আল্লাহ্তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কোরো। যোদ্ধারা সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি স. তাদের জন্য এই বলে দোয়া করলেন   আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে দুশমনদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন। গনিমত লাভের মাধ্যমে নিরাপদে গৃহে ফিরিয়ে আনুন। ইবনে রাওয়াহা নিবেদন করলেন, কিন্তু আমি রহীম করীম আল্লাহ্র কাছে মাগফেরাত ও শাহাদতের আকাংখা করি। হজরত যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণনা করেন, আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার সাহায্য-সহযোগিতার ছায়াতলে অবস্থান করছিলাম। এতিমদের প্রতিপালনের দিক দিয়ে তার চেয়ে অগ্রণী আর কাউকে দেখিনি। তিনি যখন মুতার দিকে যাত্রা করলেন, তখন আমিও তার সওয়ারীর পিছনে বসে তাঁর সহযাত্রী হলাম। সফরের রাত্রিসমূহের মধ্য থেকে কোনো এক রাত্রে তিনি কতিপয় শের পাঠ করলেন, যার মধ্যে ছিলো শাহাদতের সৌরভ। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বৎস! আল্লাহ্তায়ালা যদি আমার জন্য শাহাদত নির্ধারণ করেন, তবে তোমার কী ক্ষতি হবে? শহীদ হতে পারলে তো আমি পূর্বের ও পরের এবং দুনিয়ার পংকিলতা ও বিপদাপদ থেকে নাজাত পেয়ে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ করবো এবং তাঁর পবিত্র পরিমণ্ডলে পরম প্রশান্তিতে থাকতে পারবো। তারপর তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে অবতরণ করে নামাজে মশগুল হয়ে গেলেন এবং দোয়া-মুনাজাত করতে লাগলেন। ইবাদত শেষ করে আমাকে বললেন, হে বৎস! আমার প্রবল ধারণা, আল্লাহ্তায়ালা আমার দোয়া কবুল করেছেন। তিনি আমাকে শাহাদতের সৌভাগ্য দিয়ে ধন্য করবেন।

হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা ইসলামী বাহিনীর সঙ্গে মুতার দিকে রওয়ানা দিলেন এবং দুশমনরা তাঁর গতিবিধির সংবাদ জানতে পারলো। ওদিকে শারজীল এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করলো। প্রতিটি অগ্রযাত্রীকে সামনে রওয়ানা করিয়ে দিলো। মুসলমানগণ মাআন নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। মাআন শামদেশের একটি জায়গার নাম। এখানে পৌঁছার পর মুসলমানগণ দুশনদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে জানতে পারলেন। শারজীল তার ভাই শাদুসকে পঞ্চাশ ব্যক্তির সাথে

সামনে পাঠিয়ে দিলো। মুসলমানগণ টের পেয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে ফেললেন এবং যুদ্ধ করে শাদুসকে হত্যা করলেন। তার সাথী-সঙ্গীরা সেখান থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলো। শারজীল এ সংবাদ পাওয়া মাত্র মৃতবৎ হয়ে গেলো এবং কিল্লায় প্রবেশ করে তার অপর ভাইকে হেরাকলের নিকট সাহায্য চেয়ে প্রেরণ করলো। হেরাকাল এক বিশাল বাহিনী দিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হলো। আরবের বিভিন্ন গোত্রের মুশরিকরাও বিরাট সংখ্যক বাহিনী প্রস্তুত করলো। দুশমনদের সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষ অতিক্রম করলো। মুসলমানগণ যখন এ সম্পর্কে সংবাদ পেলেন, তখন তাঁরা উক্ত মঞ্জিলে অবস্থান করে পরামর্শে বসে গেলেন। লোকেরা বললো, আমরা যুদ্ধের রাস্তার চিত্র তুলে ধরে রসুলুল্লাহর কাছে পত্র লিখবো। তিনি স. হয় আমাদেরকে ফিরিয়ে নিবেন, না হয় আমাদের সাহায্যের জন্য আরও সৈন্য প্রেরণ করবেন। বীর যোদ্ধাদের মধ্য থেকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বললেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা তো সওয়াব প্রাপ্তির আশা নিয়ে আপন আপন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছো। এখন এটাকে অপছন্দ করছো কেনো? শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে ভয় পাচ্ছো কেনো? হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা শাহাদতের চূড়ান্ত আশাবাদী ছিলেন। তিনি বললেন, আমরা অতীতে সৈন্যবাহিনীর আধিক্যের কারণে যুদ্ধে জয় লাভ করিনি। বরং এ হচ্ছে ওই দ্বীনের শক্তি যে দ্বীনকে আমরা বদরের দিন প্রকাশ করেছিলাম। তোমরা তো জানোই তখন আমাদের সৈন্যসংখ্যা কতো ছিলো। আর হকতায়ালার কুদরত আমাদেরকে কীভাবে সাহায্য করেছিলো। এখন আমাদের সামনে দু'টি সুন্দর জিনিস উপস্থিত। হয় আমরা বিজয় লাভ করবো, না হয় শাহাদত বরণ করবো। আমরা যদি বিজয় লাভ করি তাহলে তো ভালো। অন্যথায় শাহাদতের সৌভাগ্য অর্জন করে জান্নাতে আমাদের অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে মিলিত হবো, যারা পূর্বেই শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহার এমতো ভাষণ শুনে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পেলো এবং তাঁরা দুশমনদের দিকে যাত্রা করলেন। এক পর্যায়ে মুতার প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। হজরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, আমি মুতার যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। মুশরিকদের বাহিনী যখন দৃষ্টিগোচর হলো তখন তাদেরকে হাতিয়ার, ঘোড়া ও রেশমী কাপড়ে এরকম ভাবে সুসজ্জিত দেখা গেলো যে, আমার চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম হলো। ছাবেত ইবনে আহরাম আনসারী বললেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি তো বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলে না। যদি থাকতে, তাহলে দেখতে পেতে হকতায়ালা এত অল্পসংখ্যক সৈন্যকে কীভাবে সাহায্য করেছিলেন। যাহোক মুতার প্রান্তরে উভয় বাহিনী যখন মুখোমুখি হলো এবং কাতার করে দাঁড়িয়ে গেলো তখন হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা পতাকা দোলাতে দোলাতে ময়দানে উপস্থিত হলেন এবং মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। তীর বিদ্ধ হতে হতে এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। তারপর হজরত জাফর

ইবনে আবু তালেব পতাকা ধারণ করলেন। ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। পায়ে হেঁটে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ঘোড়াকে তাঁবুতে ফিরিয়ে দিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর ডান হাত খানা কেটে মাটিতে পড়ে গেলো। পতাকা বাম হাতে তুলে নিলেন তিনি এবং এভাবেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন। তারপর বাম হাতও কেটে পড়ে গেলো। তখন কাটা হাতের দু'বাহু দিয়ে চেপে ধরলেন পতাকা। এমতাবস্থায় কোনো এক শত্রু সৈন্য তাঁর কোমরের উপর তলোয়ারের আঘাত করলো আর অমনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে তিনি যমীনের উপর পড়ে গেলেন। আল্লাহ্! আল্লাহ্! হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, আমি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। শহীদদের লাশের মধ্যে হজরত জাফরের লাশ তালাশ করলাম। দেখলাম, তাঁর দেহে রয়েছে পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্ন। একটি আঘাতও তাঁর দেহের পিছনের দিকে ছিলো না। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর দেহের অর্ধাংশের উপরে আশিটি জখম পাওয়া গিয়েছিলো। সামনের দিকে দু'টি আঘাত ছিলো তলোয়ারের। আর বর্শার আঘাত ছিলো সত্তরটি। বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, আমি তাঁর দেহের উপরের দিকে তীরের নব্বইটি আঘাত দেখতে পেয়েছিলাম।

তারপর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করলেন এবং 'রিজয' (সমরগাঁথা) পড়তে পড়তে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। যার সারমর্ম ছিলো 'তুমি কেনো শাহাদতের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহান্বিত নও? আর বেহেশতকে কেনো অপছন্দ করছো'? জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ তিন দিনের অনাহারী ছিলেন। তাঁর চাচাতো ভাই তাঁকে সামান্য গোশত দিয়েছিলেন। তিনি ওই গোশত চিবুচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই হজরত জাফরের শাহাদতের খবর এলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখের খাবার থুথু করে ফেলে দিয়ে বললেন, হে নফস! জাফর তো দুনিয়া থেকে চলে গেলেন; আর তুমি এখনও দুনিয়ার প্রেমে মশগুল? হে আমার প্রবৃত্তি! তুমি যদি স্ত্রীদের প্রতি আকৃষ্ট থেকে থাকো, তাহলে আমি এ মুহূর্তে আমার স্ত্রীগণকে তালাক দিলাম। আর যদি গোলামদের প্রতি আকর্ষণ থাকে, তাহলে আমার গোলামসমূহকে আযাদ করে দিলাম। আমি যে পরিমাণ বাগ-বাগিচার মালিক হয়েছি সবগুলোই আল্লাহ্র রসুলের জন্য উৎসর্গ করলাম। এখন তো তোমার কিছুই নেই। তাহলে শাহাদতের প্রতি তুমি আকৃষ্ট হচ্ছো না কেনো? তা থেকে পলায়ন করছো কেনো? আল্লাহ্র নামের উপর চলে এসো। তারপর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। নির্দেশ ছিলো, যদি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও শহীদ হয়ে যায়, তবে মুসলমানগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করবে। হজরত ছাবেত ইবনে আহরাম আনসারী এগিয়ে এসে পতাকাটি ধরে বললেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা কোনো একজনকে সেনাপতি নির্বাচন করো। সকলে

বললো, তুমিই এ দায়িত্ব নাও। তিনি বললেন, আমি এ পদের উপযুক্ত নই। অতঃপর সকলে হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে সেনাপতি নির্বাচন করলেন। সেনাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ বললেন, হে ছাবেত! তুমি এ কাজের জন্য আমার চেয়ে বেশী উপযোগী। কেননা তুমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলে। বয়সের দিক দিয়েও তুমি আমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত। তিনি বললেন, হে খালেদ! বীরত্ব প্রকাশ তোমার কাজ। এ পতাকা আমি তোমার জন্য ধরে রেখেছিলাম। হজরত খালেদ পতাকা ধারণ করলেন। জীবনীকারগণ বর্ণনা করেন, হজরত খালেদের পালা যখন এলো, তখন মুসলমানগণ পর্যুদস্ত প্রায়। মুশরিকরা তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুসলমানদের মধ্য থেকে অনেকেই শহীদ হয়েছিলেন। হজরত খালেদ মুশরিকদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালালেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না। হজরত কুতনা ইবনে আমের এসে উচ্চকণ্ঠে বললেন, হে মুসলমানগণ! পলায়ন করে মৃত্যু বরণ করার চেয়ে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। মুসলমানদের হুঁশ ফিরে এলো। তাঁরা রুখে দাঁড়ালেন। নব উদ্যমে আক্রমণ শুরু করলেন। কেউ কেউ বলেন, তখনও মুসলমানরা পরাস্ত হননি। কিন্তু তাঁরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। যাহোক হজরত খালেদ প্রচণ্ড হামলা চালালেন। পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে লড়াই চালিয়ে গেলেন। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা উল্লেখ করেছেন, হাকেম বলেছেন, হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ হামলা করে মুশরিকদের এক বড় দলকে ধরাশায়ী করলেন। অনেক গনিমত অর্জন করলেন। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, সেদিন আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙেছিলো। শেষদিকে আমার হাতে সফহা ইয়ামানী তলোয়ারটি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। হজরত খালেদ অতীতে মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে উহুদ এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশ নিয়ে যে ভুল করেছিলেন, তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করলেন। এমনও হতে পারে যে, তিনি মুতার যুদ্ধে যে নয়টি তলোয়ার ভেঙেছিলেন, তা ছিলো মুশরিকদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করার সমপরিমাণ। অর্থাৎ মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি নয়টি তলোয়ার ভেঙেছিলেন। অবশেষে 'খালেদুন সাইফুন মিন সুয়ুফিল্লাহ' (খালেদ আল্লাহ্‌র তরবারীসমূহের একটি তরবারী) এই ফযীলত তাঁর নসীবে হয়েছিলো।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত খালেদ সেদিন অভূতপূর্ব দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। যখন রাত ঘনিয়ে এলো তখন দু'পক্ষই হাত গুটিয়ে নিলো। সকালে হজরত খালেদ পতাকা ধারণ করলেন এবং বাহিনীকে নতুনভাবে সজ্জিত করলেন। অগ্রবর্তী দলকে পিছনের দল বানালেন আর পিছনের দলকে করে দিলেন অগ্রবর্তীদল। ডান দলকে বামে ও বাম দলকে ডানে স্থাপন করলেন। কাফের বাহিনী যখন এ অবস্থা দেখলো, তখন তারা মনে করলো, মুসলমানদেরকে

সাহায্য করার জন্য বুঝি নতুন সৈন্য আনা হয়েছে। তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। তারা পলায়নের পথ ধরলো। হজরত খালেদ তাদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং বীরত্বের পুরাপুরি হক আদায় করলেন। জীবনীকারগণ বলেন, সেখানে একটি কেল্লা ছিলো। ইসলামী বাহিনী মুতার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় কেল্লাবাসীরা একজন মুসলমানকে শহীদ করেছিলো। ওই কেল্লাটি বিজিত হলো। তাদের একদল লোক সেখানে লুকিয়ে ছিলো। তাদের সকলকেই হত্যা করা হলো। সেদিন হজরত খালেদের সকল তৎপরতাই ছিলো অনন্য প্রশংসনীয়। 'ওয়া কানা সা'য়ুহু মাশকূরা' (প্রশংসনীয় ছিলো তার প্রচেষ্টা)। হাদিস শরীফে এসেছে, মুসলমানদের সেনাপতি যখন কাফের বাহিনীর সাথে মুকাবেলার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, তখন রসুলেপাক স. ছিলেন মসজিদে নববীতে। সে সময় তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে পর্দা উঠে গিয়েছিলো। মুতায় যুদ্ধরত সকলের অবস্থা তিনি স্বচক্ষে এভাবে প্রত্যক্ষ করছিলেন, যেনো তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সবকিছু অবলোকন করে যাচ্ছেন। তিনি ধারা বর্ণনার ন্যায় বলে যাচ্ছিলেন, এই যে যায়েদ ইবনে হারেছা পতাকা ধারণ করলো এবং সে শহীদ হয়ে গেলো। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করলো। আর সেও শহীদ হয়ে গেলো। তিনি তাঁর বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিলো। তারপর তিনিই বললেন, এখন আল্লাহ্র তলোয়ারসমূহের মধ্য থেকে একটি তলোয়ার (খালেদ ইবনে ওলীদ) পতাকা ধারণ করেছে এবং তার হাতেই বিজয় অর্জিত হবে। সে দিন থেকেই হজরত খালেদের উপাধি হলো সাইফুল্লাহ্।

বর্ণিত আছে, হজরত যায়েদ ইবনে হারেছার কাছে শয়তান এসে দুনিয়াকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেখিয়েছিলো। শয়তান চেয়েছিলো তাঁর অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত ঢেলে দিতে। তখন তিনি শয়তানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এটি এমন একটি মুহূর্ত, যে মুহূর্তে একজন কামেল মুমিনের দায়িত্ব হয় তার অন্তকরণে ইমান মজবুত করে রাখা। শয়তান! তুই এসেছিস আমার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত ঢেলে দিতে। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। রসুলেপাক স. তাঁর জন্য দোয়া খায়ের করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমরা যায়েদের জন্য ইস্তেগফার করো। নিঃসন্দেহে সে বেহেশতে প্রবেশ করেছে। বেহেশতের বাগিচায় সে ভ্রমণ করছে। তারপর হজরত জাফর পতাকা উঠালেন। শয়তান তাঁর কাছেও কুমন্ত্রণা নিয়ে হাজির হলো। তিনি শয়তানকে পাত্তাই দিলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। অবশেষে শাহাদত বরণ করলেন। রসুলেপাক স. তাঁর জন্য দোয়া-খায়ের করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও দোয়া করার জন্য বলেছিলেন। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, শয়তান মৃত্যুকালে মানুষকে বিশেষভাবে ওয়াসওয়াসা দিয়ে থাকে এবং ইহলৌকিক জীবনের ভালোবাসায় নিমগ্ন করে রাখতে চেষ্টা করে। তাই মরণ পথের যাত্রীদের

তালীম ও তলকীনের জন্য হাদিস শরীফে এই দোয়া করার কথা এসেছে— 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আঊযুবিকা আন আমূতা ফী সাবীলিকা মুদবিরাওঁ ওয়া আঈঁ ইয়াতাহাব্বাত্মনিইয়াশ শাইত্বানু ইনদাল মাওত।' (হে আল্লাহ! তোমার পথে পৃষ্ঠপ্রদর্শনাবস্থায় মৃত্যুবরণ করা থেকে তোমার আশ্রয় যাচনা করি এবং মৃত্যুকালে শয়তান যেনো আমাকে ছিনিয়ে নিতে না পারে)। রসুলেপাক স. হজরত জাফর সম্পর্কে বলেছিলেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে ইয়াকুত অথবা মোতির দু'টি ডানা দান করেছেন। আল্লাহ্র রাস্তায় কর্তিত হয়ে পড়া বাহুদ্বয়ের মাধ্যমে সে বেহেশতে উড়ে বেড়াচ্ছে। হজরত আবু হুরায়রা বলেছেন, রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, আমি জাফর ইবনে আবু তালেবকে দেখেছি যে, সে বেহেশতে ফেরেশতাদের সঙ্গে উড়ে বেড়াচ্ছে। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, জাফর ইবেন আবু তালেব মালায়ে আ'লায় ফেরেশতাদের সঙ্গে আমার কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলো। দেখলাম, তার দু'টি ডানা রক্তে রঙিন হয়ে আছে। রসুলেপাক স. আরও বলেছেন, রাত্রিবেলা আমি বেহেশতে প্রবেশ করলাম। জাফর আমার কাছে এলো। এরপর দেখলাম, সে ফেরেশতাদের সঙ্গে উড়ছে। এক বর্ণনায় জিবরাইল ও মিকাইলের সঙ্গে উড়ে বেড়ানোর কথা এসেছে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে হজরত সুহায়ল থেকে বর্ণিত হয়েছে, ডানা ও পাখা সম্বন্ধে যে বর্ণনা এসেছে, তার দ্বারা পাখির ডানা ও পাখা বুঝানো হয়নি। কেননা মানুষের সুরত (আকৃতি) হচ্ছে সব চেয়ে সুন্দর, সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ। কাজেই পাখির সুরতে রূপান্তরিত হওয়া সমীচীন নয়। সুতরাং এখানে ডানা ও পাখা বলতে বুঝতে হবে ফেরেশতাদের সিফত ও রূহানী শক্তি, যা তাঁকে দান করা হয়েছিলো। কোরানুল করীমে উল্লেখিত আয়াত 'ওয়াদ্বমুম ইয়াদাকা ইলা জ্বানাহিকা' (তোমার হাত তোমার বগলে রাখ) (২০ঃ২২) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলেমগণ বলেছেন, এখানে বাহুর অর্থ ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য, যা মুশাহাদা ব্যতীত উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং একথা অনির্ভরযোগ্য নয় যে, জিবরাইলের ছয়শ ডানা ছিলো। আর দুই ডানার অধিক দিয়ে তাঁর উড়ে যাওয়াটাও অবাস্তব নয়। যেহেতু এ বিষয়ে কোনো আছার ও খবরে ওয়াহেদ বর্ণিত হয়নি। হাকীকতের উপর আলোচনা ও কথোপকথন ছাড়াই বিষয়টির উপর ইমান আনতে হবে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, আলেমগণ যেমন দাবী করেছেন, তেমন দাবীর পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো দলিল নেই। কাজেই হাদিসটি প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহার করতে কোনো বাধা নেই। সুরতে বাশারিয়া (মানবীয় আকৃতি) পরিপূর্ণ ও সর্বাধিক সম্মানিত হওয়া খবরের জাহেরী অর্থের পরিপন্থী নয়। কেননা ডানা থাকলেও সুরতে বাশারিয়া বিদ্যমান থাকতে পারে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সহীহ্ বোখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমি যখন জাফরের কবরে তাহিয়া পাঠ করতাম, তখন বলতাম, আস্সালামু আলাইকা ইয়া যাল জ্বানাহাইন' (হে দু' ডানাবিশিষ্ট! তোমার উপর সালাম)। সহীহ্ বোখারীতে সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, আহলে মুতার শহীদ হওয়ার সংবাদ যখন রসুল করীম স. এর নিকট পৌঁছলো, তখন তিনি মসজিদে এতো চিন্তান্বিত হয়ে বসেছিলেন যে, দুশ্চিন্তার চিহ্ন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! জাফরের স্ত্রীগণ তাঁর জন্য কাঁদছে। তিনি স. বললেন, তুমি যাও। তাদেরকে কাঁদতে মানা করো। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্থান করলো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো, আল্লাহর কসম! তাঁরা কিছুতেই কান্না থামাচ্ছে না। তিনি স. বললেন, তাদের মুখে মাটি চাপা দাও। মানা করার পরও যেহেতু তাঁরা কান্না থামাচ্ছিলেন না তাই রসুলেপাক স. তখন ওরকম করে বলেছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, তাঁদের ক্রন্দন ছিলো বিলাপের ক্রন্দন। বিলাপ করা ছাড়া ক্রন্দন করা নিষেধ নয়। কেউ কেউ বলেন, তাদের ক্রন্দন বিলাপ ছাড়াই ছিলো। তৎসত্ত্বেও নিষেধ করা হয়েছিলো তানযিহির কারণে। কেননা মানা করার পরও ক্রন্দনরত থাকার অর্থ তাহরিমী হওয়া, যা সাহাবীগণের বেলায় ছিলো সুদূর পরাহত। সে কারণেই হয়তো উক্ত ব্যক্তির মানা করার পরও স্ত্রীগণ ক্রন্দনরত ছিলেন। অথবা তাঁরা এই মনে করেছিলো যে, তিনি নিজের থেকেই মানা করে যাচ্ছেন। তাঁরা হয়তো একথা মনে করেননি যে, তিনি সংবাদ নিয়ে এসেছেন রসুলেপাক স. এর দূত হয়ে। অথবা তাঁরা অধিক দুঃখ-মসিবতের কারণে নিজেদেরকে সংবরণ করতে পারছিলেন না। আল্লামা কুরতুবী তাঁর 'মাজমাউল বাহরাইন' পুস্তকে এরকম উল্লেখ করেছেন। উহুদ যুদ্ধে হজরত হামযার শাহাদতে যে ক্রন্দন করা হয়েছিলো, সে বিষয়েও সেখানে কিছু আলোচনা এসেছে।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. হজরত জাফরের পরিবার পরিজনকে তিন দিন পর্যন্ত শোকপালনের অনুমতি দিয়েছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি স. হজরত জাফরের বাড়িতে গেলেন। বললেন, আজকের দিনের পর আমার ভায়ের জন্য তোমরা আর ক্রন্দন কোরো না। অতঃপর তিনি স. হজরত জাফরের সন্তানদের মনকে তুষ্ট করলেন এই বলে— মোহাম্মদ ইবনে জাফর তো আমার চাচার মতোই দেখতে। আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফরের আখলাক আমার চাচার আখলাকের মতো। তারপর তিনি স. তাঁদের জন্য দোয়া খায়ের করলেন।

শোকপালনের বিধান

ফেকাহ্র মাসআলায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিন দিনের অধিক শোক পালন করা উচিত নয়। হাদিস শরীফে এসেছে, যে মেয়েলোক তার স্বামীর মৃত্যু ছাড়া অন্য কারও জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করে, তার উপর আল্লাহ্তায়ালার লানত পতিত হয়। হজরত জাফরের স্ত্রী হজরত আসমা বিনতে উমায়স বলেছেন, যখন আমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ রসুলেপাক স. এর কাছে পৌছলো, তখন তিনি আমার বাড়িতে এসে বললেন, জাফরের সন্তানেরা কোথায়? আমি তাদেরকে নিয়ে রসুলেপাক স. এর সামনে উপস্থিত হলাম। তিনি স. তাদের শরীরের ঘ্রাণ নিলেন। চুম্বন করলেন এবং কোলে তুলে নিলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি জাফরের ব্যাপারে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। সে শহীদ হয়ে গিয়েছে। আমি আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। কাঁদতে শুরু করলাম। মেয়েলোকেরা আমার পার্শ্বে জমা হয়ে গেলো। তিনি স. বললেন, আসমা! কেঁদো না। অশোভন কথা বোলো না। বুকের উপর হাত মেরো না। একথা বলে তিনি স. সাইয়্যেদা ফাতেমাতুয যোহরার কাছে গেলেন। দেখলেন, হজরত ফাতেমা 'হে চাচা' 'হে চাচা' বলে ক্রন্দন করছেন। তিনি স. বললেন. আলী মুর্তজা তো জাফরের মতোই। ক্রন্দনকারিণীরা ক্রন্দন করুক। তিনি স. নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। বললেন, জাফরের পরিবারের জন্য খানা পাঠিয়ে দাও। মুসিবত তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। তারা খানা পাকানোর সুযোগ পাচ্ছে না।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা যখন মদীনায় ফিরে এলেন, তখন সাধারণ লোকেরা বিদ্রুপ করতে লাগলো। বললো, তোমরা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসেছো। এমনকি মুতায় অংশগ্রহণকারী বড় বড় সাহাবীগণও ঘরে বসে থাকতেন। মানুষের বিদ্রুপ ও নিন্দার কারণে তাঁরা ঘর থেকে বের হতে পারছিলেন না। রসুলেপাক স. তখন বললেন, এসকল লোক কখনও পলায়নকারী হতে পারে না। বারংবার হামলাকারী তারা। তারা তো দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জনকারী। সুতরাং তাদের লজ্জা পাবার কিছু নেই। তাদের আপন আপন ঘর থেকে বের হয়ে আসা উচিত। মোটকথা মুতার যুদ্ধ খুব কঠিন যুদ্ধ ছিলো। আল্লাহ্র রহমতে হজরত খালেদের অপরিসীম দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও বীরত্বের কারণে এ যুদ্ধে বিজয় সূচিত হয়েছিলো।

যাতুস্সালাসিলের দিকে আমর ইবনুল আসের অভিযান

এ বৎসরেই যাতুস্সালাসিলের দিকে হজরত আমর ইবনুল আসের অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানকে যাতুস্সালাসিল নাম দেওয়ার কারণ ছিলো এরকম— মুশরিকরা এই যুদ্ধে পরস্পরে এমনভাবে মিলিত হয়েছিলো, যেমন

জিঞ্জিরের একাংশ মিলিত হয়ে থাকে অপরাংশের সাথে। কেউ কেউ বলেন, সালাসিল ছিলো একটি ঝর্ণার নাম। ঝর্ণাটি ছিলো ওরাদিউলকোরা নামক বস্তির পিছনে। স্থানটি মদীনা থেকে দশ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিলো ৮ম হিজরীর জমাদিউল উখরা মাসে। কেউ কেউ বলেন, সপ্তম হিজরীতে। ইবনে আবু খালেদ 'সহীহুত তারিখ' পুস্তকে শেষোক্ত মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিলো মুতার যুদ্ধের পর। তবে ইবনে ইসহাক বলেছেন, মুতার যুদ্ধের পূর্বে। এ যুদ্ধের কারণ ছিলো এরকম— রসুলেপাক স. এর নিকট খবর এলো, কাযাআ, বিলিয্য ও বনুল কায়ন প্রমুখ গোত্র একত্রিত হয়ে লুটতরাজ করার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। রসুলেপাক স. হজরত আমর ইবনুল আসকে ডেকে বললেন, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাও। আমি ইচ্ছা করছি একটি বাহিনীর সাথে তোমাকে প্রেরণ করবো, যাতে করে গনিমত হাসিল করে প্রত্যাবর্তন করতে পারো। হজরত আমর ইবনুল আস বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি তো দুনিয়ার সম্পদপ্রাপ্তির আশায় মুসলমান হইনি। তিনি স. বললেন, 'নে'মাল মালুস সালেহু ওয়ার রিজালুস সালেহু' (নেক মাল ও নেক ব্যক্তি কতোই না ভালো)। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আমর ইবনুল আস বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! দীর্ঘদিন পর্যন্ত তো আমি দ্বীনের বাকল নিয়ে কাজ করেছি, এখন আমি চাই দ্বীনের ভিত্তির কাজে কিছু খেদমত করতে। আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করতে চাই। তিনি স. বললেন, অপেক্ষা করো। ইনশাআল্লাহ্ আমি সে সুযোগ করে দিতে পারবো। এক পর্যায়ে তিনি স. কথিত গোত্রগুলোর একত্রিত হওয়ার সংবাদ পেলেন। প্রথমে একটি শাদা পতাকা প্রস্তুত করলেন এবং তৈরী করলেন তিনশত মুসলমানের একটি সুসংঘবদ্ধ দল। ওই দলে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে নিলেন সর্ব হজরত সাঈদ ইবনে যায়েদ, সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আমের ইবনে রবীআ, হাবীব ইবনে সেনান রুমী, সায়দ ইবনে হুযায়ের ও সাআদ ইবনে উবাদা প্রমুখ। হজরত আমর ইবনুল আসকে বানালেন সেনাপতি। তিনি যখন মদীনা থেকে বের হলেন এবং মুশরিকদের দিকে ধাবিত হলেন তখন শুনলেন, আরও কিছু বেদুইন একত্রিত হয়েছে এবং তারা দুশমনদের সাথে যোগ দিয়েছে। তাদের লোকসংখ্যা ছিলো অত্যধিক। সে তুলনায় মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো অপ্রতুল। হজরত আমর ইবনুল আস আরো অধিক সৈন্য চেয়ে রসুলেপাক স. এর কাছে দূত পাঠালেন। তিনি স. তাঁদের সাহায্যার্থে আর একটি দল প্রস্তুত করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত সিদ্দীকে আকবর ও হজরত ফারুকে আজম। দলনেতা বানালেন হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্‌কে। বিদায়কালে তিনি স. তাঁকে নসিহত করে বললেন, তোমরা যখন এক স্থানে মিলিত হয়ে যাবে, তখন সকল বিষয়ে একমত

থেকো। মতভেদকে প্রশ্রয় দিয়ো না। সাহায্যকারী দল হজরত আমর ইবনুল আসের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলো। নামাজের সময় হলো। হজরত আমর ইবনুল আস হজরত আবু উবায়দাকে বললেন, আপনি আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন। সুতরাং আপনি আমার আনুগত্য করুন। আমার পশ্চাতে নামাজ আদায় করুন। হজরত আবু উবায়দা বললেন, প্রথম দলের নেতৃত্ব আপনার। আর এই দলটির আমীর তো আমি। আমর ইবনুল আস আশাহত হলেন। হজরত আবু উবায়দার মনে পড়ে গেলো রসুলেপাক স. এর নির্দেশের কথা। তিনি বিরোধিতা পরিহার করলেন। হজরত আমর ইবনুল আসের পশ্চাতেই নামাজ আদায় করলেন। প্রকাশ থাকে যে, সেনাপতির ক্ষেত্রে একথাটি ওয়াজিব নয় যে, সেনাপতিই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁকেই নামাজের ইমামতী করতে হবে। বরং নামাজের ক্ষেত্রে এটা জরুরী যে, অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিই ইমামতী করবেন। যিনি অন্যাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হবেন। হবেন সর্বাধিক শুদ্ধ কোরআন পাঠকারী। সর্বাধিক পরহেজগারীও তাঁর জন্য জরুরী। এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সকলের জন্য অত্যাবশ্যক ছিলো হজরত আবু বকর সিদ্দীকের ইমামতিতে নামাজ আদায় করা। কিন্তু হজরত আমর ইবনুল আস দাবী করলেন, তিনি যেহেতু আমীর তাই তিনিই ইমামতীর হকদার। অপরপক্ষে হজরত আবু উবায়দাও আমীর ছিলেন। তিনি তার প্রতিবাদ করলেন। অবশেষে রসুলেপাক স. এর নসীহতের কথা স্মরণে এলে তিনি মতভেদ ভুলে গেলেন। সর্ববিষয়ে ঐকমত্য প্রদর্শন করলেন। হজরত আবু উবায়দা ছিলেন শিষ্ট স্বভাবসম্পন্ন। তিনি বললেন, হে আমর! বিনম্র হোন। কঠোরতা করবেন না। রসুলুল্লাহ্ বিদায়কালে মতপার্থক্য না করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন হে আমর— আপনি যদি আমার বিরোধিতা করেন, তবুও আমি আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলবো না।

বর্ণিত আছে, দুশমনরা যখন নিকটবর্তী হলো, তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়লো। ঠাণ্ডার কারণে মুসলমানদের হাত পা জমে যাচ্ছিলো। তাঁরা আগুন জ্বালাতে চাইলেন। কিন্তু হজরত আমর ইবনুল আস বাধা দিলেন। সৈন্যবাহিনী তাঁর এমতো আচরণে দুঃখিত হলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের কাছে অভিযোগ উপস্থাপন করলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক হজরত আমর ইবনুল আসের কাছে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। হজরত আমর ইবনুল আস বললেন, যে আগুন জ্বালাবে, আমি তাকে ওই আগুনে নিক্ষেপ করবো। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, হযরত ফারুকে আজম হজরত আমরের এহেন আচরণের বিরোধিতা করলেন এবং তাঁকে সাবধান করলেন। হজরত আমর ইবনুল আস তখন বললেন, হে ওমর! আপনি এখন আমার অধীনস্থ। কাজেই আমার নির্দেশ পালন করুন। হজরত সিদ্দীকে আকবর বললেন, ওমর! ওকে ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ্‌র রসুল তাকে আমাদের উপর আমীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন এ কারণে যে, সে যুদ্ধের

কলাকৌশলে অধিকতর অভিজ্ঞ। আমাদেরকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে কাজ করতে হবে। রসুলুল্লাহ্র নির্দেশ পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্র রসুলের নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে প্রভুত কল্যাণ। হাদিস শরীফে অবশ্য এসকলের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু ছিলো এরকমই।

এবার সকলেই একতাবদ্ধ হয়ে কাফেরদের দিকে রওয়ানা হলেন। ওই সকল গোত্রের কিছু কিছু লোক আপন আপন বাড়িঘর খালি করে আগেই পালিয়ে গেলো। আর কিছু লোক যুদ্ধ করে পরাজিত হলো। অন্যরাও অন্য লোকালয়ের দিকে সরে গেলো। হজরত আমর ইবনুল আস কয়েকদিন এখানে অবস্থান করলেন। বিভিন্ন দিকে আরোহী সৈন্য পাঠাতে লাগলেন। বিভিন্ন দিক থেকে তারা বকরী ও উট ধরে এনে জবেহ করে খেতেন। এ অভিযানে এমন গনিমত হাসিল হয়নি, যা বন্টন করা যেতে পারে। অবশেষে সকলেই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে। 'মাআরেজুন নবুওয়াত' পুস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে, হজরত আবু উবায়দা তাঁর বাহিনী নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের শহরে প্রবেশ করলেন। সেখানে অনেক চতুষ্পদ প্রাণী তাঁদের হস্তগত হলো এবং ওগুলো নিয়ে তাঁরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, প্রত্যাবর্তনকালে এক রাত্রে হজরত আমর ইবনুল আসের স্বপ্নদোষ হলো। আবহাওয়া ছিলো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তাঁর সাথীদেরকে বললেন, আমার তো এই অবস্থা। এখন গোসল করলে আমি নির্ঘাত মারা যাবো। তিনি সামান্য পানি আনালেন। তা দিয়ে এস্তেনজা ও অজু সারলেন। তারপর তায়াম্মুম করে ইসলামী বাহিনীর ইমামতী করে নামাজ পড়ালেন। এ ঘটনাটি অবশ্য বর্ণনার দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। সম্ভবতঃ তখন পর্যন্ত হজরত আমর ইবনুল আসের শরীয়তের আহকাম সম্পর্কিত সম্পূর্ণ জ্ঞান ও এলেম অর্জন করার সুযোগ হয়ে উঠেনি। নতুবা জীবনহানির আশংকার ক্ষেত্রে তো শুধু তায়াম্মুমই যথেষ্ট। অজুর প্রয়োজন নেই। তাছাড়া যেখানে হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুকের মতো শ্রেষ্ঠ সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস না করে শুধু নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে ইবাদত করাটাও তো বৈধ ছিলো না। কেননা যুদ্ধবিষয়ক জ্ঞান এক জিনিস, আর শরীয়তের আহকামের এলেম অন্য জিনিস।

রসুলেপাক স. এর নিকট যখন হজরত আবু উবায়দা এবং হজরত আমর ইবনুল আসের পারস্পরিক কথোপকথন, হজরত আবু উবায়দার আনুগত্য এবং হজরত আমর ইবনুল আসের কঠোরতার বিষয়ের সংবাদ পৌছলো, তখন তিনি স. বললেন, রাহিমাল্লাহু আবা উবায়দাতা (আল্লাহ্তায়ালা আবু উবায়দাকে রহম করুন)। আর হজরত আমর ইবনুল আসের জানাবতের কথা জানতে পেরে মৃদু হেসে বললেন, তার বিষয়ে তোমরা চিন্তা করো; দ্যাখো, সে কীভাবে সংকট থেকে

উত্তীর্ণ হয়েছে? আগুন জ্বালানোর বিষয়ে মানা করার কথা যখন উঠলো, তখন হজরত আমর ইবনুল আস বললেন, আমি আগুন জ্বালাতে মানা করেছিলাম একারণে যে, যদি আগুন জ্বালানো হয় তাহলে মুশরিকরা আমাদের লোকসংখ্যার স্বল্পতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাবে।

হজরত আমর ইবনুল আস যখন যাতুস্‌সালাসিল অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তাঁর মধ্যে এক ধরনের গৌরববোধ সৃষ্টি হলো। ভাবতে লাগলেন, রসুলুল্লাহ্ স. তাঁকে এমন এক দলের আমীর বানিয়েছেন, যার মধ্যে ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুকের মতো শ্রেষ্ঠ সাহাবী। তাই তিনি মনে করলেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর দরবারে তাঁর মর্যাদা সর্বাধিক। তাঁর এহেন ধারণার সঠিকতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তিনি রসুলে করীম স. এর কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? তিনি স. বললেন, আয়েশা সিদ্দীকা। তিনি বললেন, আমি পুরুষদের বিষয়ে প্রশ্ন করছি। তিনি স. বললেন, তার পিতা। হজরত আমর বললেন, তাঁর পরে কে? তিনি স. বললেন, ওমর। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, অতঃপর কে? তিনি স. এবার কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন। তারপর হজরত আমর এই মনে করে চুপ হয়ে গেলেন যে, না জানি তাঁর নাম সকলের শেষে বলা হয়। রসুলেপাক স. এর জবাবের মাধ্যমে তাঁর অযথার্থ ধারণার দুর্গ ভেঙে গেলো। এই ঘটনাদৃষ্টে বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁকে আমীর বানানো হয়েছিলো তাঁর মনোরঞ্জনার্থে। কোনো কোনো হাদিসে হজরত আমর ইবনুল আসের প্রশংসার বর্ণনা করা হয়েছে, আস্‌লামান নাসু ওয়া আমানা আমর ইবনুল আস (লোকেরা তো মুসলমান হয়েছে আর আমর ইবনুল আস ইমান এনেছে)। এখানে একথার অর্থ এমন হতে পারে যে, 'নাস' বা লোকেরা বলতে তাঁর নিকটাত্মীয়দের কথা বলা হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

খাবাত অভিযান

এ বৎসরই হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্‌কে তিনশ' আনসার ও মুহাজির সাহাবী সহযোগে জুহায়না গোত্রের দিকে প্রেরণ করা হয়। বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থে এরকম বর্ণনা এসেছে। তবে নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে, ওই বাহিনীতে তিনশ'র অধিক সৈন্য ছিলো। আর এ অভিযানে তাঁকেই আমীর বানানো হয়েছিলো। এ বাহিনীতে হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাবও ছিলেন। জুহায়না জনপদ ও মদীনার ব্যবধান ছিলো পাঁচ দিনের পথের দূরত্বের সমান। এই অভিযানকে সারিয়াতুল খাবাত ও সারিয়ায়ে সীফুল বাহরও বলা হয়। বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া পাতাকে খাবাত বলা হয়। রসুলেপাক স. এই বাহিনীকে যাত্রার

প্রাক্কালে এক থলে খেজুর দিয়েছিলেন। ওগুলো খরচ হয়ে যাওয়ার পর সাহাবীগণ গাছ থেকে পাতা পেড়ে খেয়েছিলেন। যার কারণে সাহাবায়ে কেরামের ঠোঁটসমূহ ফুলে গিয়ে উটের ঠোঁটের মতো হয়ে গিয়েছিলো। এক বর্ণনায় আছে, সাহাবীগণ গাছের পাতা পানিতে ভিজিয়ে আহার করতেন। এতে করে বুঝা যায়, গাছের পাতাগুলো ছিলো শুকনো। হজরত আবু উবায়দা হুকুম দিয়েছিলেন, সৈন্যদের কাছে যা কিছু আছে, তা একত্রিত করা হোক। সবকিছু মিলে দু'মজদুরের বহনযোগ্য পরিমাণের খাবার জড়ো করা গেলো। ওই খাদ্য থেকে অল্প অল্প করে দৈনিক খাবার হিসেবে কিছু কিছু দেওয়া হতে লাগলো। এক পর্যায়ে সব ফুরিয়ে গেলো। একটি খেজুরের অধিক কেউই পেতেন না। তারপর শুরু হলো গাছের পাতা খাওয়ার পালা। এ কারণেই এই অভিযানের নাম সারিয়াতুল খাবাত। আরেকটি নাম সীফুল বাহর। 'সীফ' শব্দের অর্থ সমুদ্রের কিনারা। এ অভিযানের বিস্তৃতি হয়েছিলো সমুদ্রের কিনারা পর্যন্ত। একারণেই নামকরণ করা হয় সীফুল বাহর। অভিযান কার্যকর হয়েছিলো রজব মাসের আট তারিখে। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'শরহে বোখারী'তে লিখেছেন, এ অভিযান ৮ম হিজরীতে হয়েছিলো। কথাটি প্রশংসিত নয়। কেননা সহীহ্ বোখারীতেই হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিলো কুরাইশদের কাফেলাসমূহকে তটস্থ করার উদ্দেশ্যে। তাই বিষয়টি অষ্টম হিজরী হতে পারে না। কেননা সে সময়ে কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধি প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সুতরাং বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিলো ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বে।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে শায়েখুল ইসলাম ইবনুল ইরাকী থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ অভিযান হয়েছিলো মক্কাবিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরীর রমজান মাসে কুরাইশদের সঙ্গে কৃত সন্ধি ভঙ্গের পর। তাই যদি হয়, তবে অষ্টম হিজরীতে তা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। জীবনীপ্রণেতাগণ বলেছেন, এই অভিযানে কাফেরদের সঙ্গে কোনো মোকাবিলা হয়নি। সাহাবীগণ বিনা বাধায় অভিযান থেকে ফিরে এসেছিলেন।

এই অভিযানে ঘটেছিলো একটি বিস্ময়কর ঘটনা, যা বোখারী ও মুসলিমে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমরা সারিয়াতুল খাবাতে জেহাদের জন্য গিয়েছিলাম। সেনাপতি ছিলেন আবু উবায়দা। সেখানে আমরা কঠিন খাদ্যসংকটে পড়ি। অকস্মাৎ সাগরের একটি মৃত মৎস্য কিনারায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেলো। এতো বড় মাছ আমরা কখনও দেখিনি। মাছটির নাম ছিলো আম্বর। আমরা পনেরো দিন ব্যাপী মাছটি খেয়েছিলাম। হজরত আবু উবায়দা ওই মাছের একটি হাড় খাড়া করেছিলেন। দেখা গেলো, তার নীচ দিয়ে একজন সওয়ারী অনায়াসে চলে যেতে পারে। আমরা যখন

রসুলেপাক স. এর দরবারে পৌঁছলাম, তখন ওই বিষয়ের আলোচনা উঠলো। তিনি সব শুনে বললেন, ওটা ছিলো ওই রিযিক যা আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছিলেন। যদি বাকী থেকে থাকে, তাহলে তা আমাকেও দিতে পারো। আমরা ওই মাছের গোশতের কিছু অংশ তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি তা আহার করলেন। এক বর্ণনায় আছে, মাছটি পাহাড়ের ন্যায় বিশাল ছিলো। অপর এক বর্ণনায় আছে, মাছটি ছিলো টিলার মতো বড় আর তার নাম ছিলো আম্বর। ওই মাছের চামড়া দিয়ে ঢাল তৈয়ার করা হয়। যে হাড়টির কথা বলা হলো তা ছিলো পাঁজরের হাড়। বর্ণিত আছে, যোদ্ধাদের মধ্যে একজন ছিলেন দীর্ঘদেহী। তিনি পালান খাটানো উটের পিঠে আরোহণ করে সে পাঁজরের হাড়টির নিচ দিয়ে অনায়াসে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর মাথা হাড়ের সঙ্গে সামান্য লেগেছিলো। সহীহ্ মুসলিম এবং মসনদে ইমাম আহমদে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু উবায়দা হুকুম দিয়েছিলেন মাছটির চোখের কোটরের মধ্যে বসতে। তখন চোখের গর্তের বৃত্তে তেরোজন লোকের সংকুলান হয়েছিলো।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে দু'টি অভিযানের কথা বলা হয়েছে। একটি অভিযান মাহারেবে নজদের ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত হয়েছিলো ৮ম হিজরীর শাবান মাসে। তাদের সঙ্গে ছিলো পনেরো জন যোদ্ধা। তারা গাতফান গোত্রকে উচ্ছেদ করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা যাদেরকে নাগালের মধ্যে পেয়েছিলেন তাদেরকেই হত্যা করেছিলেন। পেয়েছিলেন আরো অনেক বন্দী। একশ' উট ও দু'শ' বকরী। সফরটি ছিলো পনেরো দিনের। অপর অভিযানটিও হজরত আবু কাতাদার নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছিলো। এটি পরিচালিত হয়েছিলো আযাম নামক জনপদের দিকে। ওই অভিযানে মুহলেম ইবনে জুছামা নামক একজন সাহাবী অংশ নিয়েছিলেন। সেখানকার আমের আয়ইয়াত নামের এক লোক তাঁর সামনে এলে তিনি তাকে হত্যা করেন। বিস্তারিত বর্ণনা এরকম— রসুলেপাক স. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার নেতৃত্বে আযাম নামক জনপদের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। স্থানটি ছিলো মদীনা থেকে এক বরীদ দূরত্বে। এই অভিযানে মুহলিম ইবনে জুছামাও ছিলেন। আমের ইবনে আয়ইয়াত নামক এক ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে সালাম দিলো। সাহাবীগণ তাকে অমুসলমান মনে করলেন। তাই তাঁরা তার সালামের জবাব দিলেন না। মুহলিম অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করে ফেললেন। এই ঘটনা শুনে রসুলেপাক স. তাঁকে তিরস্কার করলেন। বললেন, তুমি একজন মুসলমানকে কেনো হত্যা করেছো? তিনি বললেন, সে তো মৃত্যুর ভয়ে ইসলাম প্রকাশ করেছিলো। সে তো প্রকৃত মুসলমান নয়। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি তার হৃদয় চিরে পরীক্ষা করলে না কেনো? তাহলে তো তার নিয়ত ও এরাদা সম্পর্কে জানতে পারতে। তিনি স. আরও বললেন, মানুষের জিহ্বা হচ্ছে দূত। সে অন্তরের মুখপাত্ররূপে কাজ করে

থাকে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো— 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজীনা আমানূ ইজা দ্বারাবতুম ফী সাবীলিল্লাহি ফাতাবায়্যানূ ওয়ালা তাকুলূ লিমান আলক্বা ইলাইকুমুস সালামা লাসতা মু'মিনান তাবতাগূনা আ'রাদ্বাল হায়াতিদ্ দুনইয়া। (হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা করিবে তখন পরীক্ষা করিয়া লইবে এবং কেহ তোমাদিগকে সালাম করিলে ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্খায় বলিও না, তুমি মু'মিন নহ)। হজরত মুহলিম এসে রসুলেপাক স. এর সামনে নতজানু হয়ে বসে বললেন, এ অধমের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। তিনি স. যেহেতু তাঁর ওই কৃতকর্মের কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাই বললেন, 'লা গাফারাল্লাহু লাকা ওয়া লা আফাল্লাহু আনকা' (আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা না করুন)। মুহলিম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তিনি তাঁর পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা চোখের পানি মুছতে লাগলেন। অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলো। অপর এক বিবরণে আছে, সাতদিন পর তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো। তাঁকে যখন দাফন করা হলো, তখন যমীন তাঁর লাশ গ্রহণ করলো না। লাশ মাটির উপরে উঠে এলো। তিন বার তাঁকে দাফন করা হলো। প্রতি বারই লাশ মাটির উপরে চলে এলো। অবশেষে তাঁর লাশকে দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে দেওয়া হলো। এই সংবাদ শুনে রসুলেপাক স. বললেন, মুহলিমকে যমীন গ্রহণ করছে না। তার চেয়েও খারাপ লোককে যমীন গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা এরূপ ঘটনার মাধ্যমে তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চান।

'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে হজরত আবু কাতাদার এই অভিযান মক্কাবিজয়ের পূর্বে পরিচালিত হয়েছিলো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে আরও বর্ণনা করা হয়েছে, রসুলেপাক স. এর ৮ম হিজরীতে রমজান মাসে মক্কাভিমুখে যাত্রা করার পূর্বে আবু কাতাদা আনসারীকে আযাম কবীলার দিকে প্রেরণ করা হয়েছিলো। তখন কেউ কেউ মনে করলো, তিনি স. বুঝি সেদিকেই যাত্রা করবেন। মক্কার দিকে হয়তো তিনি স. যাবেন না। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এর পরেই এই অভিযানের সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারপর শুরু হয়েছে মক্কাবিজয়ের বর্ণনা। এই গ্রন্থে আবু কাতাদার বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে মক্কাবিজয়ের পূর্বে। ওই বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায়, মুহলিম তিন ব্যক্তির নাম ছিলো। যিনি আমের ইবনে আয়ইয়াতকে হত্যা করেছিলেন, তিনি ছিলেন অন্য মুহলিম। ওয়াল্লাহু আ'লাম। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে আরও একটি অভিযানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যাকে আবুল আওজার অভিযান বলা হয়। অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিলো ৭ম হিজরীর যিলহজ মাসে বনী সুলায়ম জনবসতির দিকে। ওই বাহিনীটি ছিলো পঞ্চাশজনের। তাদেরকে কাফেররা চতুর্দিক থেকে ঘিরে আক্রমণ করেছিলো এবং তাঁদের অধিকাংশকে

কাফেররা শহীদ করে দিয়েছিলো। শহীদদের মধ্যে ইবনে আবুল আউজাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। পরে তাঁকে উঠিয়ে রসুলে স. এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

মক্কাবিজয়

হিজরতের ৮ম বৎসরের ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম ঘটনা হচ্ছে মক্কাবিজয়। এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য বিজয়, যে বিজয় সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে— 'ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাতহাম মুবীনা' (নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়)(৪৮ঃ১)। যদিও মুফাস্‌সেরীনে কেরামের একটি দল এই মত পোষণ করেছেন যে, 'ফাতহে মুবীন' মানে হুদায়বিয়ার সন্ধি— যা ছিলো বিজয়সমূহের দ্বার উন্মোচনকারী। মূলতঃ মক্কাবিজয় হচ্ছে বৃহত্তম বিজয়। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা এই বিজয়ের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে প্রবল করে দিয়েছেন। তাঁর রসুলকে বিজয়ী করেছেন। তাঁর সৈন্যদেরকে পরাক্রমশালী বানিয়েছেন। হেরেমেপাককে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান (বালাদে আমীন) আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর পবিত্র ঘরকে মুশরিকদের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব স.কে এমনভাবে বিজয়ী করলেন যা দেখে সমস্ত আসমান ও যমীনবাসী মুবারকবাদ দিতে শুরু করলো।

আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের লোকেরা অপেক্ষমান ছিলো, রসুলেপাক স. কবে তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসবেন? কবে এই সম্মানিত নগরীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করবেন। তাহলে তারাও দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সকল জাল ছিন্ন করে এই নতুন ধর্মমতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। অবশেষে তাদের অপেক্ষার পালা শেষ হলো। বিরাট সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয় যখন এসে গেলো, তখন বিভিন্ন দিক থেকে মানুষ দৌড়ে এসে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করলো। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কালামে উল্লেখ করেছেন— 'ইজা জ্বাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু- ওয়া রাআইতান্নাসা ইয়াদখুলূনা ফী দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজ্বা- ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু ইন্নাহু কানা তাও্ওয়াবা' (যখন আসিবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও, তিনি তো তওবা কবুলকারী)(১১১ঃ১-৩)। এই সুরার মধ্যে রয়েছে দ্বীনের পূর্ণতা, সন্দেহ নিরসন এবং সত্য ও বিশ্বাসের নূর উদ্ভাসিত হওয়ার ইঙ্গিত। মক্কাবিজয়ের পর মুশরিকদের পলায়ন করার কোনো জায়গা রইলো না। আশ্রয় গ্রহণের উপায় তারা আর পেলো না। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক ইসলামে প্রবেশ করতে তারা বাধ্য হলো। ওই দিনই কিছু কিছু লোকের ইসলাম পাকা পোক্ত হলো এবং

তাদের অন্তরের বিশ্বাসের আলামতসমূহ প্রকাশ পেলো। আবার কিছু লোকের বেলায় তা হলো না। পবিত্র আয়াতে কারীমা— 'কুল ইয়াওমাল ফাতহি লা ইয়ানফাউল্ লাজীনা কাফারূ ঈমানুহুম ওয়ালাহুম ইউনযারূন (বল, ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান আনয়ন উহাদের কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না)(৩২ঃ২৯)। সেই দিকেই ইশারা করেছে। এই আয়াতের মাধ্যমে এই বিষয়টিই বুঝানো হয়েছে যে, এই দিনে ইমান আনয়ন করাতে কোনো লাভ নেই। কেননা তা মকবুল হবে না। এ মাসআলাটির সমাধানকল্পে আলেমগণ বলেছেন, এ দিবসটির মাধ্যমে কোনো লাভ হবে না ওই সকল লোকের, যারা কাফের— যারা এ বিজয়ের দিন নিহত হয়েছে এবং অবস্থার চাপে যারা ইমান এনেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ইয়াওমুল ফাতহে' দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা কিয়ামতের দিন কাফেরদের মুকাবিলায় মুসলমানদেরকে সাহায্য করা হবে এবং মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে ফয়সালা করা হবে। 'ফাতাহ' শব্দের অর্থ ন্যায়বিচারের মাধ্যমে ফয়সালা করা। যেমন আল্লাহ্তায়ালার কালামে আছে— 'রব্বানা ইফতাহ বাইনানা ওয়া বাইনা ক্বাওমিনা বিল হাক্বক্বি ওয়া আংতা খইরুল ফাতিহীন' (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী)(৭ঃ৮৯)। মহামহিম প্রভুপালক প্রদত্ত এই মহাদান ও বিজয় প্রকাশের কারণ ছিলো মূলতঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি। ওই সন্ধিনামার অন্যতম শর্ত ছিলো, উভয়পক্ষ একে অপরের মিত্রগোত্রদেরকে আক্রমণ করবে না। যে কোনো গোত্র দুইপক্ষের যে কোনো একপক্ষ অবলম্বন করতে পারবে। কেউ চাইলে কুরাইশদের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে পারবে। আবার কেউ চাইলে রসুলুল্লাহর সাথেও অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে পারবে। বনী খাযাআ গোত্র প্রথম থেকেই রসুলেপাক স. এর প্রতি আকৃষ্ট ছিলো, যদিও তারা তখনও ইমান আনয়ন করেনি। বনী বকর ও বনী খাযাআ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে মূর্খতার যুগ থেকেই শত্রুতা ছিলো। পরস্পরে তারা অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করেছিলো। তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহের মাঝখানে যখন রসুলেপাক স. এর আবির্ভাব ঘটলো, তখন তারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার মতো ফুরসতটুকুও পেলো না। হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তারা রসুলেপাক স. এর বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিত হলো এবং মনে মনে স্বস্তি অনুভব করলো। আর সেই সুবাদে তারা পূর্বের পারস্পরিক শত্রুতার দিকে ধাবিত হয়ে গেলো। একদিন বনী বকরের এক ব্যক্তি সাইয়্যেদে আলম স. এর নিন্দাবাদ করলো। খাযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি সেখানে দণ্ডায়মান ছিলো। সে তাকে এ রকম করতে নিষেধ করলো। কিন্তু সে নিষেধ মানলো না। তাতে খাযাআ গোত্রের লোকটি রাগান্বিত হয়ে নিন্দাকারী

লোকটির মাথা ও মুখমণ্ডল ফাটিয়ে দিলো। সে আপন গোত্র বনী বকরের কাছে গিয়ে নালিশ দিলো। বনী বকর গোত্রের একটি শাখা নুফাছা বনী বকরের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো এবং তারা বনী মুদবেহ'র কাছে সাহায্য চাইলো। বনী মুদবেহ তাদেরকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালো। তারপর তারা কুরাইশদের কাছে সাহায্য চাইলো। কুরাইশদের একদল বেওকুফ ও নাদান লোক যারা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ওয়ারিশানা দুশমনীতে লিপ্ত ছিলো, যেমন ইকরামা ইবনে আবু জাহেল, সফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং সাহল ইবনে আমর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ, তারা তাদের চেহারার রূপ পরিবর্তন করে চেহারার উপর মোটা কাপড়ের নেকাব বেঁধে বনী বকরকে সাহায্য করতে গেলো। খাযাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করলো। দু'পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই হলো। এমনকি লড়াই করতে করতে তারা হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করলো। বনী খাযাআ তখন বনী বকরের সরদার নওফেল ইবনে মুআবিয়াকে চিৎকার করে বললো, আল্লাহকে ভয় করো এবং হেরেমের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করো। নওফেল ইবনে মুআবিয়া বললো, যদিও কাজটি খুব খারাপ, আমিও তা জানি, তবুও আজকের দিনে এর উপর আমল করার মতো ফুরসত নেই। বলা হয়ে থাকে, এই যুদ্ধে বনী খাযাআ গোত্রের বিশজন লোক নিহত হয়েছিলো। কুরাইশদের যে সকল লোক এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো তারা মনে করেছিলো, কেউ বুঝি তাদেরকে চিনতে পারবে না এবং বিষয়টি গোপনই থেকে যাবে। কিন্তু রসুলেপাক স.কে এ বিষয়ে সেই রাতেই সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, যে রাতে বনী খাযাআ ও বনী বকরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেদিন সকাল বেলা রসুলেপাক স. আমাকে বললেন, হে আয়েশা! মক্কায় এরকম এরকম ঘটনা ঘটেছে এবং কুরাইশরা অঙ্গীকারভঙ্গ করেছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার কি মনে হয় কুরাইশরা অঙ্গীকারভঙ্গের বিষয়ে বেপরোয়া হবে? অথচ তরবারীসমূহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তিনি স. বললেন, তারা অঙ্গীকারভঙ্গ করেছে এই পরিপ্রেক্ষিতে, যা আল্লাহ্তায়ালা চেয়েছেন। আমি বললাম, প্রেক্ষিতটি ভালো হবে, না মন্দ? তিনি স. বললেন, ইনশাআল্লাহ্ ভালই হবে।

তিবরানী 'মু'জামে সগীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, উম্মতজননী হজরত মায়মুনা বলেছেন, আমি এক রাত্রে শুনতে পেলাম, রসুলেপাক স. অজু করা অবস্থায় তিনবার 'লাব্বাইক' বললেন এবং তিনবার বললেন 'নাসারতু' (আমি সাহায্য করেছি)। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তো আপনাকে কথা বলতে শুনলাম। এখানে কি কোনো লোক ছিলো, যার সাথে আপনি কথোপকথন করছিলেন? তিনি স. বললেন, বনী খাযাআ গোত্রের দূত আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলো। বলছিলো কুরাইশরা বনী বকরকে সাহায্য করেছে। এমনকি

রাত্রিবেলা আমাদের উপর খুন প্রবাহিত করেছে। এই ঘটনার তিনদিন পর আমর ইবনে সালেম খাযায়ী চল্লিশজন আরোহী সহকারে মক্কা থেকে মদীনায় এলো এবং যা কিছু ঘটনা ঘটেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে রসুলেপাক স. এর কাছে সাহায্যের আবেদন জানালো। রসুলেপাক স. দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর চাদর মাটিতে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হলো। তিনি স. বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে সাহায্য না করি, তাহলে আমাকেও সাহায্য করা হবে না। আমি আমাদেরকে যেভাবে সাহায্য করি তোমাদেরকেও সেভাবে সাহায্য করবো। রসুলেপাক স. তাদের সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের একাত্মতা প্রকাশ করলেন। তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন। তখন আকাশে একটি মেঘখণ্ড ছায়া দিচ্ছিলো। তিনি স. বললেন, এই যে মেঘখণ্ড এ যেনো বনী কাআবদের খবর নিয়ে এসেছে এবং ফরিয়াদ করে যাচ্ছে। তারপর তিনি স. তাদেরকে বললেন, তোমরা আপন আপন গৃহে চলে যাও। দুশ্চিন্তা কোরো না। কেননা সাহায্য ও বিজয়ের দিন নিকটবর্তী। তারপর সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি যেনো দেখতে পাচ্ছি, আবু সুফিয়ান এসেছে এবং সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধি ও নবায়ন করার জন্য আবেদন করছে এবং ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মক্কায় ফিরে যাচ্ছে।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো, তখন তারা আবু সুফিয়ানকে রসুলেপাক স. এর খেদমতে উজরখাহির জন্য প্রেরণ করলো। আবু সুফিয়ান মদীনায় এলো। প্রথমে তার কন্যা উম্মুল মুমিনীন হজরত উম্মে হাবীবার ঘরে প্রবেশ করলো। ঘরে প্রবেশ করে রসুলেপাক স. এর শয্যায় বসবার জন্য অগ্রসর হলো। হজরত উম্মে হাবীবা শয্যা গুটিয়ে নিলেন। আবু সুফিয়ান বললো, এ বিছানাকে তুমি আমা থেকে বাঁচাতে চাও? সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা বললেন, হাঁ। এ বিছানা তো সাইয়্যেদুল মুতাহ্হিরীনের। আর তুমি হচ্ছো একজন নাপাক মুশরিক। আবু সুফিয়ান তার কন্যার কাছ থেকে ফিরে এলো। হাজির হলো রসুলেপাক স. এর দরবারে। সন্ধি নবায়নের বিষয়ে কথা বললো। কিন্তু কোনো উত্তর পেলো না। অতঃপর নিরাশ হয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের কাছে গেলো। সেখান থেকেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। পরে গেলো হজরত ওমর ফারুকের কাছে। সেখানেও লাভ হলো না। তারপর সাইয়্যেদা ফাতেমাতুয্ যোহরার কাছে গিয়ে বললো, তোমার ভগ্নি যয়নব বিনতে রসুলুল্লাহ তো আবুল আসকে নিরাপত্তা দিয়েছে। মোহাম্মদ ওই নিরাপত্তা দেওয়াকে বৈধ রেখেছেন। হজরত ফাতেমা বললেন, বিষয়টি আমার এখতিয়ারের বাইরে। তারপর সে হজরত আলী মুর্তজার আস্তানায় গেলো। সেখান থেকেও বিফল হলো। অবশেষে ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলো। আবু সুফিয়ান চলে যাওয়ার পর রসুলেপাক স. সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকাকে বললেন, সামান প্রস্তুত করো। একথা বলে

নিজেই বাহিনী সজ্জিত করার কাজে নিয়েজিত হলেন। এর রহস্য সম্পর্কে কাউকে কিছু বললেন না। হজরত আবু বকর সিদ্দীক সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার কাছে এসে দেখলেন, সফরের সামান প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ সব দেখে তিনি বললেন, হে আয়েশা! এসব কী? কিসের প্রস্তুতি? তিনি বললেন, রসুলুল্লাহ আমাকে সফরের সামান প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর চেয়ে বেশী আমি কিছু জানি না এবং এর অধিক কিছু বলতেও পারবো না। এমন সময় রসুলেপাক স. গৃহে প্রবেশ করলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন কি? তিনি স. বললেন, হাঁ। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, আমিও কি প্রস্তুতি গ্রহণ করবো? তিনি স. বললেন, হাঁ। হজরত আবু বকর সিদ্দীক জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কুরাইশদেরকে উৎখাতের সংকল্প করেছেন? তিনি স. বললেন, হাঁ। তবে তুমি এ বিষয়টি গোপন রেখো এবং এই দোয়া করতে থাকো— 'আল্লাহুম্মা খুয আলা আবসারিহিম ফালা ইয়ারাওনী ইল্লা বাগতাতান' (হে আল্লাহ! তুমি কাফেরদের চক্ষুসমূহ ধরে ফেলো। তারা যেনো আমাকে দেখতে না পায়, দেখতে পায় যেনো হঠাৎ)। রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং আপন আপন হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে নাও। কিন্তু সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাউকেই কিছু বললেন না।

হাতেব ইবনে আবু বুলতাআ মক্কাবাসীর কাছে একটি পত্র লিখলেন। পত্রের মাধ্যমে তিনি মক্কাবাসীদেরকে অবহিত করলেন, রসুলুল্লাহ স. তাদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রস্তুত করছেন। ওই পত্রের বিষয়বস্তু ছিলো এরকম— রসুলুল্লাহ বাহিনী প্রস্তুত করেছেন। আমার ধারণা এই বাহিনী মক্কা ছাড়া অন্য কোনো দিকে যাবে না। তোমাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। ওয়াস্সালাম। পত্রখানা কবীলা মুযায়নার এক রমণীর কাছে হস্তান্তর করা হলো। দায়িত্ব দেওয়া হলো, সে চিঠিখানা কুরাইশদের কাছে পৌছে দিবে। আল্লাহ্তায়ালা ওই চিঠির কথা তাঁর রসুলের গোচরীভূত করলেন। তিনি স. হজরত আলী মুর্তজা, হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম এবং হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদকে হুকুম করলেন, তোমরা খাক নামক বাগিচায় পৌছে যাও। সেখানে হাওদাজের ভিতর এক রমণীকে দেখতে পাবে। তার কাছে একটি চিঠি রয়েছে। তার কাছ থেকে *চিঠিটি ছিনিয়ে নিয়ে এসো। তাঁরা পথ চলতে চলতে একসময়* ওই রমণীর নিকটে পৌছে গেলেন। সে তার চুলের ভিতর চিঠিটি লুকিয়ে রেখেছিলো। চিঠিটি উদ্ধার করে রসুলেপাক স. এর কাছে ফিরে এলেন তাঁরা। রসুলেপাক স. হাতেবকে তলব করলেন। তাঁকে বললেন, এটা তোমার কাজ। তুমিই একাজ করেছো। তোমার উদ্দেশ্য কী ছিলো বলো? তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার

বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিবেন না। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি মুমিন। আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের উপর আমার ইমান আছে। আমি কুরাইশদের বংশীয় নই। তাদের সঙ্গে মিশ্রিত এবং তাদের মিত্রপক্ষ, মক্কায় আমার এমন কেউ নেই, যে আমার সম্পদ ও পরিবার পরিজনকে হেফাযত করবে। যাঁরা হিজরত করে আপনার সঙ্গে এসে মদীনায় অবস্থান করছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই মক্কাতে প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয় রয়েছে। যারা তাঁদের মাল ও পরিবা- পরিজনকে হেফাযত করছে। বিশ্বাস করুন, আমি মুনাফিক নই। মুর্তাদও হয়ে যাইনি। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা শুনে রেখো, হাতেব ঠিকই বলেছে। হজরত ওমর ফারুক বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে অনুমতি দিন। আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি স. বললেন— 'ইন্নাল্লাহা আত্বত্বালাআ' 'আলা আহলি বাদরিওঁ ওয়া ক্বালা আ'মালু মা শি'তুম ফাক্বাদ গাফারতু লাকুম' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা বদরী সাহাবীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন এবং তিনি বলেছেন, তোমরা যা মনে চায় তাই করো। কেননা আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিবরানী। এক বর্ণনায় আছে, 'ইন্নী গাফিরুল লাকুম' (আমি তোমাদের জন্য ক্ষমাকারী)। একথা শুনে হজরত ওমর ফারুক ক্রন্দন করতে লাগলেন। বললেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়— 'ইয়া আইয়্যুহাল লাযীনা আমানূ লা তাত্‌তাখিজূ আদুব্বি ওয়া আদুও্‌ওয়াকুম আওলিয়াআ ....ফাক্বাদ দাললা সাওয়াআস সাবীল' (হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা কি উহাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করিতেছ, অথচ উহারা তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে তাহা প্রত্যাখান করিয়াছে, রাসুলকে এবং তোমাদিগকে বহিষ্কার করিয়াছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বহির্গত হইয়া থাক তবে কেন তোমরা উহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব করিতেছ? তোমরা যাহা গোপন কর এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর তাহা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হইতে)(৬০ঃ১)। 'ফতহুলবারী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর ফারুক বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। অথচ রসুলেপাক স. হাতেব ইবনে আবু বুলতাআকে ইমানদার হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর উজরখাহী কবুল করেছেন। হজরত ওমরের এরূপ বলার কারণ এই ছিলো যে, তিনি হজরত হাতেবকে মুনাফিক হিসেবেই জেনেছিলেন। ভেবেছিলেন, রসুল স. এর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণকারীরা ওয়াজিবুল কতল (হত্যার উপযোগী)। কিন্তু তিনি তাঁর ভাবনার উপর দৃঢ়তা প্রদর্শন করেননি। তাই তিনি হাতেবকে

কতল করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। হজরত হাতেব ওই কর্মটি করেছিলেন গোপনে। তাই হজরত ওমর মনে করেছিলেন কাজটি মুনাফিকদের মতো। আর হাতেব যে ব্যাখ্যাটি পেশ করেছিলেন, তা ছিলো তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা। তিনি মনে মনে ধারণা করে নিয়েছিলেন, তাঁর এ ধরনের তৎপরতা খারাপ কিছু নয়। তাছাড়া রসুলেপাক স. বলেছেন, 'ফাক্বাদ গাফারতু লাকুম' (আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি) অথবা 'আগফিরু লাকুম' আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করে দিবো— এই বাণীতে তিনি অতীত কালকে ভবিষ্যত কাল হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। আলেমগণ বলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সম্মানার্থে এ সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের অতীত গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে ভবিষ্যতেও কোনো গোনাহ সংঘটিত হলে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। বদর যুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা তো জান্নাতী। জান্নাতের আমলই তো তাঁরা করবেন। ধরে নেওয়া যাক, তাঁরা যদি কোনো গোনাহর কাজ করে ফেলেন তবে তওবা করতেন এবং নেক আমল করতে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। এ সকল কথা 'মাওয়াহেব' রচয়িতা কুরতুবী থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

কোনো কোনো যুদ্ধবিষয়ক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন, হজরত হাতেব যে পত্রটি লিখেছিলেন, তার সারমর্ম ছিলো এরকম— হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের উপর রসুলুল্লাহ রাত ও স্রোতের মতো এক বাহিনী নিয়ে আগমন করছেন। আল্লাহ্র শপথ! তিনি একা একাও যদি আসেন, তবুও আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করে দেখাবেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করো। সুহায়লী এরকম বর্ণনা করেছেন।

উক্ত চিঠিতে এমন কোনো কিছু ছিলো না, যা কুফুরী ও মুনাফিকীকে প্রমাণ করে, শুধু এটুকু ছাড়া যে, তিনি গোপন বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। আর তিনি এ আশায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন যে, তাঁর ওজর হয়তো গ্রহণ করা হবে। নিঃসন্দেহে রসুলেপাক স. হজরত হাতেবের ওজর কবুল করেছিলেন ওই সময়, যখন তিনি তাঁর ইমানের প্রত্যয়ন করলেন। হজরত ওমরকেও নিবৃত্ত করলেন। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. বললেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে দাও। তখন লোকেরা তাঁকে পিঠে ধাক্কা দিতে দিতে মসজিদ থেকে বের করে দিতে লাগলো। কিন্তু তিনি বার বার মুখ ঘুরিয়ে রসুলেপাক স. এর মুখমণ্ডলের দিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি স. তাঁর প্রতি দয়া করলেন। বললেন, ওকে ফিরিয়ে আনো। তারপর বললেন, আমি তো তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম, এখন তুমি আল্লাহ্তায়ালার কাছে মাগফেরাত কামনা করো। আর ভবিষ্যতে কোনো দিন এরকম কোরো না।

জীবনীলেখকগণ বলেছেন, হজরত হাতেব ইবনে আবু বুলতাআ একজন অগ্রণী মুহাজির ও বুদ্ধিমান সাহাবী ছিলেন। তবে তিনি এহেন লাঞ্ছনায় পতিত হয়েছিলেন তাঁর অসতর্কতার কারণে। রসুলেপাক স. তাঁকে ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ্ মাকুকাসের নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

মক্কা মুকাররমার দিকে যাত্রা

মক্কা মুকাররমার দিকে সফর করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত যখন গ্রহণ করা হলো, তখন রসুলেপাক স. কতিপয় সাহাবীকে আরবের বিভিন্ন গোত্রের বসতির দিকে প্রেরণ করলেন। গোত্রগুলো হচ্ছে— আসলাম, গেফার, জুহায়না, আশজা এবং সুলায়ম ইত্যাদি, যারা পূর্বেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলো। তাদেরকে এই মর্মে সংবাদ পাঠানো হলো যে, তারা যেনো সকলেই যুদ্ধের সামগ্রী সহকারে একত্রিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি স. ৮ম হিজরীর ১০ই রমজান বুধবার দিন আসরের নামাজের পর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে যাত্রা শুরু করেন। আল্লামা ওয়াকেদী এরকম বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, আমরা মক্কাবিজয়ের সফর ২রা রমজানে শুরু করেছিলাম। এই বর্ণনা অনুসারে ওয়াকেদীর বর্ণনাটি দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয়। যাত্রার তারিখ নিয়ে আরও কয়েকটি মত পাওয়া যায়। তা হচ্ছে— ১২, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯শে রমজান। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মত দু'টি বিশুদ্ধতার অধিকতর নিকটবর্তী। ২য় মতটি আরো বেশী বিশুদ্ধ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. যখন মদীনা থেকে বাইরে এলেন তখন দেখলেন, মুসলিম বাহিনীর মধ্যে রয়েছে সাতশ' মুহাজির, যাদের মধ্যে তিনশ' ছিলেন অশ্বারোহী। আর চার হাজার লোক ছিলো আনসারদের মধ্য থেকে। যাদের মধ্যে অশ্বারোহী ছিলো পাঁচশ'। অন্যান্য গোত্র থেকে এসে জমা হয়েছে চারশ', পাঁচশ', একহাজার এরকম নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক। সকলেই রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মিলিত হলো। যাত্রা শুরু হলো। পথিমধ্যে আরো লোক এসে জুটলো। এভাবে মোট লোকসংখ্যা হয়ে গেলো দশ হাজার। কেউ কেউ বার হাজারও বলে থাকেন। দু'টি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন হতে পারে এভাবে— দশ হাজার মদীনা থেকে। আর দু'হাজার অন্যান্য গোত্র থেকে। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, বনী সালাম গোত্র থেকে এসেছিলো প্রায় দু'হাজার লোক। তাদের অধিকাংশই ছিলো অশ্বারোহী। এ সময় মদীনায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম। আবার কেউ কেউ বলেন, হজরত আবু যর গিফারী। রসুলেপাক স. তাঁর সহধর্মিণীগণের মধ্য থেকে সঙ্গে নিয়েছিলেন সাইয়্যেদা উম্মে সালামাকে। কাদীদ নামক স্থানে

যখন পৌঁছলেন, তখন সাহাবা কেরামকে পতাকা প্রদান করলেন। কাদীদ একটি ঝর্ণার নাম, যা কাদীদ ও আসফান দু'টি স্থানের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিলো। কাদীদে পৌঁছার পরে রোজার ইফতার করলেন এবং এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করলেন যে, সফরে যে রোজা ভঙ্গ করবে না, সে গোনাগার হবে। অপর এক বিবরণে আছে, তিনি স. তখন বলেছিলেন, যে চায় সে রোজা ভঙ্গ করতে পারবে আর ইচ্ছে করলে রোজা রাখতেও পারবে। সফরে রোজা রাখা বা ভঙ্গ করা উভয়টিই ইচ্ছাধীন। রোজা ভঙ্গ করা এবং রোজা রাখা উভয়ের কল্যাণ ও ফযীলত সম্পর্কেই বিভিন্ন হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে সকল হাদিসের উদ্দেশ্য ও মর্ম এই যে— সফরকালে রোজা ভঙ্গ করা জায়েয।

মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তখন হিজরত করে মদীনার দিকে আসছিলেন। তন্মধ্যে ছিলেন রসুলেপাক স. এর চাচা হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর পরিবার-পরিজন। ছাকইয়া নামক স্থানে মতান্তরে জুহফা বা যুলহুলায়ফায় এসে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মিলিত হলেন তাঁরা। তিনি স. তাঁদেরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁদের মাল-সামান মদীনায় পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। হজরত আব্বাসকে বললেন, আপনার হিজরত সর্বশেষ হিজরত, যেমন আমার নবুয়ত সর্বশেষ নবুয়ত। পথিমধ্যে আরও এসে মিলিত হলেন আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। যিনি ছিলেন রসুলেপাক স. এর চাচা হারেছের পুত্র। আরো মিলিত হলেন তাঁর ফুফু আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আতেকার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া। তিনি সব সময় রসুলেপাক স.কে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। তাঁরা এসে মুসলমান হয়ে গেলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার দিক থেকে তিনি স. তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। পরে সাইয়্যেদা উম্মে সালামার আবেদনে তাঁর দোষক্রটি ক্ষমা করে দিলেন। এক বর্ণনায় আছে, হজরত আলী আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়াকে বললেন, তুমি রসুলুল্লাহ্‌র খেদমতে ওই কথাগুলো বলো, যে কথাগুলো নবী ইউসুফকে বলেছিলেন তাঁর ভাইয়েরা। বলেছিলেন— 'লাক্বাদ আছারাকাল্লাহু আ'লাইনা ওয়া ইন কুন্না লাখাত্বিঈন' (আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন এবং আমরা তো অপরাধী ছিলাম) (১২ঃ৯১)। নবী ইউসুফ তখন বলেছিলেন— 'লা তাছরীবা আলাইকুমুল ইয়াওমা ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম ওয়া হুয়া আরহামুর রহিমীন' (আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু)(১২ঃ৯২)। তাঁরা সেরকমই করলেন। রসুলেপাক স. বললেন— 'লা তাছরীবা আ'লাইকুমুল ইয়াওমা ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম ওয়া হুয়া আরহামুর রহিমীন' (আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ্ তোমাদি"কে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু)(১২ঃ৯২)।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ তারপর থেকে লজ্জায় কোনো সময় রসুলেপাক স. এর সামনে মাথা উঁচু করতেন না।

রসুলেপাক স. সেখান থেকে রওয়ানা করে মাররুয্যাহ্রান নামক স্থানে পৌছলেন। সেখান থেকে মক্কার দূরত্ব চার ফারসাখ। এখন ওই স্থানটিকে ওয়াদীয়ে ফাতেমা বলা হয়। ফাতেমাতুয্ যোহ্রার নামানুসারে এর নামকরণ হয়নি। বরং এমনি এমনিই এই নামটি প্রচারিত হয়েছে, যেমন প্রচারিত হয়ে থাকে অন্যান্য স্থানের নাম। সেখানে পৌছার পর তিনি স. নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন আপন তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালাতে হবে। এভাবে সেখানে দশ হাজার বা বার হাজার স্থানে আগুন জ্বালানো হলো। তখন পর্যন্ত কুরাইশরা রসুলেপাক স. এর আগমন এবং তাঁর অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলো না। তবে তারা সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত থাকতো। কেননা তারা জানতো, রসুলেপাক স. মক্কা অভিযানের অভিপ্রায় রাখেন। কুরাইশরা আবু সুফিয়ান ইবনে হারবকে বললো, যাও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করো। মোহাম্মদের সাক্ষাত পেলে তার কাছ থেকে আমাদের জন্য আমান গ্রহণ করো। মক্কাবাসীদের অনুরোধক্রমে আবু সুফিয়ান, হাকীম ইবনে হাযাম এবং বুদায়ল ইবনে ওয়ারাকাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে বের হলো। তারা দেখতে পেলো সমস্ত উপত্যকা জুড়ে আগুন জ্বলছে। আপন মনে জিজ্ঞেস করলো, এ আগুন কিসের? অতঃপর তারা সারি সারি তাঁবু দেখতে পেলো। শুনতে পেলো ঘোড়ার আওয়াজ। এদিকে হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলতে লাগলেন, রসুলুল্লাহ যদি এরকম শান-শওকত নিয়ে কুরাইশদের উপর অতর্কিতে হামলা করেন, তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের নাম নিশানা পর্যন্ত বাকী থাকবে না। হজরত আব্বাস বলেন, অতঃপর আমি বিশেষ একটি উটের উপর আরোহণ করে বাহিনী থেকে বাইরে গেলাম। উদ্দেশ্য, পথিমধ্যে মক্কার কাউকে পেলে তার মাধ্যমে কুরাইশদেরকে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবো। সে যেনো মক্কাবাসীদের কাছে সংবাদ জানিয়ে দেয় এবং শেষ পরিণাম সম্পর্কে বিবেচনা করতে বলে। হঠাৎ আবু সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর শুনলাম। ডাকলাম, আবু হানযালা! সেও সাড়া দিলো। বললো, তুমি কি আবুল ফজল? আমি বললাম, হাঁ। সে বললো, হে আবুল ফজল! আমার পিতা-মাতা তোমার উপর কোরবান হোক, এ কি ঘটনা! আমি বললাম, আফসোস আমার উপর! এখানে আল্লাহ্র রসুল বারো হাজার সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সে বললো, হে আব্বাস! আমার কী অবস্থা হবে? আমি বললাম, তুমি আমার উটের উপরে আমার পিছনে বসো, আমি তোমাকে আল্লাহর রসুলের কাছে নিয়ে যাবো। তোমার জন্য আমান গ্রহণ করবো। সে আমার উটের উপর আরোহণ করলো। এদিকে বুদায়ল ইবনে ওয়ারাকা এবং হাকীম ইবনে হাযাম মক্কায় ফিরে গেলো। অপর এক বর্ণনায় আছে, বুদায়ল ও হাকীমও আবু সুফিয়ানের সঙ্গে নবী করীম স.

এর দরবারে হাজির হয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। এমনও হতে পারে যে, মক্কায় পৌঁছে তাঁরা দু'জন পুনরায় রসুলেপাক স. এর কাছে হাজির হয়েছিলো। তারপর আমরা ওমরের তাঁবুর সামনে পৌঁছলাম। তিনি আবু সুফিয়ানকে দেখে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হলেন। তরবারী নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে ছুটলেন। উদ্দেশ্য, রসুলেপাক স. এর কাছে পৌঁছার পূর্বেই তাঁকে হত্যা করে ফেলবেন। কেননা আবু সুফিয়ান তখনও আমানপ্রাপ্ত হয়নি এবং ইমানও গ্রহণ করেনি। আমিও উটকে দ্রুত গতিতে দৌড়ালাম। এভাবে ওমরের পূর্বে পৌঁছলাম রসুলুল্লাহর তাঁবুতে। বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি আবু সুফিয়ানকে আমান দিয়ে আমার আশ্রয়ে নিয়ে এসেছি। আর ওদিকে ওমর তাঁকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে আসছে। তিনি স. বললেন, আজ রাতে আবু সুফিয়ানকে আপনার তাঁবুতে রাখুন। সকালে আমার সামনে আনবেন।

সকাল হলো। আমি তাকে রসুলুল্লাহর দরবারে হাজির করলাম। তিনি স. বললেন, আফসোস! এখনও তোমার সময় হয়নি যে তুমি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই একথা বলবে। আবু সুফিয়ান বললো, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হোক। আপনি কতোই না দয়াময়। করুণাময়। সহিষ্ণু। এতো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পরও আপনি এতো মেহেরবানী করছেন এবং আমাদেরকে সাহায্য করছেন। তিনি স. বললেন, এখনও কি তোমার সেই সময় আসেনি যে, তুমি জানবে আমি আল্লাহর রসুল। আবু সুফিয়ান বললো, এখনও পর্যন্ত আমার অন্তরে একটি সন্দেহ বিরাজ করছে। রয়েছে সামান্য দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। হজরত আব্বাস বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক, হে আবু সুফিয়ান! কথা দীর্ঘায়িত কোরো না, কলেমা তওহীদের মাধ্যমে জবান খোলো। নতুবা এক্ষুণি ওমর এসে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিবে। তখনই আবু সুফিয়ান বলে ফেললেন— আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ্। হজরত আব্বাস বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আবু সুফিয়ান একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি। তিনি আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধসম্পন্ন। আপনি তাঁকে এমন কোনো মর্যাদা প্রদান করুন, যার মাধ্যমে তিনি মক্কাবাসীদের কাছে গৌরবান্বিত হতে পারেন। তিনি স. বললেন, 'মান দাখালা দারা আবী সুফইয়ানা ফাহুয়া আমিনুন' (যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে)। যে নিজের হাতিয়ার ফেলে দিবে, সেও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে। যে নিজের ঘরে অবস্থান করবে, সেও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে। যে কেউ মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সেও হবে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, জাহেলী যুগের মক্কার মুশরিকরা যখন রসুলেপাক স.কে দুঃখ কষ্ট দিতো, তখন একদিন আবু সুফিয়ান রসুলেপাক স.কে আশ্রয় দিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছিলেন। আজকের এই ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন আবু সুফিয়ানের সেই দিনের প্রতিদান স্বরূপ ছিলো। সাথে সাথে আবু সুফিয়ানের

অহংকারকে চূর্ণ করাও ছিলো উদ্দেশ্য। তাই তিনি স. একই সঙ্গে অন্যান্যদের নিরাপত্তার কথাও বলেছিলেন। যেনো আবু সুফিয়ান এরকম খেয়াল না করেন যে, এ মর্যাদা কেবল তাঁকেই প্রদান করা হয়েছে। বরং আজকের দিনের এহেন নিরাপত্তা প্রদান এক ব্যাপক অনুগ্রহ, আবু সুফিয়ানও যার অন্তর্ভূত।

কলেমা পড়ার পর আবু সুফিয়ান যখন ফিরে যেতে লাগলেন, তখন রসুলেপাক স. হজরত আব্বাসকে বললেন, তাকে মক্কায় যেতে দিবেন না। নিজের সাথে রাখুন। এমন সংকীর্ণ জায়গায় রাখুন, যেনো ইসলামী বাহিনী তার সামনে দিয়ে যেতে পারে। ইসলামের শৌর্য-বীর্যজনিত ভীতি যেনো তার অন্তরে প্রবেশ করে এবং তার অশুভ মানসিকতারও যেনো মূলোৎপাটিত হয়। হজরত আব্বাস ডাক দিয়ে বললেন, আবু হানযালা! থামো। সামনে ফিরে এসো। আবু সুফিয়ান ফিরে এসে বলতে লাগলেন, হে বনী হাশেম! মনে কি কোনো অশুভ উদ্দেশ্য আছে ? তিনি বললেন, নবীর আহলে বাইত কখনও অশুভ উদ্দেশ্যকে প্রশ্রয় দেয় না। অতঃপর হজরত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে একটি সংকীর্ণ রাস্তায় নিয়ে গেলেন। সেখানেই তাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইসলামী সেনাবাহিনী দলে দলে শান শওকতের সাথে সামনে দিয়ে চলে যেতে লাগলো। হজরত আব্বাস প্রত্যেকের বিষয়ে আবু সুফিয়ানের কাছে প্রশংসা করতে লাগলেন। আবু সুফিয়ানের অন্তরে হিংসা ও লজ্জার আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে লাগলেন। সর্বপ্রথম বীর সেনানী হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি বনী সুলায়ম গোত্রের এক হাজার সৈন্য সহকারে যাচ্ছিলেন। এই দলটিতে দু'টি পতাকা ছিলো। আবু সুফিয়ান হজরত আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? তিনি বললেন, ইনি হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ। হজরত খালেদ যখন আবু সুফিয়ানের সামনাসামনি হলেন, তখন পূর্ণ জোশের সাথে উচ্চ আওয়াজে তকবীরধ্বনি দিলেন। আবু সুফিয়ানের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হলো। হজরত খালেদের পিছনে যুবায়ের ইবনুল আওয়াম পাঁচশ' বীর যোদ্ধাকে নিয়ে কালো পতাকা উড়িয়ে উচ্চ আওয়াজে তকবীর বলতে বলতে চলে গেলেন। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? হজরত আব্বাস বললেন, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম। আবু সুফিয়ান বললেন, তোমার বোনের পুত্র? তিনি বললেন, হাঁ। তারপর হজরত যুবায়েরের পিছনে বনী গেফার গোত্রের তিনশ' ব্যক্তিকে দেখা গেলো, তাদের পতাকা বহন করছিলেন হজরত আবু যর গিফারী। তাঁরাও তকবীর বলতে বলতে অতিক্রম করে গেলেন। হজরত আব্বাস এই দলটির খুব প্রশংসা করলেন। আবু সুফিয়ান বললেন, তাদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যেই দেখা গেলো বনী কাআব ইবনে ওমরের লোকসংখ্যা পাঁচশতে পৌছে গিয়েছে এবং তাদের বাহিনীর পতাকা রয়েছে বাশার ইবনে সুফিয়ানের হাতে। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন গোত্রের দল? হজরত আব্বাস বললেন, এরা রসুলুল্লাহর হালীফ।

এরপর মুযায়না গোত্রের এক হাজার লোক অতিক্রম করলো। তাদের পতাকা ছিলো তিনটি। আবু সুফিয়ান তাদের প্রশংসা শোনার পর বললেন, আমর তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর জুহায়নী কবীলার লোকেরা পৌছলো। তাদের মধ্যে আটশ' বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং তাদের পতাকা ছিলো চারটি। তাদের পর আশজা কওমের তিনশ' ব্যক্তি অতিক্রম করলো। হজরত আব্বাস যখন বনী আশজা কওমের প্রশংসা করলেন, তখন আবু সুফিয়ান বললেন, মোহাম্মদের সর্বাধিক দুশমন তো এরাই ছিলো। হজরত আব্বাস বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের অন্তরে ইসলামের মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন। আবু সুফিয়ান বললেন, আমি তাদেরকে দেখেছি, আমার তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। অবশেষে রসুলেপাক স. এর বিশেষ বাহিনী দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি তাঁর উটের উপর আরোহণ করে আছেন। প্রায় পাঁচ হাজার সাহায্যকারী বীর যোদ্ধা আনসারদের সম্মানিত লোকদের একটি দল। সকলেই পরিপূর্ণ অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তকবীর বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। রসুলেপাক স. এর এক হাত ধরে আছেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং অপর হাত ধরে রেখেছেন হজরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের। তিনি তাঁদের সাথে আলাপচারিতায় রত। আবু সুফিয়ান যখন এই রব্বানী লশকরকে এরকম শান-শওকতের সাথে দেখতে পেলেন, তখন তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হলো। তিনি সীমাহীন হয়রানী ও পেরেশানীতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। বললেন, হে আব্বাস! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের বাদশাহী তো খুবই শক্তিশালী ও বিশাল হয়ে গিয়েছে। হজরত আব্বাস বললেন, আক্ষেপ তোমার জন্য হে আবু সুফিয়ান! এতো রেসালত ও নবুওয়াতের মহিমা। এটা কোনো বাদশাহী নয়। বর্ণিত আছে, সেদিন হজরত সাআদ ইবনে উবাদা, যার হাতে আনসারদের পতাকা ছিলো, তিনি একহাজার আনসার নিয়ে রসুলেপাক স. এর আগে পিছে চলছিলেন। তিনি যখন আবু সুফিয়ানের সামনাসামনি এসে বললেন, হে আবু সুফিয়ান! আজকের দিন রক্তপাত ও হত্যার দিন। আজকের জন্য হেরেমের হুরমতকে হালাল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ আল্লাহ্‌তায়ালা কুরাইশদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে দিয়েছেন। তারপর তিনি আপন সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা! আজ তোমরা উহুদ যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে পারবে। হজরত সাআদ ইবনে উবাদা যখন আবু সুফিয়ানকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুললেন, তখন আবু সুফিয়ান ফরিয়াদের সুরে রসুলেপাক স. এর কাছে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি কি আপনার কওমের লোকদেরকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন? তিনি স. বললেন, না। আবু সুফিয়ান তখন হজরত সাআদ ইবনে উবাদার উক্তিটির উল্লেখ করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, সাআদ ইবনে উবাদা একথা তার নিজের পক্ষ থেকে বলেছে। অথবা বলেছে ভুলবশতঃ। আজ তো নম্রতা ও দয়া প্রদর্শনের দিন। আজ তো ওই দিন,

যে দিনে আল্লাহ্তায়ালা কুরাইশদেরকে মর্যাদা দান করবেন। আজ তো ওই দিন যে দিনে তিনি তাঁর গৃহের সম্মান বৃদ্ধি করবেন। তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো। ইমান গ্রহণ করো। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. বললেন, সাআদ বাস্তবতার বিপরীত কথা বলেছে। আজ তো ওই দিন, যেদিনে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর ঘরের সম্মান বৃদ্ধি করবেন এবং তাকে পোশাক পরিধান করাবেন। আবু সুফিয়ান বললেন, সমস্ত লোকের মধ্যে আপনি কতোইনা কল্যাণকামী। আর কতোইনা দয়াবান ও করুণাপরবশ। আমি হক তায়ালাকে সাক্ষী রেখে আপনার কাছে সুপারিশ করছি, কুরাইশদের সাথে আপনার নিকটাত্মীয়তা রয়েছে। তাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে রক্ত প্রবাহ থেকে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আপন প্রিয়জন ও নিকটজনদের প্রতি দয়া ও করুণা বর্ষণ করুন। অতঃপর হজরত ওছমান ইবনে আফ্ফান ও হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফকে প্রিয়ভাজন ধরে তাঁদের মাধ্যমে নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা সাআদ ইবনে উবাদার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নই। সে কুরাইশদেরকে কষ্ট দিতে পারে। রসুলেপাক স. কায়েস ইবনে উবাদাকে বললেন, তোমার পিতার কাছ থেকে পতাকা নিয়ে নাও। অপর এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. হজরত আলীকে নির্দেশ দিলেন, সাআদের কাছ থেকে পতাকা নিয়ে নাও। তাঁকে হুকুম দিলেন, নম্রতার সাথে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ কোরো। হজরত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে বললেন, তোমার মক্কায় চলে যাওয়া উচিত। সেখানে গিয়ে মক্কাবাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করো। তারা যেনো ইসলাম গ্রহণ করে হত্যা ও বন্দীত্ব থেকে নিস্কৃতি পায়। অন্যথায় তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আবু সুফিয়ান দৌড়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। এই মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, রসুলুল্লাহর নির্দেশ যারা দরোজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে, হাতিয়ার ফেলে দিবে, আমার ঘরে প্রবেশ করবে অথবা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। কুরাইশরা বললো, কাবাহাকাল্লাহ্ (আল্লাহ্ তোমাকে অধঃপতিত করুন)। এ কেমন সংবাদ আমাদের জন্য এনেছো? কুরাইশরা তখন পর্যন্ত রসুলেপাক স. এর আগমনের বিষয়ে অবহিত হয়নি। তাই তারা বললো, তোমার পিছনে কিসের ধূলা বালি উড়ছে? এদিকে এগিয়ে আসছে কারা? সম্ভবতঃ তারা এরূপ প্রশ্ন করছিলো তাদের দুরবস্থা, হয়রানী, পেরেশানী ও তাদের অন্তর জগতের অপবিত্রতা ও মূর্খতার কারণে। কেননা হাকীম ইবনে হারাম এবং বুদায়ল ইবনে ওয়ারাকা তো আবু সুফিয়ানের পূর্বেই মক্কায় ফিরে এসেছিলো। সম্ভবতঃ তারা মক্কাবাসীদের কাছে রসুলেপাক স. এর আগমনের কথা বলেও ছিলো। তাই এ বিষয়টি তাদের অজানা থাকার কথা নয়। আবু সুফিয়ান বললেন, আক্ষেপ তোমাদের জন্য! মোহাম্মদ তাঁর বাহিনী নিয়ে শান শওকতের সাথে এগিয়ে আসছেন। এখন তাঁকে প্রতিহত করার সাধ্য তোমাদের নেই। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী উতবার কন্যা হিন্দা তার স্বামীর দাড়ি টেনে ধরে তাঁকে অনেক অপমান অপদস্থ

করে বললো, হে গালেবের সন্তানেরা! এই আহম্মককে তোমরা হত্যা করে ফেলো। এ যেনো এরূপ কথা আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে না পারে। আবু সুফিয়ান বললেন, তোমাদের যেরূপ ইচ্ছা আমাকে অপমান অপদস্থ করো। যেরূপ মন চায় আমার সাথে সে রকম আচরণ করো। কিন্তু জেনে রেখো, তোমরা যদি মুসলমান না হও, তাহলে তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। তোমরা আপন আপন গৃহে ফিরে যাও এবং দরোজা বন্ধ করে গৃহাভ্যন্তরে বসে থাকো। এটি তোমাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা।

রসুলেপাক স. যখন মাররুয যাহরান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়ামকে হুকুম দিলেন, মুহাজিরদের জামাতকে নিয়ে উঁচু রাস্তা (যাকে কাদা বলা হয়) দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করো। তাঁরা যেনো রসুলেপাক স. এর তাঁবু সেখানে নিয়ে স্থাপন করেন। আর যেনো সামনে অগ্রসর না হন। সেখানে পৌছে তাঁরা যেনো তাঁর স. এর আগমনের অপেক্ষায় থাকেন। হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে হুকুম দিলেন, অস্ত্রে সুসজ্জিত দলকে নিয়ে নম্রতার সাথে যেনো বাতনে ওয়াদীর পথে রওয়ানা দেন। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে আদেশ দিলেন, অন্য সকল বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মক্কার নিম্নপথ কুদা ধরে যেনো মক্কায় প্রবেশ করেন এবং তাঁকে দেওয়া পতাকাটি যেনো মক্কার সর্বশেষ ইমারতের উপর স্থাপন করেন। তারপর তিনি স. গোসল করলেন। সমরসজ্জায় সজ্জিত হলেন। তারপর বিশিষ্ট সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। আল্লাহ্পাকের দেওয়া এই মহান বিজয়ের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে পড়ে গেলো হিজরতের মুহূর্তগুলোর কথা। কীভাবে তিনি একা একা দুশমনদের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে মক্কা ছেড়ে বাইরে বের হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্তায়ালার কী অপার মহিমা! অল্পদিন পরে কী শান-শওকতের সাথে অসংখ্য সৈন্যসামন্ত সহকারে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসছেন। একথা স্মরণ করে বিনয়ে মস্তক অবনত করলেন। এমনকি তাঁর পবিত্র শ্মশ্রু উটের পালানের কাঠ প্রায়শঃই স্পর্শ করছিলো। সেই পালানের উপর বসেই তিনি স. শুকরিয়ার সেজদা আদায় করলেন এবং আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা করলেন। বর্ণিত আছে, উটের পালানের উপর বসেই 'ইন্না ফাতাহ্না' সুরাটির প্রথম আয়াতসমূহ তরজী করে বার বার পাঠ করছিলেন তিনি স.। তরজী বলা হয় কণ্ঠনালীর ভিতরে আওয়াজকে অনুরণিত করা। কেউ কেউ বলেছেন, উটের চলাফেরার কারণে আরোহীর মুখ থেকে যে শব্দ বের হয় তাকে বলে তরজী। তবে সঠিক সংজ্ঞা এই যে, আনন্দানুভূতি ও বিশাল নেয়ামতের শুকরানা স্বরূপ মন থেকে যে সুর বেরিয়ে আসে, তাকেই তরজী বলা হয়। কোরআন মজীদ সুর করে তেলাওয়াত করার বিষয়ে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। 'ছফরুস সাআদাত' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, রসুলেপাক স. কোনো কোনো সময় সুললিত কণ্ঠে কোরআনুল করীম পাঠ করতেন এবং তরজীর

সাথে পাঠ করতেন, যেমন হাফেজে কোরআনগণ মিষ্ট সুকণ্ঠে পাঠ করে থাকেন। মক্কা বিজয়ের দিনও তিনি সুরা ফাতাহ্ এভাবে পাঠ করেছিলেন। এভাবেই প্রবেশ করেছিলেন মক্কায়। সুবহানাল্লাহ্। ওই মুহূর্ত ছিলো কতোইনা মর্যাদাপূর্ণ মুহূর্ত। ইমানের নূরের ঝলক উদ্ভাসিত হওয়ার মুহূর্ত। কুফুরীর অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার মুহূর্ত। সে মুহূর্তে রসুলেপাক স. এর কী মাকাম এবং কী হাল ছিলো কে জানে? হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে সেই মুহূর্তের মর্যাদা অনুভবের ক্ষমতা চাই। তুমি আমাকে ওই ইমান ও আনন্দ দান করো, যা তোমার ফজল ও অনুগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত। যে সম্পর্কে তুমি এরশাদ করেছো— 'কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়াবিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফাল্ইয়াফ্রাহূ' (বল, ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহে ও তাঁহার দয়ায়; সুতরাং ইহাতে উহারা আনন্দিত হউক)(১০:৫৮)। মুফাসসেরীনে কেরাম বলেছেন, এখানে ফজল মানে ইমান আর রহমত মানে কুরআন মজীদ।

রসুলেপাক স. হজরত খালেদ এবং অন্যান্য সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন, কেউ যেনো আহলে মক্কা ও হেরেমের প্রতিবেশী কারও সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। ওই নাদান ও মূর্খ ছাড়া, যারা তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তাদেরকে প্রতিহত করে যেনো ক্ষমা না করা হয়। বর্ণিত আছে, হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ যখন ঐ স্থানটির দিকে গেলেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন রসুলেপাক স. তখন সেখানে ইকরামা ইবনে আবু জাহেল, সফওয়ান ইবনে উমাইয়া ও সুহায়ল ইবনে আমর, যারা তখনও দুশমনীতে লিপ্ত ছিলো, তারা বনী বকর ও বনী হারেছের কতিপয় লোকের সাথে মিলিত হয়ে জঙ্গী সাজে সজ্জিত হয়ে রাস্তার মাথায় হজরত খালেদকে ধরে ফেললো। তারা তখন তাদের বাপ-দাদার ধর্মের সাহায্যের কাজে বিভোর ছিলো। এতোটুকু জ্ঞানও তাদের ছিলো না যে, মুসলমানগণ কিসের জোরে বিজয় লাভের আশা করছে। তারা আবু সুফিয়ানকে তখন দেখেনি। তাঁর মুখেও তো ইসলামের কলেমা উচ্চারিত হয়েছে। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে দেখেনি যে, তিনি কী শক্তি, উচ্চ মর্যাদা ও সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। এ বদবখতেরা চাচ্ছিলো, তাদেরকে যদি ইসলামে প্রবেশ করতেও হয় তবুও লোকেরা যেনো জানে যে, তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামে প্রবেশ করেনি। বরং বলপ্রয়োগের কারণে বাধ্য হয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছে। তারা মনে করে যে, এতে তাদের বাপ-দাদাদের আত্মা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে।

ফলে হজরত খালেদ বাধ্য হলেন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে। খান্দামা নামক স্থানে ভীষণ লড়াই হলো। এমনকি খরুরা নামক স্থান পর্যন্ত, যাকে সর্বসাধারণ আরুবা বলে থাকে, যা কাবাগৃহ সংলগ্ন একটি স্থান, সে পর্যন্ত যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো। মুশরিকদের মধ্য থেকে আটাশজন নিহত হলো। হজরত খালেদের দলের দু'জন শহীদ হলেন। একজনের নাম হুনায়শ ইবনুল আশআর। অপর জনের নাম কুরয ইবনে জাবের। রসুলেপাক স. এই যুদ্ধ সম্পর্কে যখন

জানতে পারলেন, তখন বললেন, আমি তো খালেদকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলাম। লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অনেক বড় দল তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলো। তিনি তো আত্মরক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। তখন তিনি স. বললেন, কাযাউল্লাহি খাইর (আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়সালা উত্তম)। কথিত আছে, রসুলেপাক স. হজরত খালেদকে তিরস্কার করলেন এবং কোনো একজনকে পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন, দা'আনহুমুস সাইফ (তাদের উপর থেকে তলোয়ার প্রত্যাহার করে নাও); কিন্তু লোকটি সেখানে গিয়ে ভুল বিবৃতি দিয়ে বললেন, দা'ফীহিমুস সাইফ (তাদের উপর তলোয়ার চালিয়ে যাও)। তখন হজরত খালেদ মুশরিকদের সত্তুর ব্যক্তিকে হত্যা করলেন। রসুলেপাক স. যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন হজরত খালেদকে বললেন, তুমি হুকুমের বরখেলাফ কেনো করলে? তখন তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি কী করবো? আপনার দূত তো আমাকে বলেছে 'দা'ফীহিমুস সাইফ' (তুমি তাদেরকে হত্যা করো)। এ সর্ম্পকে একটি বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন মুফাসসেরীনে কেরাম। ঘটনাটি এরকম— রসুলেপাক স. ওই ব্যক্তিকে ডাকলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাকে কী বলেছিলাম? দূত বললো, আমি যখন আপনার হুকুমে অগ্রসর হলাম, তখন পথিমধ্যে একজন আমার সঙ্গে মিলিত হলো। তার মস্তক ঠেকেছিলো আকাশে। তার হাতে খঞ্জরও ছিলো। সে আমার বুকের উপর হাত মেরে বললো, তুমি খালেদকে বলবে, দা'ফীহিমুস সাইফ। অন্যথায় এ খঞ্জর দিয়ে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিবো। অগত্যা আমি খালেদকে এরকম কথা বলেছি। রসুলেপাক স. এই বৃত্তান্ত শুনে বললেন, সাদাকাল্লাহু ওয়া সাদাকা রসুলুহু (আল্লাহও সত্য ও তাঁর রসুলও সত্য)। উহুদ যুদ্ধের দিন যখন হজরত হামযা শহীদ হয়েছিলেন, তখন আমি বলেছিলাম, আমি যদি কুরাইশদেরকে পাই তাহলে তাদের সত্তুর জনকে হত্যা করবো। সে দিন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে মানা করেছিলেন। কিন্তু আজ আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায় তাঁর নবীর মুখনিঃসৃত বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। এ কারণেই কুরাইশদের সত্তুর ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এক বর্ণনায় আছে, লোকেরা রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিবেদন করলো, মক্কায় নাদান মূর্খরা অবাধ্যতা প্রদর্শন করছে। তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তিনি স. বললেন, 'উহসুদূহুম হাসদান' (তাদেরকে পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করো)। আবু সুফিয়ান রসুলেপাক স. এর কাছে হাজির হয়ে বললেন, হে মোহাম্মদ! কুরাইশরা তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তখন খাজায়ে কায়েনাত স. দয়া করে হুকুম করলেন, এখন আর তাদেরকে হত্যা কোরো না। তারপর সেই বিদ্রোহী হতভাগার দল পরাজয়বরণ করে পালিয়ে পাহাড়ের দিকে গিয়ে লুকালো। আবার কেউ কেউ মরুভূমির দিকে চলে গেলো। কেউ ঘরের ভিতর প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে বসে রইলো এবং হত্যা থেকে বেঁচে গেলো।

রসুলেপাক স. ভীড়ের কারণে অথবা উম্মতকে বিধান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সওয়ারীতে আরোহণ করে মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন। পরিধান করলেন জ্যোতির্ময় পরিচ্ছদ। তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ এস্তেলাম করলেন এবং মুখে তকবীর উচ্চারণ করলেন। মুসলমানগণও তাঁর অনুসরণ করে সুউচ্চ আওয়াজে তকবীর দিলেন। তাঁদের তকবীরের আওয়াজ মক্কার অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়লো। মক্কার মুশরিকরা পাহাড়ের উপর উঠে এসব দৃশ্য অবলোকন করছিলো এবং আওয়াজ শুনছিলো। আর শত্রুতা ও হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিলো।

কাবাগৃহের মূর্তি নিধন

রসুলেপাক স. তওয়াফ সমাপ্ত করলেন। তারপর মূর্তির অপবিত্রতা থেকে কাবাগৃহকে পবিত্র করার দিকে মনযোগ দিলেন। পবিত্র হেরেমের ইজ্জত ও হুরমতকে পবিত্র করলেন। জীবনীলেখকগণ লিখেছেন, কাবা গৃহের প্রান্তরের বিভিন্ন স্থানে মুশরিকরা ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিলো। এক বর্ণনায় আছে, শয়তান মূর্তিগুলোর পা শীশা দিয়ে মাটির সঙ্গে শক্ত করে গেঁথে দিয়েছিলো। তিনি স. তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে ইশারা করলেন এবং পুনঃপুনঃ বললেন— জ্বাআল হাক্বুক্ব ওয়া যাহাক্বাল বাত্বিলু ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুক্বা (সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই)(১৭ঃ৮১)। মূর্তিগুলো অধোবদনে মাটিতে পড়ে যেতে লাগলো। এক বিবরণে আছে, পায়ের গোড়ালির দিকে অর্থাৎ চিৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। এ দু'টি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য হতে পারে এভাবে— লাঠির ইশারা মূর্তির মুখের দিকে হলে চিৎ হয়ে আর পায়ের গোড়ালির দিকে হলে অধোবদনে ভূপাতিত হলো। কোনো কোনো জীবনীগ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. খানায়ে কাবার আশ-পাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি পেয়েছিলেন। সেগুলোর দিকে নিয়ত করে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা হজ্বব্রত পালন করতো এবং তাদের উদ্দেশ্যে কোরবানী করতো। তাই বায়তুল্লাহ্ শরীফ আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করেছিলো, হে আমার রব! কতদিন পর্যন্ত আমার আশপাশে তোমার ইবাদতের বদলে প্রতিমা পূজা অনুষ্ঠিত হবে? আল্লাহ্তায়ালা বায়তুল্লাহ্কে বলেছিলেন, অচিরেই আমি তোমার জন্য আমার নূর পয়দা করবো। তোমার কাছে এমন কওম প্রেরণ করবো, যারা চিলের ন্যায় ধীরগতিতে, আর যে পাখি তার ডিমের দিকে যওক-শওকের সাথে এগিয়ে আসে, তার মতো তারাও তোমার দিকে এগিয়ে আসবে। তাদের মুখে উচ্চারিত হবে তালবীয়া। আসাফ, নায়েলা ও হুবল ইত্যাদি বড় বড় প্রতিমা সমূহ ভেঙে খানখান করে ফেলবে তারা। বর্ণিত আছে, কুরাইশরা আসাফ মূর্তি স্থাপন করেছিলো সাফা

পাহাড়ে আর নায়েলাকে স্থাপন করেছিলো মারওয়া পাহাড়ে। জীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, আসাফ ও নায়েলা মূর্তি দু'টি ছিলো জুরহুম গোত্রের পুরুষ ও নারীর মূর্তি। তারা কাবাগৃহে ব্যাভিচার করেছিলো। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে পাথর বানিয়ে দিয়েছিলেন। কুরাইশরা মূর্খতা ও গোমরাহীর কারণে এদেরকে পূজা করতে থাকে। পাথর দু'টির সামনে মস্তক অবনত করার প্রচলন করে। মূর্তি দু'টি যখন ভাঙ্গা হলো তখন তার একটির মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো এক কৃষ্ণবর্ণের রমণী। রসুলেপাক স. বললেন, এটাই নায়েলা। আজ থেকে আর কেউ এর পূজা করবে না। হুবল মূর্তিটি যখন ভাঙা হলো, তখন হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম আবু সুফিয়ানকে বললেন, এটি ওই মূর্তি হুবল, উহুদের যুদ্ধের দিন যাকে নিয়ে তোমরা উল্লাস করেছিলে। সেদিন তোমরা হুবল মূর্তির নামে 'আ'লা হুবল' বলে শোরগোল করেছিলে। আজ একে ভেঙে খান খান করে দেওয়া হলো। সেদিন আবু সুফিয়ানকে কুরাইশরা তিরস্কার করেছিলো। আর আবু সুফিয়ান তখন বলেছিলেন, আমাকে ছেড়ে দাও। তিরস্কার কোরো না। মোহাম্মদের আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো আল্লাহ্ যদি থাকতো, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করতো। আজ আমাদের অবস্থাও হতো অন্যরকম। কোনো কোনো জীবনীগ্রন্থে আছে, কতকগুলো বড় বড় প্রতিমা উঁচু জায়গাগুলোতে স্থাপন করা হয়েছিলো। কোনো কোনো বিবরণে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে উঁচুতে স্থাপন করা হয়েছিলো যে মূর্তিটি তার নাম ছিলো হুবল। হজরত আলী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার কদম মুবারক আমার কাঁধের উপর রেখে প্রতিমাগুলোকে ভেঙে ফেলুন। তিনি স. বললেন, হে আলী! তোমার তো নবুওয়াতের ভার বহন করার মতো শক্তি নেই। তুমিই আমার কাঁধের উপর উঠে মূর্তিগুলো ভেঙে দাও। হজরত আলী রসুলেপাক স. এর নির্দেশ পালন করলেন। মূর্তিগুলো ভেঙে দিলেন। রসুলেপাক স. জিজ্ঞেস করলেন, আলী কী দেখলে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি দেখলাম, আমার সামনে থেকে সমস্ত পর্দা উঠে গেলো এবং আমার মস্তক আরশের পায়ার সাথে মিলিত হলো। যেদিকেই আমি আমার হাত প্রসারিত করি, দেখি সব কিছুই আমার হাতের আওতায়। তিনি স. বললেন, সময়টি তোমার জন্য কতোই না শুভ যে, তুমি আল্লাহ্র কাজ সম্পাদন করলে। আর আমার অবস্থা কতোই না পবিত্র যে, আমি হকতায়ালার দায়িত্বের ভার উত্তোলন করলাম। জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে দিলেন। সেগুলো মাটিতে পড়ে গেলো। তিনি পবিত্র স্কন্ধ থেকে মাটিতে নেমে এলেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি খানায়ে কাবার নিকটে পড়ে গেলেন। রসুলেপাক স. এর প্রতি আদব সম্মান রক্ষার্থে তিনি লাফ দিয়ে নিচে পড়ে গেলেন। পড়েই মৃদু হাসলেন। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, আলী হাসলে কেনো? তিনি বললেন, এতো উপর থেকে আমি

নীচে পড়ে গেলাম, অথচ আমার কোনো কষ্ট হলো না। একথা ভেবে আমি হাসি সংবরণ করতে পারলাম না। তিনি স. বললেন, তোমার কষ্ট হবে কেমন করে, যখন তোমাকে উপরে উঠানে ওয়ালা মোহাম্মদ আর নীচে নামানেওয়ালা জিবরাইল। রসুলেপাক স. নিজ হাতে মূর্তি না ভেঙে হজরত আলীকে কাঁধে উঠিয়ে তাঁর দ্বারা মূর্তি ভাঙালেন— এর জবাবে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ইন্নাকুম ওয়ামা তা'বুদূনা মিন দূনিল্লাহি হাসাবু জাহান্নাম' (তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাহাদের ইবাদত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন)। (২১ঃ৯৮) সে হিসেবে কাফের এবং তাদের পূজিত প্রতিমাসমূহ সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে যদি ওগুলোর উপর রসুলেপাক স. এর পবিত্র হাতের স্পর্শ লাগে, তাহলে তো আখেরাতে জাহান্নামের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তারা জাহান্নামের ইন্ধনও হতে পারবে না।

'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে এর চেয়েও অধিক বিস্ময়কর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। একদিন রসুলেপাক স. সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তন্দুরে রুটি লাগাচ্ছিলেন, তাঁর হাতে আগুনের তাপ লেগে গেলো। তখন রসুলেপাক স. নিজ হাতে রুটিগুলো তন্দুরে স্থাপন করলেন। রুটিগুলো কাঁচাই রয়ে গেলো। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বিস্মিত হলেন। তিনি স. বললেন, হে আয়েশা। বিস্মিত হয়ো না। এ রুটিগুলো আমার হাতের পরশ পেয়েছে। তাই আগুন এদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না।

রসুলেপাক স. যখন কাবাগৃহকে মূর্তির অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করলেন, এরপর কাবাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছা করলেন। কুঞ্জিকারক্ষক হজরত ওছমান ইবনে তালহাকে ডেকে আনলেন। দীর্ঘদিন যাবত কাবাগৃহের চাবি তাঁর দায়িত্বেই ছিলো। চাবিটি তখন ছিলো ওছমান ইবনে তালহার মাতা সালামা বিনতে সাআদের কাছে। ওছমান মায়ের কাছে গিয়ে চাবি চাইলেন। কিন্তু তাঁর মা তা দিতে অস্বীকৃতি জানালো। ওছমান বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! চাবি দিয়ে দাও। অন্যথায় কোমর থেকে তলোয়ার বের করবো। তাঁর মা চাবি বের করে দিলেন। তিনি চাবি নিয়ে রসুলেপাক স. সকাশে হাজির হলেন। সসম্মানে চাবি হস্তান্তর করলেন। তিনি স. স্বহস্তে কাবাগৃহের দরজা খুললেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম। ইবনে সাআদ তার রচিত 'তাবাকাত' কিতাবে ওছমান ইবনে তালহা থেকে বর্ণনা করেছেন, জাহেলী যুগে এ রীতি চালু ছিলো যে, কাবাগৃহ সপ্তাহে দু'দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছাড়া আর কোনো সময় খোলা যাবে না। তখন একদিন রসুলুল্লাহ আমার কাছে এলেন। কাবাগৃহ খুলে দিতে বললেন। একদল লোক ছিলো তাঁর সঙ্গে। তাদেরকে নিয়ে তিনি কাবাগৃহে প্রবেশ করতে চাইলেন। আমি তাঁর সাথে রূঢ় আচরণ করলাম। কিন্তু তিনি ধৈর্য্য ধারণ করলেন। বললেন, হে ওছমান! এমন

একদিন আসবে, যেদিন চাবি আমার হাতে দেখবে। সেদিন আমি যাকে চাইবো তাকেই তা প্রদান করবো। আমি বললাম, সেদিন তো তাহলে কুরাইশরা ধ্বংস হয়ে যাবে! সেদিন থেকেই আমার মনে বিষয়টি গেঁথে গিয়েছিলো। আমি মনে মনে বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম যে, অবশ্যই একদিন এরকম হবে। বিজয়ের দিন এলো। তিনি স. বললেন, হে ওছমান! চাবি দাও। আমি চাবি তাঁর কাছে দিয়ে দিলাম। তিনি চাবিটি আমার হাত থেকে নিয়ে আবার আমার কাছেই ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, নাও। কোনো জালেম জুলুম করা ছাড়া তোমার হাত থেকে এই চাবি আর কেউ কোনো দিন নিতে পারবে না। হে ওছমান! আমি কি তোমাকে একদিন এরকম বলিনি যে, চাবি একদিন আমার হাতে আসবে এবং সেদিন এ চাবি আমি যাকে চাইবো তাকে প্রত্যর্পণ করবো? আমি বললাম, হাঁ। হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসুল। ওছমানের এই কলেমা পাঠ ছিলো তাঁর ইমান পুনঃপ্রকাশের ভিত্তিতে। মোজেযা দেখে বিস্মিত হয়ে তিনি কলেমা পাঠ করেছিলেন। কারণ হজরত ওছমান হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ এবং হজরত আমর ইবনুল আসের সঙ্গে মক্কাবিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য বিবৃতিতে আছে, রসুলে আকরম স. হজরত ওছমান ইবনে তালহাকে চাবির জন্য ডেকে আনলেন। তখন হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বললেন, কাবাগৃহের চাবি তাকেই দান করুন এবং কাবা যিয়ারতকারীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্বও তাকেই দিন। এক বিবৃতিতে আছে, হজরত আলী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কাবাগৃহের পর্দা পরানোর দায়িত্ব আপনার আহলে বাইতকে দিন যেমন তাদেরকে দান করেছেন যমযমের পানি পান করানোর দায়িত্ব। ওয়াল্লাহু আ'লাম। হজরত আলী গিলাফ পরানোর পর্দাটি নিজের জন্য কামনা করছিলেন। অথবা হজরত আব্বাসের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। অর্থাৎ বলেছিলেন, হজরত আব্বাসকে যেমন পানি পান করানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো, তেমনি তাঁকে কাবা গৃহের গিলাফ পরানোর দায়িত্বটিও অর্পণ করা হোক। তখন তিনি স. হজরত আলীকে পাঠালেন ওছমান ইবনে তালহার কাছ থেকে চাবি নিয়ে আসতে। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করলেন— 'ইন্নালাহা ই'মুরুকুম আন তুওয়াদদুল আমানাতা ইলা আহলিহা' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে) (৪ঃ৫৮)। অতঃপর রসুলেপাক স. হজরত আলীকে আদেশ করলেন, চাবিটি ওছমান ইবনে তালহার কাছে ফিরিয়ে দাও। হজরত আলী চাবি নিয়ে যখন হজরত ওছমানের কাছে গেলেন, তখন তিনি বললেন, যবরদস্তির সাথে নিয়ে গেলেন, আর উযরখাহির সাথে নিয়ে আসলেন যে? হজরত আলী বললেন, তোমার শানে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং হজরত জিব্রবইল এসে বলে গেছেন, যতোদিন পৃথিবীর উপর বাইতুল্লাহ শরীফ কায়েম থাকবে, ততোদিন এর চাবি রাখা ও এর দেখা শোনা করার দায়িত্ব

বংশানুক্রমে তোমার কাছেই থাকবে। হজরত ওছমান ইবনে তালহার মৃত্যু হলে তাঁর ভাই শায়বা ইবনে তালহার কাছে এই চাবি সোপর্দ করা হলো। হজরত ওছমানের কোনো সন্তান ছিলো না। তাই পরবর্তীতে চাবি বহন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত বংশকে বনী শায়বা নামে আখ্যায়িত করা হয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. হজরত উসামা, হজরত বেলাল ও হজরত ওছমান ইবনে তালহাকে সঙ্গে নিয়ে কাবাগৃহে প্রবেশ করলেন। হজরত ইবনে আব্বাসকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। হজরত উসামা ও হজরত বেলাল ভিতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন যাতে লোকেরা সেখানে ভীড় জমাতে না পারে। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন এবং কাবা ঘরের বিভিন্ন কোণায় কোণায় গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দোয়া-মুনাজাত করলেন। তারপর বের হয়ে এলেন। বেরিয়ে আসার সময় হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে হুকুম দিলেন, ফেরেশতা ও নবীগণের প্রতিকৃতি বানিয়ে কাফেররা কাবাঘরের দেয়ালে দেয়ালে যা কিছু ঝুলিয়ে রেখেছিলো, সেগুলো ভেঙে ফেলো। তিনি নির্দেশ মতো সমস্ত প্রতিকৃতি ভেঙে দিলেন। তবে হজরত ইব্রাহীম ও হজরত ইসমাইলের প্রতিকৃতি দু'টি রেখে দিলেন। প্রতিকৃতি দু'টিরই দু'হাতে তীর ও জুয়ার গুটি ছিলো। রসুলেপাক স. বললেন, এ দু'টিও নিশ্চিহ্ন করে দাও। এ জাতি জানে না, কোনো নবীই কখনও জুয়া খেলেননি। অতঃপর তিনি স. এক বালতি পানি আনালেন। ওই পানি দিয়ে প্রতিকৃতি দু'টি ধুয়ে মুছে ফেললেন। হজরত ইবনে ওমর, হজরত বেলাল থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. কাবা ঘরের ভিতরে দু'রাকাত নামাজ পড়েছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হজরত উসামা বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. কাবা ঘরের ভিতরে নামাজ পড়েননি। অবশ্য হজরত বেলালের বর্ণনাটির উপরই বেশী ভরসা করা যায়। কেননা তাঁর বর্ণনাটি সাব্যস্তকারী (ছাবেতকারী)। হজরত উসামার বর্ণনা তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা তাঁর বর্ণনাটি নিবারণজ্ঞাপক (নফিকারী)। উসুলে ফেকাহ'র নীতি অনুসারে ছাবেতকারীকে নফীকারীর উপর অগ্রাধিকার দিতে হয়। কেননা ছাবেতকারীর বর্ণনার মধ্যে এলেম বেশী থাকে। নফীকারীর বর্ণনার মধ্যে তা থাকে না। হজরত বেলালের বর্ণনাটি অগ্রগণ্য হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, তিনি রসুলেপাক স. এর সার্বক্ষণিক অবস্থা সম্পর্কে বেশী অবহিত ছিলেন। তিনি তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। আর হজরত উসামাকে কোনো কাজের জন্য বাইরে পাঠিয়েছিলেন। সে কারণে তিনি নামাজ পড়ার বিষয়টি অবগত হননি। সম্ভবতঃ সে কাজটি ছিলো বালতি দিয়ে পানি আনয়ন করা। যে পানি দিয়ে প্রতিকৃতিসমূহ মুছে ফেলা হয়েছিলো। এরকম একটি সুস্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে। হজরত বেলাল ও হজরত উসামার বর্ণিত বিপরীতধর্মী হাদিসদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবেই করা সম্ভব। আবার হজরত উসামা থেকে আরেকটি হাদিস

বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি উল্লিখিত হয়েছে 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে। গ্রহণ করা হয়েছে ইমাম আহমদ ও তিরমিজি থেকে। সেখানে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. কাবাঘরের ভিতরে নামাজ পড়েছেন। এখন হজরত উসামার এই দু'ধরনের বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধানকল্পে আলেমগণ বলেছেন, যে বর্ণনায় নামাজ পড়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা তিনি অন্যের বর্ণনার উপর নির্ভর করে বলেছেন। আর যে বর্ণনায় নফী করা হয়েছে, সে বর্ণনাটি তিনি তাঁর নিজের এলেমের ভিত্তিতে করেছিলেন। তিনি যেনো একথাটিই বলতে চেয়েছেন যে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন রসুলুল্লাহ কি কাবাঘরের ভিতরে নামাজ পড়েছেন? তাহলে তিনি বলবেন, আমি দেখিনি। এরূপ সমাধান গ্রহণ করলে কোনোরূপ বৈপরিত্য আর থাকে না।

রসুলেপাক স. কাবাগৃহের দরজা খুলে বাইরে এলেন। দরজার দু'টি কপাট ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ মানুষের ভিড় কমানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। রসুলেপাক স. আল্লাহ্তায়ালার হামদ-ছানা ও শুকরিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বললেন— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু সাদাকা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবু ওয়াহদাহু ওয়া আআ'যযু জুনদাহু' (আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই। তিনি তার ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন, এবং তিনিই সকল বাহিনীকে পরাভূত করেছেন ও তাঁর বাহিনীকে প্রবল করেছেন)। কুরাইশদের নেতারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সবকিছু দেখতে লাগলো। কী অবস্থা দাঁড়ায় এবং কী হুকুম আসে, রসুলুল্লাহ কী বলেন— এসবকিছু নিয়েই ভাবছিলো তারা। তিনি স. মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা কী ভাবছো? আমি তোমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবো বলে মনে করো? লোকেরা বললো, 'নাকুলু খাইরান ওয়া নাজুন্নু খাইরা' (আমরা ভালো কথাই বলছি এবং ভালো ধারণা করছি)। 'আখুন কারীমুন ওয়াবনু আখিন কারীমিন, ওয়া ক্বাদ কাদারতা' (আপনি তো মহানুভব ভ্রাতা এবং মহান ভ্রাতার পুত্র। নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের উপর ক্ষমতাবান)। যে সকল লোক রসুলেপাক স. এর সমবয়সী ছিলো, তারা মহানুভব ভাই বলে সম্বোধন করেছিলো। আর যারা তাঁর সম্মানিত পিতার সমবয়সী ছিলেন, তারা তাকে সম্মানিত ভাইয়ের পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলো। আর তাদের 'ক্বাদ কাদারতা' উক্তির মধ্যে ছিলো ক্ষমাপ্রার্থনার কথাটি যা নবী ইউসুফের ঘটনার দিকে ইশারা করছে। তিনি তাঁর ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাইয়েরা যখন বলেছিলো, 'লাক্বাদ আছারাকাল্লাহু আ'লাইনা ওয়া ইন কুন্না লাখাত্বিঈন' (আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন এবং আমরা তো অপরাধী ছিলাম) (১২ঃ৯১)।

রসুলেপাক স. বললেন, আমিও সেই কথা বলি, যা নবী ইউসুফ তখন বলেছিলেন— 'লা তাছরীবা আলাইকুমুল ইয়াওমা ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম ওয়া হুয়া আরহামুর রহিমীন' (আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু)(১২ঃ৯২)।

আজ তোমরা সকলেই মুক্ত। তারপর তিনি স. একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিলেন। যার মাধ্যমে জাহিলী যুগের সমস্ত কুসংস্কার ও বদঅভ্যাসগুলোর মূলোৎপাটন করলেন। জাহেলী যুগের কেসাস (বদলা) ও দিয়ত (রক্তপণ) যার কারণে মানুষ বাড়াবাড়ি করে আসছিলো— সেগুলোকে তিনি রহিত করে দিলেন। বললেন, সকল মানুষই নবী আদমের সন্তান। আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। কারও উপর কারও কোনো মর্যাদা নেই, তাকওয়া ও পরহেজগারী ব্যতীত। তারপর এই আয়াত পাঠ করলেন— 'ইয়া আয়্যুহান্নাসু ইন্না খালাক্বনাকুম মিন যাকারিওঁ ওয়া উনছা ওয়া জ্বাআলনাকুম শুউ'বাওঁ ওয়া ক্বাবাইলা লিতাআ'রাফূ ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতক্বাকুম ইন্নাল্লাহা আ'লীমুন খাবীর' (হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতী ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট ঐ ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন)(৪৯ঃ১৩)। ভাষণ শেষ করার পর তিনি স. আবু তালেবের কন্যা, আমীরুল মুমিনীন হজরত আলীর ভগ্নি হজরত উম্মে হানীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গোসল করলেন। তারপর আট রাকাত চাশতের নামাজ পড়লেন। বললেন, 'হাযিহী সাবহাতুদ্দুহা'। সাবহা বলা হয় নফল নামাজকে। শব্দটি দোহা বা চাশতের দিকে সম্বন্ধ করে বলা হয়েছে। এর অর্থ চাশতের সময়ের নফল নামাজ। কেউ কেউ মনে করেন, এই নামাজ তিনি স. পাঠ করেছিলেন বিজয়ের শুকরানা হিসেবে। চাশতের নামাজ শরীয়তসম্মত হওয়ার দলিল হিসেবে হজরত উম্মে হানীর এই হাদিসটিই উত্তম। এই নামাজের ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। 'ছফরুস সাআদাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনে সেখান থেকে দেখে নেওয়া যেতে পারে। তবে সুসাব্যস্ত কথা এই যে— রসুলেপাক স. এই নামাজ সব সময় পড়তেন না। তবে যে নামাজকে ইশরাক বলা হয়, তা তিনি সব সময়ই আদায় করতেন। ইশরাক পড়ার ব্যাপারে তাকীদও রয়েছে। উভয় নামাজকেই হাদিসের পরিভাষায় সালাতুদ্দুহা বলা হয়েছে।

তারপর রসুলেপাক স. তাঁর অবস্থানস্থলের দিকে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় নজরে পড়লো শীআবে আবু তালেব এবং খায়েফে বনী কানানা নামক স্থান দু'টি। এখানে তিনি স. কাফেরদের দ্বারা কতোইনা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন। আজ সেই স্মৃতি উদ্ভাসিত হলো। মুশরিকরা বনী হাশেমের সঙ্গে বিয়ে শাদী ও কেনাবেচা বন্ধ করে দিয়েছিলো। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলো, যতক্ষণ না বনী হাশেম মোহাম্মদকে তাদের হাওলা করে দিবে, ততক্ষণ তারা এই সম্পর্কচ্যুতি চালিয়ে যাবে। সবই আজ তাঁর মনে পড়ে গেলো। কিন্তু আজ বিজয়ের নেয়ামত অর্জিত হয়েছে, দ্বীনের দুশমনদের উপর চরম ও পরম বিজয় অর্জিত হয়েছে। তাই তিনি স. আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন।

যোহরের নামাজের সময় হলো। তিনি স. হজরত বেলালকে নির্দেশ দিলেন, কাবাগৃহের ছাদে আরোহণ করে আজান দাও। এই মুহূর্তটি কতোইনা বরকত, নেয়ামত ও মর্যাদার মুহূর্ত ছিলো। সে সম্পর্কে আরশে অবস্থানকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত। এই আজানের ধ্বনি কি তাদের কাছে পৌঁছেছিলো? নাকি তা ছড়িয়ে পড়েছিলো আরও উর্ধ্বে। হজরত বেলাল কর্তৃক আজানের বাক্যসমূহ কী ছিলো তার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

হজরত বেলালের আজান শুনে এতাব ইবনে উসায়েদের ভাই খালেদ ইবনে উসায়েদ, আবু জাহেলের ভাই হারেছ ইবনে হেশাম এবং হাকাম ইবনুল আস প্রমুখ সমালোচনামূলক কথাবার্তা বলতে লাগলো। হজরত জিবরাইল এসে তারা যা যা বলেছিলো, তা রসুলেপাক স.কে জানিয়ে দিলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে আনলেন এবং কে কী বলেছে সবই তাদেরকে জানিয়ে দিলেন। এতে বিস্মিত হয়ে একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করলো। তাদের মধ্যে ছিলেন হারেছ ইবনে হেশাম ও এতাব ইবনে উসায়েদ। এক বর্ণনায় আছে, আবু সুফিয়ান ইবনে হারবও উক্ত সমালোচনার মধ্যে শরীক ছিলেন। তিনি সেখানে বলেছিলেন যে, আমি কিছুই বলবো না। কেননা কোনো কিছু মনে মনে বললেও সে কথা মোহাম্মদের কানে চলে যাবে। রসুলেপাক স. তাদেরকে ডেকে এনে তাদের কথিত কথাগুলো উল্লেখ করলেন। তখন আবু সুফিয়ান বললেন, আমি এতোটুকু কথার বেশী আর কিছু বলিনি। তাঁর কথা শুনে রসুলেপাক স. মৃদু হাসলেন। তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন। এ বর্ণনা যদি সহীহ্ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবতঃ তখনই তাঁর অন্তরে ইমান দানা বেঁধেছিলো এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণ সুন্দর হয়েছিলো। মক্কাবিজয়ের দিন যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কারও কারও বেলায় বলা হয়েছে 'হাসুনা ইসলামুহু' (সুন্দর ইসলাম গ্রহণ)। আবার কারও কারও ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। যা হোক, মক্কাবিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে 'মুআল্লাফাতুল কুলুব' বলা হয়। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান মক্কাবিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারী এবং 'মুআল্লাফাতুল কুলুব'দের অন্তভুর্ক্ত

ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পিতার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে। অর্থাৎ রসুলেপাক স. মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আরও বলা হয়ে থাকে, রসুলেপাক স. যখন মক্কায় প্রবেশ করেননি, তখন পথিমধ্যে তাঁর পবিত্র দরবারে হাজির হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

রসুলেপাক স. সাফা পাহাড়ের দিকে গেলেন। কাবাগৃহ ছিলো তাঁর দৃষ্টির সামনে। অতঃপর দু'হাত তুলে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলেন তিনি। তারপর সেস্থানে উপবেশন করলেন। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। কুরাইশদের লোকেরা একে একে আসতে লাগলো। তিনি তাদেরকে বায়াত করতে লাগলেন। প্রথমে পুরুষেরা। তারপর মেয়েরা। মেয়েদেরকে তিনি মুখে মুখে বায়াত করালেন। তাদের হাত স্পর্শ করলেন না।

মেয়েদের বায়াত গ্রহণ

জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. তাঁর চাদরের এক প্রান্তে ধরলেন, অপর প্রান্ত ধরলো মেয়েরা। কেউ কেউ বলেছেন, এক পাত্র পানি আনালেন। তাঁর পবিত্র হাত সেই পানিতে প্রবেশ করালেন। অতঃপর পাত্রটি মেয়েদেরকে দেওয়া হলো। তাঁরা আপন আপন হাত ওই পানিতে প্রবেশ করালেন। তবে বিশুদ্ধ কথা এটাই যে, রসুলেপাক স. বায়তের বাক্য মুখে উচ্চারণ করেছিলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার হাদিসে একথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। মেয়েদের বায়াত গ্রহণ সম্পর্কে কালামে পাকে এরশাদ করা হয়েছে— 'ইয়া আয়্যুহান নাবিয়্যু ইযা জ্বাআকাল মু'মিনাতু ইউবায়ীনাকা আলা আল্ লা ইউশরিক্বনা বিল্লাহি শাইআওঁ ওয়ালা ইয়াসরিক্বনা..............ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহীম' (হে নবী ! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট আসিয়া বায়'আত করে এই মর্মে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন শরীক স্থির করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যাভিচার করিবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, তাহারা সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করিয়া রটাইবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করিবে না তখন তাহাদের বায়'আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)(৬০ঃ১২)।

বর্ণিত আছে, নবী করীম স. যখন মক্কাবাসীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন এবং তাদের সাথে বিনম্র আচরণ ও দয়া প্রদর্শন করলেন, তখন আনসারগণ দুঃখিত হলেন। কেউ কেউ বললেন, রসুলুল্লাহর প্রতি গোত্রপ্রীতি প্রবল হয়েছে। তিনি তাঁর কওমের লোকদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে চলেছেন। এখন তিনি আমাদেরকে ছেড়ে দিবেন এবং আপন সম্প্রদায় ও আপন শহরে ফিরে আসবেন। আনসারদের ধারণা ছিলো, কুরাইশরা

রসুলেপাক স.কে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাঁর সাথে দুশমনী করেছে। এমনকি তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। কাজেই তিনি স. হয়তো তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং এক সাথে সকলকেই হত্যা করে ফেলবেন। তাঁরা হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে, রসুলেপাক স. হচ্ছেন রহমাতুল্লিল আলামীন। পথহারাদের পথের দিশা দানকারী। তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জগতবাসীকে পথপ্রদর্শন করা। প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও বদলা নেওয়া তো দুনিয়ার রাজা বাদশাহদের কাজ। আনসারগণ উক্ত আলোচনার মধ্যে লিপ্ত ছিলেন। এমন সময় রসুলেপাক স. এর উপর ওহী নাযিল হতে শুরু করলো। ওহী শেষে তিনি স. আনসারদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী এরকম এরকম কথা বলেছো? তাঁরা বললেন, হাঁ। তিনি স. বললেন, কক্ষণও নয়। আমি এমন করবো না। আমি তো আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রসুল। আল্লাহ্র হুকুমেই আমি তোমাদের ওখানে হিজরত করেছি। আমার জিন্দেগী তো তোমাদের সাথে, আমার মৃত্যুও হবে তোমাদের সাথেই। তখন আনসারগণ ক্রন্দন করে নিবেদন জানালেন, আল্লাহ্র শপথ! হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা একথা কোনো খারাপ ধারণা নিয়ে বলিনি। বরং ভালোবাসা ও চূড়ান্ত মনের টান থেকে আমরা একথা বলেছি। আমরা মনে করেছি এখন থেকে আপনি অন্যদের হয়ে যাবেন এবং আমাদেরকে ছেড়ে দিবেন। যেহেতু এই কাওমের সাথে আপনার ঝগড়া আল্লাহ্র কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যেই ছিলো। এখন যখন তা হাসিল হয়ে গিয়েছে, সুতরাং প্রতিশোধ নেওয়ার আর কিছুই রইলো না।

মক্কাবিজয়ের দ্বিতীয় দিন রসুলেপাক স. আবার ভাষণ দিলেন। বললেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যেদিন থেকে আসমান যমীন পয়দা হয়েছে, সেদিন থেকেই মক্কা মুকাররমাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। একথাটি মক্কা নগরীর প্রাচীনতম হুরমতের দিকেই ইশারা করছে। তেমনিভাবে তার হুরমত (মর্যাদা) কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে, তার জন্য মক্কা মুকাররমায় রক্তপাত, বৃক্ষ কর্তন এবং তৃণ উৎপাটন হালাল নয়। কেউ যদি এরকম মনে করে থাকে যে, আল্লাহ্র রসুল তো এখানে যুদ্ধ করেছেন, তাহলে তোমরা তাদেরকে বলে দাও, যে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসুলকে এরকম করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদের জন্য সে অনুমতি নেই। আমার পূর্বে সেরকম কারও জন্য তা হালাল ছিলো না, আমার পরও কারও জন্য হালাল নয়। আমার জন্যও তা কেবল একদিন বরং কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিলো। তারপর তার মর্যাদার বিধান আবার ফিরে এসেছে। রসুলেপাক স. এর একথা বলার কারণ ছিলো এরকম— জন্দু ইবনে আওলা হাযালী নামক এক ব্যক্তি মক্কায় এসেছিলো। খেরাশ ইবনে উমাইয়া কা'বী খাযায়ী তাকে হত্যা করে ফেলেছিলে। রসুলেপাক স. এর নিকট এই সংবাদ যখন এলো, তখন তিনি স. তাকে নিষেধ করলেন এবং ধমক দিলেন। বললেন, হত্যা থেকে হাত গুটিয়ে নাও। যে হত্যা

করেছিলো, তাকে দিয়ত আদায় করার হুকুম দিলেন তিনি স.। আরও ঘোষণা দিলেন, এরপর যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তাহলে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে কেসাস অথবা দিয়ত গ্রহণ করার এখতিয়ার দেওয়া হলো। তখন খেরাশ ইবনে উমাইয়া উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণে একশ' উট দিয়তস্বরূপ আদায় করলো। এখানে কেসাসের পরিবর্তে দিয়ত আদায় করা হয়েছিলো একারণে যে, খেরাশ ইবনে উমাইয়া যে হত্যাটি করেছিলো, তা ছিলো ভুলবশতঃ হত্যা। তাকে হত্যা করা বৈধ বলে তার বিশ্বাস ছিলো।

এখানে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জেনে রাখা উচিত যে, রসুলেপাক স. যুদ্ধ করেননি। বরং যুদ্ধ বা হত্যা যা হয়েছিলো, তা করেছিলেন হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ। আর তা রসুলেপাক স. এর অনুমতিতে হয়নি। এটি সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। যুদ্ধটির সূত্রপাত হয়েছিলো কুরাইশদের অর্বাচীন লোকদের দ্বারা। মুসলমানগণ কেবল তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। আর এ যুদ্ধ মুহূর্তকালের বেশী স্থায়ী হয়নি। একারণেই আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, মক্কাবিজয় যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে হয়েছিলো, নাকি সন্ধি ও নিরাপত্তার মাধ্যমে। সন্ধি ও নিরাপত্তার মাধ্যমে হয়েছিলো বলে যারা মত পোষণ করেন, তাঁরা বলেন, রসুলেপাক স. কুরাইশদেরকে মাররুয যাহরান নামক স্থান থেকে আমান দিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের ঘর বাড়ি ও জায়গা সম্পত্তির নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তাই এখানে গনিমত হিসেবে কোনো মাল বন্টন করা হয়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ষষ্ঠ খণ্ড শেষ

মাদারেজুন নবুওয়াত

ISBN 984-70240-0018-7